তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৩৯
রকিব হাসান
কিশোর থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী
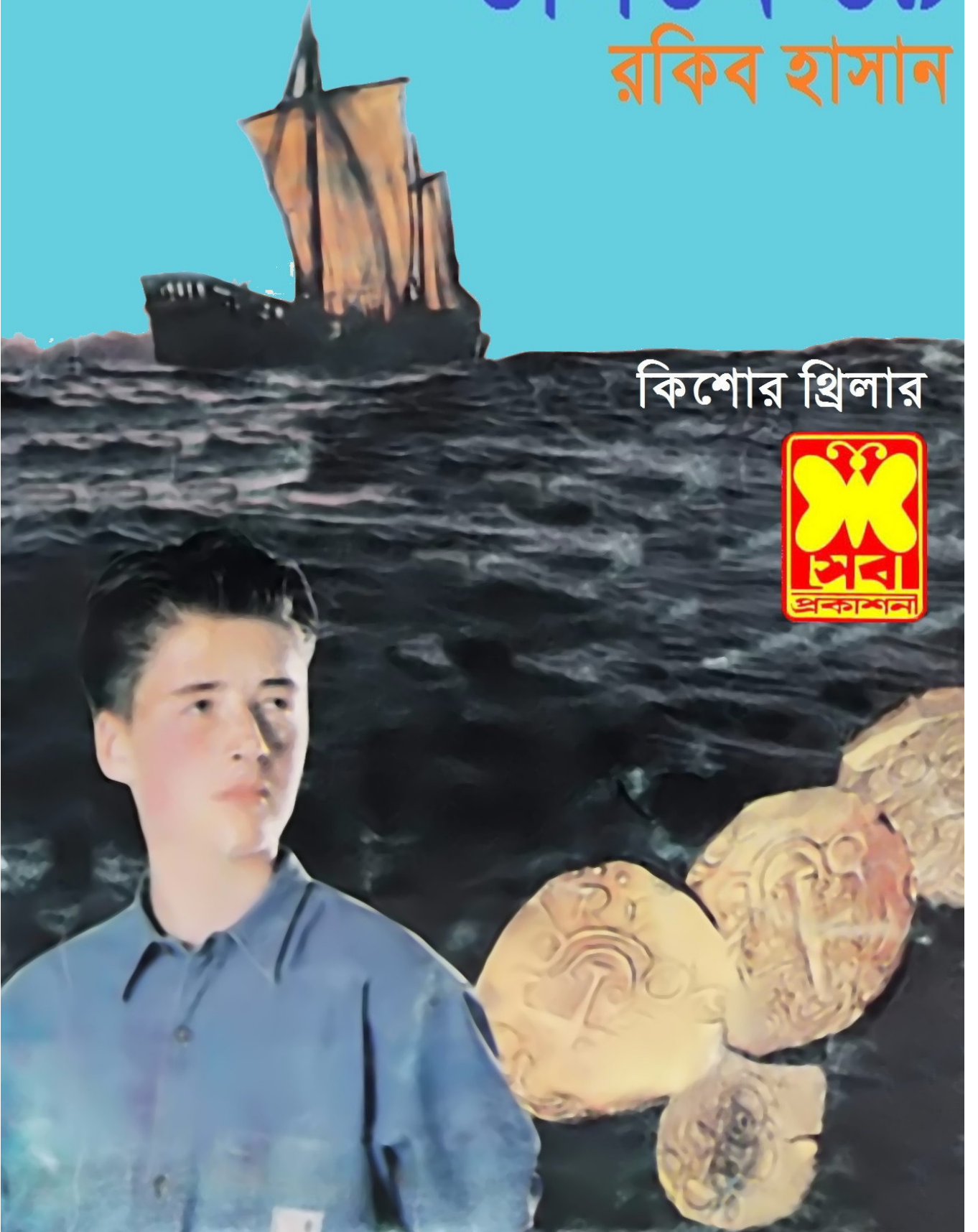
ভলিউম ৩৯

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
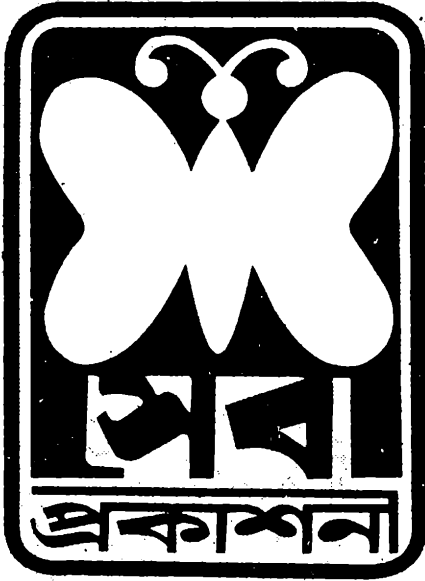
ISBN 984-16-1418-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M M)
জি পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-39
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

আটত্রিশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩১/-

বিষের ভয়

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

নিজের বাড়ির বড় জানালাওয়ালা ঘরটায় বসে আছেন গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন। সামনে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসা আরেকজন ভদ্রলোক। লম্বা, মাথায় লাল চুল।

কিশোরকে দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন সাইমন, 'এসো।'

দুটো ফোল্ডিং চেয়ার খুলে বসে পড়ল কিশোর আর রবিন।

মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিতে সামনে বসা ভদ্রলোকের পরিচয় দিলেন সাইমন, 'ইনি জন হেমিংওয়ে পাওয়ারস। রকি বীচের একটা আর্ট গ্যালারি আর অ্যানটিক শপের...'

'চিনি,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। '...মালিক, গেছি ওঁর দোকানে। অ্যানটিক দেখতে।'

উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাসে, সরু সরু আঙুলওয়ালা একটা থাবা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন পাওয়ারস, 'মিস্টার সাইমনের কাছে শুনলাম তোমরা খুব ভাল গোয়েন্দা। তাঁর কাছেই এসেছিলাম, কিন্তু তিনি সময় দিতে পারছেন না। তোমাদের কথা বললেন। আজ রাতে তোমাদের সাহায্য দরকার আমার।'

'কি করতে হবে?' জানতে চাইল রবিন।

'আমার গ্যালারির ওপর নজর রাখবে। একটা অ্যালার্ম সিসটেম লাগাচ্ছি, কালকের আগে সারা যাবে না। ইদানীং সারা দেশ জুড়েই গ্যালারিগুলোতে খুব চুরিদারি হচ্ছে, শুনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'শুনেছি।'

সাইমন বললেন, 'অন্য একটা কাজে আমি ব্যস্ত এখন, পাওয়ারসকে সময় দিতে পারছি না।'

পাওয়ারস বললেন, 'কয়েকটা বিশেষ স্টেটে বেশি হচ্ছে এই চুরি। আমাদেরটাও তার মধ্যে পড়ে। কাল রাতে হ্যারিসন গ্যালারিতে চুরি হয়েছে। ষাট-সত্তর হাজার ডলারের রূপার জিনিস আর পেইন্টিং। আমারটার দশ মাইলের মধ্যে ওই গ্যালারি এবং সবচেয়ে কাছে। ভয় লাগছে, এরপর আমারটার ওপরই নজর দেবে চোর।'

'আপনার এই ভয়ের কারণ?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'গত কদিন ধরে একটা অচেনা আজব চেহারার লোককে আমার গ্যালারির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।'

'আজব চেহারার?'

'কিংবা বলা যায় আজব পোশাক পরা। একটা তিনকোনা হ্যাট ছিল মাথায়।'

‘তিনকোনা হ্যাট?’ অবাক হলো রবিন। ‘ও তো দুশো বছর আগে পরত লোকে!’

হাত তুললেন পাওয়ারস, ‘জানি। সেই জন্যেই তো চোখ পড়েছে আমার।’

‘আর আপনার ধারণা,’ কিশোর বলল, ‘ওই লোক আপনার গ্যালারির ওপর নজর রাখছে?’

‘সে-রকমই তো মনে হয়, তাই না?’

রবিন বলল, ‘কিন্তু এ ভাবে নিজেকে জাহির করে নজর রাখতে আসবে? চোর হলে নিজেকে লুকিয়ে রাখাটাই স্বাভাবিক ছিল?’

‘কি জানি,’ হাত ওল্টালেন পাওয়ারসন, ‘মাথা খারাপও হতে পারে। যা-ই হোক, আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছি। দু-জন পাহারাদার খুঁজছি। টেকনিশিয়ানরা বলছে কালকের মধ্যে অ্যালার্ম লাগানো হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ধারণা, আরও দু-দিনের কমে পারবে না।’

‘আমাদের পাহারা দিতে বলছেন?’

‘যদি পারো খুবই ভাল হয়। শুধু আজকের রাতটা। পারবে?’

কিশোর বুঝল, এ-কাজের জন্যেই ওদের ডেকে এনেছেন সাইমন। ওঅর্কশপে একটা পুরানো টেপরেকর্ডার মেরামত করছিল সে, রবিন কিছু গানের ক্যাসেট বাছাই করছিল, এই সময় ফোন করলেন খোঁড়া গোয়েন্দা। জরুরী তলব। মুসার কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু সে জিমনেশিয়ামে চলে গেছে বাস্কেটবল প্র্যাকটিস করতে। আসতে পারেনি।

আবার জিজ্ঞেস করলেন পাওয়ারস, ‘পারবে?’

জবাব দেয়ার আগে জানতে চাইল কিশোর, ‘পুলিশকে জানিয়েছেন?’

মাথা নাড়লেন পাওয়ারস। ‘না। কোন প্রমাণ নেই। শুধু একটা লোককে সন্দেহ। এ নিয়ে পুলিশের কাছে যেতে ইচ্ছে করল না। গোয়েন্দার সাহায্যই বেশি কাজে লাগবে আমার বিশ্বাস। একটা তথ্য দিচ্ছি, এ-যাবৎ যতগুলো ডাকাতি হয়েছে, সব মাঝরাতের দিকে। সুতরাং রাত বারোটার আগে গ্যালারিতে যাওয়ার দরকার নেই তোমাদের।’

সাইমনের দিকে তাকাল কিশোর, ‘এটাও কেমন অস্বাভাবিক, তাই না, স্যার? এই সময়ের ব্যাপারটা? আরও বেশি রাতে নয় কেন, যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, নীরব হয়ে যায় সব কিছু?’

‘নাহ্, আমার কাছে ততটা লাগছে না,’ জবাব দিলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা। ‘বেশি রাতে রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে গেলে পেট্রল পুলিশের নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই এমন একটা সময় বেছে নিয়েছে, যখন রাস্তায় ভিড় কম থাকবে, অথচ চোখে পড়বে না। অ্যানটিকের মধ্যে অনেক বড় বড় জিনিসও থাকে, ট্রাকে করে নিতে হয়। বেশি রাতে নিলে পুলিশের সন্দেহ হতে পারে।’

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন পাওয়ারস। তাকালেন কিশোরের দিকে, ‘তাহলে তোমরা যাচ্ছ?’

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

বাড়ি ফিরল দুই গোয়েন্দা। গোসল করে, খেয়ে, গাড়ি নিয়ে আবার স্যালভিজ

ইয়ার্ডে চলে এল রবিন। তৈরি হয়ে আছে কিশোর। বেরোল দু-জনে। এখনও মোটামুটি ব্যস্ত রয়েছে সড়ক। পাওয়ারসের গ্যালারিতে চলল ওরা।

গ্যালারির কাছে এসে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে গাড়ি পার্ক করল রবিন। কেউ দেখলেও সন্দেহ করবে না কিছু। ভাববে খাওয়ার জন্যে থেমেছে।

'এলে পেছন দিয়ে আসবে চোরের দল,' রবিন বলল। 'সামনের দিকে গাড়ি রেখে মাল তোলা নিরাপদ নয়।'

'আমিও তাই ভাবছি। পেছনে পার্কিং লটে ট্রাক রাখবে। দাঁড়াও, দেখে আসি কেউ আছে কিনা। না থাকলে ওদের ঢুকতে দেখব আমরা। বাঁয়ের ওই গলিটা ছাড়া পেছনে যাওয়ার আর কোন পথ নেই, দেখেছি।'

গাড়ি থেকে নেমে এগোল কিশোর। চারপাশ দিয়ে ঘুরে ভাল করে দেখল গ্যালারিটা। পেছনে কেউ নেই। সন্দেহজনক কাউকে চোখ রাখতে দেখল না বাড়ির দিকে। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এল গাড়িতে।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। কাউকে আসতে দেখা গেল না গ্যালারির দিকে। সোডা কিনতে দোকানে ঢুকল রবিন। ফিরে এল দুটো বোতল নিয়ে।

নীরবে সোডা খাচ্ছে ওরা।

হঠাৎ রবিনের হাত খামচে ধরল কিশোর, 'কিছু একটা দেখলাম মনে হলো!'

অন্ধকার পথের দিকে তাকাল রবিন। হঠাৎ গ্যালারির গাড়িপথ ধরে একটা ছায়ামূর্তিকে ছুটে যেতে দেখল সে। কাঁধে একটা বস্তা।

'বেরোও! ধরতে হবে!'

'ঠিক!'

দু-দিকের দরজা খুলে লাফিয়ে নামল দুই গোয়েন্দা। দৌড় দিল লোকটাকে ধরার জন্যে। কিন্তু ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে আর দেখতে পেল না লোকটাকে।

থমকে দাঁড়াল ওরা।

হাত তুলে পার্কিং লটের পেছনে পাতাবাহারের বেড়া দেখাল রবিন। তার ওপাশে অন্য একটা বাড়ি। 'শিওর আমাদের দেখে ফেলেছে! লুকিয়েছে গিয়ে ওদিকটায়!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'চলো!'

পাতাবাহারের ডাল সরিয়ে পথ করে অন্যপাশে এল ওরা। বাড়িটার পাশ ঘুরে চলে এল বড় রাস্তার কাছে। কিন্তু কাঁধে বস্তা নিয়ে ছুটছে এমন কাউকে দেখতে পেল না।

'পালিয়েছে!' গুঙিয়ে উঠল রবিন।

'তুমি বাঁয়ে যাও, আমি ডানে। দু-দিক দিয়ে ঘুরে গাড়ির কাছে ফিরে যাব।' বলেই ছুটতে শুরু করল কিশোর।

যে কটা অন্ধকার গলিঘুচি পড়ল সবগুলো দেখল সে। দেখতে দেখতে ফিরে এল গাড়ির কাছে। তার কয়েক সেকেন্ড পর ফিরল রবিন। দু-জনের কেউই কিছু দেখেনি। বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন রহস্যময় ছায়ামূর্তি।

এই সময় একজন পুলিশ অফিসারকে গ্যালারির সামনের দরজা দিয়ে বেরোতে দেখে দৌড়ে গেল ওরা। দু-জনেই চেনে তাকে। অফিসারের নাম ওয়ারপার।

'কি ব্যাপার, মিস্টার ওয়ারপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'চোরটোর ঢুকেছে নাকি?'

'বুঝলাম না। এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি হাঁ হয়ে খুলে আছে দরজা। সন্দেহ হলো। মিস্টার পাওয়ারসকে ডাকাডাকি করলাম। তিনি নেই।'

দুরুদুরু করছে গোয়েন্দাদের বুক। তবে কি ওদের নজর এড়িয়ে বস্তায় ভরে জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে?

'ওই তো, তিনি আসছেন,' বলে উঠল ওয়ারপার।

দুই গোয়েন্দার সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গ্যালারির দিকে তাকালেন পাওয়ারস। 'কি হয়েছে?' দরজা খোলা দেখে দৌড় দিলেন। মিনিটখানেক পরই বেরিয়ে এলেন। চিৎকার করে বললেন, 'আমার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে! অনেক দামী দামী রূপার ফুলদানী আর ছবি নিয়ে গেছে!' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন, 'তোমরা কোথায় ছিলে!'

কি ঘটেছে জানাল কিশোর।

কড়া গলায় বললেন পাওয়ারস, 'হুঁ, যা ভেবেছিলাম! হঠাৎ মনে হলো, দেখে আসি তো কিছু ঘটল কিনা? ঠিকই ঘটেছে...তো, এই যে নিয়ে গেল, তোমরা কি করছিলে? পাহারা দিয়ে লাভটা কি হলো? আসলে ছেলেমানুষ দিয়ে কোন কাজ হয় না!' গজগজ করতে করতে আবার গ্যালারির ভেতর দৌড়ে গেলেন তিনি। পেছনে গেল ওয়ারপার।

খানিক পর তাকে নিয়ে আবার বেরোলেন পাওয়ারস। রাগে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে আপনমনেই কি বললেন। তালা লাগালেন দরজায়। ফিরেও তাকালেন না আর গোয়েন্দাদের দিকে। গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

'তারমানে তালা ভেঙে ঢোকেনি চোর,' অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

'না। পেছনের একটা জানালা দিয়ে ঢুকেছে। জানালাটা অনেক ওপরে, আর খুব ছোট। ওটা দিয়ে ঢোকা কঠিন। সার্কাসের দড়াবাজিকর হলে, আর একেবারে রোগা হলেই কেবল সম্ভব।' আনমনে মাথা নাড়তে লাগল ওয়ারপার। ব্যাপারটা অবাক করেছে তাকে। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পারলে কাল সকাল সাতটার দিকে একবার থানায় এসো। তোমাদের কথা শুনব।'

'আসব,' কথা দিল কিশোর। চিন্তিত হয়ে আছে সে। খচখচ করছে মন। কোথায় যেন কি একটা মিলছে না।

ওয়ারপার চলে গেল।

গাড়িতে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা।

রাগত স্বরে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'চোরের মুখ দেখেছ?'

'মুখ দেখিনি, তবে মাথার হ্যাটটা দেখেছি। তিনকোনা। পাওয়ারস যাকে ঘুরঘুর করতে দেখেছেন সেই লোকই হতে পারে। তোমার কিছু চোখে পড়েছে?'

'না,' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'এই অন্ধকারে দেখা যায় নাকি কিছু?'

তা বটে। মাথা নাড়ল কিশোর। গাড়ির দরজা খুলে ঢুকতে গিয়ে থমকে

দাঁড়াল। পরক্ষণে এক ঝটকায় দরজা লাগিয়ে লাফিয়ে সরে এল।
বিচিত্র খটখট শব্দে ভরে গেছে গাড়ির ভেতরটা।

দুই

ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা খুলতে যাচ্ছিল রবিন, চিৎকার করে তাকে বলল কিশোর, 'খুলো না! দরজা খুলো না!'

বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। গাড়ির মধ্যে কিলবিল করছে র‍্যাটলস্নেক। সাপগুলোর লেজে বোতামের মত জিনিস থেকে শব্দ হচ্ছে। সুযোগ দিলেই ছোবল মারবে। দুটো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ড্রাইভিং সীটে, মেঝেতে রয়েছে কতগুলো, একটা উল্টো হয়ে ঝুলে আছে প্যাসেঞ্জার সীটের হেলান থেকে।

'ঢুকল কি করে?' হতভম্ব হয়ে গেছে কিশোর।

'ঢোকানো হয়েছে,' রবিন বলল। 'ওই তেকোনা হ্যাটওয়ালা ফেলে গেছে। জেনে গেছে আমরা পাহারা দিতে এসেছি।'

'কি করে জানল?'

'আমি কি করে বলব?'

'হুঁ। যাই হোক, এই গাড়িতে করে তো বাড়ি ফিরতে পারব না। ফোন করা দরকার।'

ইয়ার্ডে ফোন করতে চাইল কিশোর। কিন্তু ফোনটা ব্যস্ত। দেরি করতে ভাল লাগছে না। অগত্যা মুসাকে ফোন করল।

সঙ্গে সঙ্গে ধরল মুসা।

'আমি কিশোর...'

'কি ব্যাপার? এত রাতে?'

জানাল কিশোর।

মুসা বলল, 'এখুনি চলে আসছি।'

মোড়ের কাছে বসে থেকে মুসার ভটভটির আওয়াজ শুনল কিশোর আর রবিন। একটা ঝরঝরে জেলপি কিনেছে মুসা। এ রকম একটা গাড়ি আগেও একবার কিনেছিল। সারিয়ে-সুরিয়ে বেচে দিয়েছে। এটা এখনও সারানো হয়নি। হলেও ওই বিকট শব্দ বন্ধ হবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে টর্চের আলোয় সাপগুলোকে দেখল মুসা। অবাক হয়ে বলল, 'এদিকের পাহাড়ে এত র‍্যাটলস্নেক আছে তা তো জানতাম না!'

'আমিও না,' কিশোর বলল। 'থাক গাড়িটা। চুরি হবে না। সাপগুলোই পাহারা দেবে।'

মুসার জেলপিতে করে ইয়ার্ডে ফিরল কিশোর।

রবিনকে নিয়ে চলে গেল মুসা। ওকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দেবে।

ভিকটর সাইমনকে ফোন করে সব কথা জানাল কিশোর।

শুনে তিনিও অবাক হলেন। বললেন, 'তারমানে তেকোনা হ্যাটওয়ালা লোকটাকেই সন্দেহ করতে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। আমি ভাবছি, স্যার, সাপগুলোর কথা। এল কোত্থেকে ওগুলো? এত র‍্যাটলস্নেক একসঙ্গে কখনও দেখিনি।'

'এটা একটা মূল্যবান সূত্র হতে পারে। ভেবে দেখো।'

লাইন কেটে দিলেন সাইমন।

পরদিন সকালে ওঅর্কশপে বসে ব্যাপারটা নিয়ে দুই সহকারীর সঙ্গে আলোচনা করল কিশোর।

কিছুক্ষণ শুনেটুনে মুসা বলল, 'আমি বাপু কোন সমাধান দিতে পারছি না। দুঃখিত।'

রবিন বলল, 'এক কাজ করতে পারি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে কোন হারপিটোলজিস্টকে জিজ্ঞেস করতে পারি।'

'কি লজিস্ট?' মুখচোখ বিকৃত করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সরীসৃপ বিশেষজ্ঞ।'

'তাই বলো। উফ্, কি সব কঠিন কঠিন নাম! চলো, যাই।'

'চলো,' রবিনের পরামর্শটা কিশোরেরও পছন্দ হলো।

চিড়িয়াখানায় যাওয়ার জন্যে বেরোল তিন গোয়েন্দা। পথে থানায় নেমে অফিসার ওয়ারপারের কাছে গতকাল রাতের পুরো ঘটনার রিপোর্ট লিখে দিল কিশোর আর রবিন।

চিড়িয়াখানার হারপিটোলজিস্টের বয়েস কম, সুদর্শন, সদ্য কলেজ থেকে পাস করেছেন। জলপাই রঙের চামড়া, কালো চুল, বড় বড় চোখ। এই লোক অভিনেতা কিংবা ওই রকমই কিছু না হয়ে সাপের মত জঘন্য প্রাণীর গবেষক হতে গেলেন কেন বুঝতে পারল না মুসা।

অফিসে বসে কিশোর আর রবিনের কথা শুনলেন তিনি। আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, 'গাড়ির মধ্যে সাপ রেখে গেছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন। 'তেকোনা হ্যাট পরা একটা লোক। এখানে ওরকম কেউ সাপ সংগ্রহ করে বলে জানেন?'

মাথা নাড়লেন হারপিটোলজিস্ট। 'এখানে সাপ সংগ্রহ করার মানুষ খুব কম। তাদের সবাইকে চিনি। কেউ তেকোনা হ্যাট পরে না। তা ছাড়া এই এলাকায় র‍্যাটলস্নেকও নেই। যা আছে কেবল চিড়িয়াখানায়।'

'খোয়া গেছে?' জানতে চাইল মুসা।

'একটাও না। আজ সকালেই দেখেছি।'

পেছনের ঘরে গিয়ে একটা চটের বস্তা আর মাথায় তারের আঙটা লাগানো একটা লাঠি নিয়ে এলেন সরীসৃপ বিশেষজ্ঞ। গোয়েন্দাদের সঙ্গে চললেন গাড়ি থেকে সাপ ধরে আনতে।

গাড়িতেই রয়েছে সাপগুলো। দক্ষ হাতে লাঠির আঙটা একটা সাপের মাথা দিয়ে গলিয়ে পেটের কাছাকাছি এনে তুলে ধরলেন। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল সাপটা, কিন্তু বাধা দিল না। বাধা দেয়ার অবস্থাও নেই। আলতো করে বের করে

এনে ওটাকে বস্তায় ভরে ফেললেন তিনি।

দেখতে দেখতে সব কটা সাপ ধরে ফেললেন। বললেন, 'রাতের বেলা গাড়ির মধ্যে ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে সাপগুলোর শরীর। তাতে ক্ষিপ্রতা কমে গেছে। ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণীদের অমনই হয়।'

'কোন জাতের র‍্যাটল এগুলো, বলুন তো?' জানতে চাইল রবিন।

তার কৌতূহল দেখে হাসলেন হারপিটোলজিস্ট। 'পিগমি। র‍্যাটলস্নেকের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জাত। বিষও কম। একটার কামড়ে হয়তো মরবে না, কিন্তু কয়েকটার কামড় যদি খাও, বেঁচে থাকা কঠিন হবে।'

ভাগ্যিস লেজ নেড়ে শব্দ করে র‍্যাটল, নইলে কাল রাতে গাড়িতে উঠে বসলে কি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটত ভেবে শিউরে উঠল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'এই এলাকায় নেই এগুলো, না?'

'না। পিগমি র‍্যাটলস্নেকের বাস দেশের দক্ষিণ-পুব অঞ্চলে। ফ্লোরিডা, ক্যারোলিনা, আলবামা, জর্জিয়া, এসব জায়গায়।'

'রকি বীচে কারো বাড়িতে পোষা ছিল না তো? চুরি করে আনা হতে পারে।'

'না, এখানে কে কে সাপ পোষে ভাল করেই জানি। এত পিগমি কারও কাছে নেই। চিড়িয়াখানায়ও না। আমি শিওর, বাইরে থেকে আনা হয়েছে এগুলো।'

অনেকগুলো সাপ পেয়ে গিয়ে খুশিতে ডগমগ হলেন হারপিটোলজিস্ট।

তদন্ত চালাল গোয়েন্দারা। আশপাশটা ভাল করে দেখতে লাগল, সূত্রের আশায়।

চটের বস্তাটা খুঁজে পেল রবিন। রাস্তার ধারে একটা গাছের মাথায় আটকে ছিল। নিয়ে এসে ড্রাইভওয়েতে দাঁড়ানো মুসা আর কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'মনে হয় এটাতে করেই সাপগুলো আনা হয়েছিল।'

বস্তাটা হাতে নিয়ে দেখল কিশোর। একপিঠে একটা কুণ্ডলী পাকানো র‍্যাটলস্নেকের ছবি। নিচে লেখা:

DON'T TREAD ON ME!

'খাইছে!' হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'এর মানে কি?'

রবিন বলল, 'মানে আর কি, আমাকে মাড়িয়ে দিয়ো না। ইতিহাস ঠিকমত পড়লে তুমিও জানতে, বিপ্লবের সময় আমেরিকান ঔপনিবেশিকরা এই প্রতীক ব্যবহার করত।'

'কিসের জন্যে?'

মুসার প্রশ্ন যেন শুনতে পায়নি রবিন, বিদ্যে ঝাড়ার সুযোগ পেয়ে গেছে, 'বিপ্লবী যোদ্ধাদের অনেক সৈনিক ব্যানারে র‍্যাটলস্নেকের ছবি এঁকে নিত। ইয়োরোপে এই সাপ নেই। তাই ওসব দেশ থেকে আমেরিকায় আসা পর্যটকরা এর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তাদের আগ্রহের বিশেষ কারণ, ছোবল মারার আগে শব্দ করে সাবধান করে র‍্যাটল। ধীরে ধীরে এক সময় তেরোটা উপনিবেশের প্রতীক হয়ে যায় এই সাপ এবং নিচের এই লেখা। যেন বোঝাতে চেয়েছে—আমাদের বিরক্ত কোরো না। সতর্ক করলাম। যদি না শোনো, নিষ্ঠুর আঘাত হেনে হত্যা করা হবে তোমাদের।'

মুসা বলল, 'তবে কি কাল রাতে তোমাদের এই ইঙ্গিতই দিয়ে গেল লোকটা?'

'সে-রকমই তো লাগছে,' জবাব দিল কিশোর। 'মনে হচ্ছে তেকোনা হ্যাটওয়ালা লোকটার সঙ্গে আমেরিকার পুরানো বিপ্লবীদের কোন সম্পর্ক আছে।'

'এতদিন পর কি আর সম্পর্ক থাকবে।' রসিকতা করে বলল মুসা, 'হয়তো ভাবছে, এখনও বিপ্লব চলছে। সুতরাং বিরোধীর ভাঁড়ার থেকে চুরি করা যায়েজ।'

কিশোরের হাত থেকে বস্তাটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বলে উঠল রবিন, 'ভেতরে কিছু আছে!'

সাপ আছে ভেবে চমকে গেল কিশোর আর মুসা। কিন্তু ভেতর থেকে বেরোল একটা কাঁচের শিশি। খালি। তবে যে জিনিস ভরা ছিল সেটার কড়া গন্ধ রয়ে গেছে এখনও।

'দেখি তো?' হাত বাড়ালেন হারপিটোলজিস্ট।

শিশিটা দিল রবিন।

শিশির মুখ শুঁকে বললেন বিশেষজ্ঞ, 'সাপের তেল ছিল এতে।' ফিরিয়ে দিলেন শিশিটা।

'সাপের তেল?' একসঙ্গে বলল তিন গোয়েন্দা।

'হ্যাঁ। আগে হাতুড়েরা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করত এই তেল। মাথাধরা আর চুলকানি থেকে শুরু করে হাজার রকম রোগের চিকিৎসা করত। তবে সারত কতখানি রোগীই জানত। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণ হয়নি এর কোন রকম রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে।'

'আজকাল তো আর এই তেল ব্যবহার করে না কেউ,' কিশোর বলল। 'তাহলে? কার কি প্রয়োজনে লাগল?'

'একেবারেই করে না তা নয়,' হারপিটোলজিস্ট জবাব দিলেন। 'সার্কাসের কিছু কিছু বয়স্ক লোকের কাছে এখনও এর চাহিদা আছে। ওদের বিশ্বাস, সাপের তেল সেবন করলে সাপের মত নিঃশব্দ আর ক্ষিপ্র, গতিশীল হতে পারবে। তাতে সার্কাসের খেলা দেখাতে কোন অসুবিধে হবে না। কোন সার্কাসে হাতুড়ে ডাক্তার থাকলে তার কাছ থেকে কিনতে পারবে সাপের তেল।'

'কিন্তু এই এলাকায় এখন কোন সার্কাস খেলা দেখাচ্ছে না।'

'একটা কার্নিভ্যাল আছে কিন্তু!' রবিন বলল। 'ওটাও সার্কাসই, ভ্রাম্যমাণ সার্কাস। চলো না আজ রাতেই যাই? সাপুড়ে থাকলে তার সঙ্গে কথা বলব।'

'ভাল কথা বলেছ,' সমর্থন করল কিশোর।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চমকে গেল মুসা। 'হায় হায়, আমার খেলা!' গোয়েন্দাগিরির উত্তেজনায় বাস্কেটবল খেলার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে।

হারপিটোলজিস্টকে চিড়িয়াখানায় পৌঁছে দিয়ে স্কুলে চলে এল তিন গোয়েন্দা। মুসা খেলবে, রবিন আর কিশোর দর্শক। শোরমন্ট কলেজের সঙ্গে ম্যাচ।

দেখা গেল, রকি বীচের একজন ভাল খেলোয়াড় বিড ওয়াকার অনুপস্থিত। অস্থির হয়ে গেলেন কোচ অ্যামেন্ডসন। বিকল্প আরেকজন খেলোয়াড়কে কোর্টে নামানোর কথা ভাবছেন. এই সময় দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হলো বিড।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কোচ। তখন আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। দেরির কারণ পরেও জানা যাবে। এসেছে, এতেই খুশি তিনি।

কিন্তু বিডের হাবভাবে সন্দেহ হলো কিশোরের। বিশেষ করে তার চেয়ারের কাছাকাছি এসে যখন হাত নাড়ল সে।

তিন

তুমুল প্রতিযোগিতার পর রকি বীচ খুব সামান্য পয়েন্টে জিতল। কোর্ট থেকে হিরো হয়ে বেরিয়ে এল মুসা আর বিড। লকার রুমের দিকে চলল।

ওদের পেছনে চলল কিশোর আর রবিন।

লকার রুমে ঢুকে দেরির কারণ জানতে চাইল মুসা।

পেছনে তাকিয়ে দেখল বিড, কিশোর আছে কিনা। কণ্ঠস্বর নিচু করে বলল, 'একটা গোলমাল হয়েছে।'

কান খাড়া করল কিশোর। সতর্ক হলো। এগিয়ে এল এক পা। 'গোলমাল?'

'নিউ অরলীনস থেকে আমার দাদা আসার কথা ছিল। এয়ারপোর্টে গেলাম তাকে তুলে আনতে। কিন্তু এল না। ভাবলাম ফ্লাইট মিস করেছে, পরেরটাতে আসবে। অপেক্ষা করতে করতে দেরি হয়ে গেল।'

'এসেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা নাড়ল বিড, 'না। ভাবলাম, অসুখ-টসুখ করেনি তো? ফোন করলাম। ক্লাবে নেই।'

'ক্লাব আছে নাকি তাঁর?'

মুহূর্তের জন্যে বিডের চেহারা থেকে উদ্বেগ দূর হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আছে। চমৎকার বাঁশি বাজাতে পারে। বংশীবাদক হিসেবে নিউ অরলীনসের জ্যাজ দলে অনেক খাতির। দারুণ পপুলার।' দাদার প্রশংসা করতে গিয়ে গর্বে ফুলে উঠল নাতির মুখ। 'আসল নাম ডেভিড ওয়াকার। কিন্তু ওখানকার লোকেরা তাকে বাঁশি ওয়াকার নামেই বেশি চেনে।'

'তুমি মনে হচ্ছে দাদার খুব ভক্ত?' হেসে বলল রবিন।

'হ্যাঁ। তার বাঁশি শুনলে তুমিও ভক্ত হয়ে যাবে। খুব আশা করে বসেছিলাম আজ এসে দাদা আমার খেলা দেখবে। কিন্তু হলো না।'

'কেন এলেন না, বুঝতে পারছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

বলতে চেয়েও বলল না বিড। ঘরে আরও ছেলেরা আছে, ওদের দিকে চেয়ে থেমে গেল। তাড়াহুড়ো করে পোশাক পাল্টে বেরিয়ে গেল লকার রুম থেকে।

বিডের আচরণ রহস্যময়—এ ব্যাপারে একমত হলো তিন গোয়েন্দা।

বাড়ি ফেরার আগে কার্নিভ্যালে যেতে হবে। বিডের ভাবনা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়ে সেখানেই চলল ওরা।

কার্নিভ্যালে পৌঁছে বুথ অ্যাটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করে জানল, সাপুড়ে একজন

আছে, এক প্রৌঢ়া মহিলা, নাম মারথা। বুথের পাশের ফানহাউসে দেখা মিলল তার।

একটা অজগর সাপের যত্ন করছে মারথা। এই সময় ঢুকল ছেলেরা। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'সাপের তেল? আজকাল তো আর এ-জিনিস কেউ ব্যবহার করতে চায় না।'

অন্য প্রসঙ্গে গেল কিশোর। চটের বস্তাটার ভাঁজ খুলে ছড়িয়ে, সাপের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই প্রতীক আর দেখেছেন কখনও?'

আগ্রহ নিয়ে ছবিটা দেখল মারথা। 'দেখেছি। আমেরিকার বিপ্লবের সময় ব্যবহার হত, তাই না?'

'হ্যাঁ। ইদানীং কোথাও দেখেছেন নাকি?'

ভাবতে লাগল মারথা। মনে করার চেষ্টা করছে। মাথা ঝাঁকাল। 'দেখেছি। জর্জিয়ায় এক বুড়োর কাছে। সাপ পাগল লোকটা। র‍্যাটলস্নেকের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিল আমার সঙ্গে। বদ্ধ উন্মাদ!'

'জর্জিয়া!' ফিসফিস করে কিশোরের কানে কানে বলল রবিন। 'হারপিটোলজিস্টের কথা মনে আছে? তিনি বলেছেন পিগমি র‍্যাটলস্নেক জর্জিয়ায় পাওয়া যায়।'

আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে, মারথাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'বুড়োর কাছে র‍্যাটলস্নেক ছিল?'

'অনেক। এতগুলো,' দুই হাত ছড়িয়ে দেখাল মারথা। 'জলার কাছ থেকে ধরে আনে। বাড়িতে খাঁচায় ভরে রাখে।'

'প্রতীকের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?' মুসা জানতে চাইল।

'এ রকম বস্তা ছিল তার কাছে। আমাকে বলল, এই বস্তায় ভরে সাপ নিয়ে বেড়াতে সুবিধে। আমাকেও বলল ব্যবহার করতে। বলে দিলাম, আমার ঠেকা নেই। র‍্যাটলস্নেক দেখতে পারি না আমি। বড় বেয়াড়া। মারাত্মক। ওই সাপ দিয়ে খেলা দেখানো যায় না।'

'জর্জিয়ায় বুড়ো কোথায় থাকে জানেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সোয়াম্প ক্রীক নামে এক শহরে,' মারথা বলল। 'ওকিফেনোকি সোয়াম্পের কিনারে এই শহর। বুড়োকে ওখানে সবাই চেনে, ওর পাগলামির জন্যে।'

'রোজগার কি? পেট চালায় কি করে? সাপের ব্যবসা?'

'না। পুরান বাজারে পুরানো মাল বেচাকেনা করে। পুরানো তৈজসপত্র, কাপড়, আসবাব, এ সব। আমার মনে হয় সস্তায় যা পায় তাই কিনে বিক্রি করে।'

'তার ঠিকানা জানেন?'

'না। তবে তাকে খুঁজে বের করার জন্যে ঠিকানা লাগে না। গিয়ে খালি বলবে, সাপ পালে যে বুড়োটা, তেকোনা হ্যাট পরে, তার বাড়ি যেতে চাই; যে কেউ দেখিয়ে দেবে।'

'তেকোনা হ্যাট!' মারথার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'হ্যাঁ। বলেছিই তো, বুড়োটার মাথায় গোলমাল আছে। নইলে ওই জিনিস কেউ পরে আজকাল।'

মারথাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ফিরে চলল ইয়ার্ডে।

গেটে দেখা ব্যাভারিয়ান দুই ভাইয়ের একজন, রোভারের সঙ্গে। কিশোরকে বলল, 'একটা ছেলে এসে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে তোমার জন্যে।'

'কে?'

'নাম বলেনি। বলেছে ইস্কুলের বন্ধু।'

'কোথায়?'

'ওঅর্কশপে বসিয়েছি।'

তাড়াহুড়ো করে সেদিকে চলল ওরা।

চার

ওদেরকে দেখেই উঠে দাঁড়াল বিড ওয়াকার।

'বিড, তুমি!' কিশোর বলল।

নীরবে মাথা নাড়ল বিড। বলল, 'বাড়ি গিয়েই পেলাম এটা। দেখাতে নিয়ে এলাম তোমাকে।' টেবিলে রাখা একটা মলাটের বাক্স দেখাল সে।

বাক্সের ঢাকনা খুলেই স্থির হয়ে গেল কিশোরের হাত। একটা মরা পাখি শুয়ে আছে।

'নিউ অরলীনস থেকে পাঠানো হয়েছে আমার নামে,' শুকনো গলায় জানাল বিড। 'পাখিটার ঠোঁটে বাঁধা ছিল একটুকরো কাগজ। তাতে দাদার নাম নয়বার লেখা।'

'কোন ধরনের ডাকিনীবিদ্যা মনে হচ্ছে,' রবিন বলল।

'সর্বনাশ!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। মরা পাখিটার কাছ থেকে সরে এল দুই কদম। ভূতপ্রেতে ভীষণ ভয় তার।

'ভুডু,' বলল বিড। 'শত্রুর ওপর জাদুর প্রভাব ফেলে ক্ষতি করার জন্যে এ সব করে ভুডু চর্চাকারীরা।'

কিশোর জানতে চাইল, 'তোমার দাদা কোনভাবে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন ভাবছ?'

মাথা ঝাঁকাল বিড। 'হ্যাঁ। আজ ফোন করেছিল। চিন্তা করতে পারে, তাই পাখিটার কথা বলিনি তাকে। কেন আসেনি, সরাসরি বলল না। বলল জরুরী কাজে আটকা পড়েছে। কিন্তু তাকে উদ্বিগ্ন মনে হলো। কোন কিছু এড়িয়ে গেল। আমাকে বলতে ভয় পাচ্ছিল মনে হয়েছে।'

আবার মেঘ জমেছে তার মুখে। 'প্লীজ, পাখিটার কথা কাউকে বলবে না। আমার মাকে কিংবা বাবাকেও না। দাদা ভুডুওলাদের সঙ্গে মিশেছে জানলে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। তোমরা গোয়েন্দা বলে তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। কোন ভাবে কি সাহায্য করতে পারো আমার দাদাকে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল কিশোর। 'রকি বীচে হলে খুব সহজেই পারতাম। কিন্তু তোমার দাদা থাকেন অনেক দূরে, নিউ অরলীনসে। সাহায্য করতে হলে সেখানে যেতে হবে আমাদের। ঠিক আছে, ভেবে দেখি। কাল জানাব।'

ওদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে, বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে গেল বিড।

'চলে গেলে কিন্তু মন্দ হয় না,' রবিন বলল। 'মারথা যে বুড়োর কথা বলল, তার সঙ্গে আমাদের অ্যান্টিক চোরের অনেক মিল। গেলে বিডের দাদার ভুডু কেসটারও একটা সুরাহা করতে পারতাম।'

'আসলে বেড়াতে যাওয়ার ছুতো খুঁজছ তুমি,' আনমনে নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল কিশোর। 'জর্জিয়া থেকে নিউ অরলীনস অনেক দূরে। আর এখান থেকে দুটো জায়গাই বহুদূর। যাব কি করে?'

চেয়ারে হেলান দিল রবিন, 'তা জানি না। বেড়াতে গেলে দূরে যাওয়াই ভাল।'

একমত হলো মুসা, 'আমিও তাই বলি। তবে ভুডুওলাদের কাছে যেতে চাই না আমি।'

'তারমানে তুমি যেতে চাও না ওখানে?'

'চাই না বললে ভুল হবে। গেলেও ভুডুওলাদের কাছ থেকে দূরে থাকব আরকি।'

নীরবে রিসিভার তুলে নিয়ে সাইমনকে ফোন করল কিশোর। বাড়িতেই আছেন তিনি। কয়েক মিনিট পরে হলে আর পাওয়া যেত না, বেরিয়ে যেতেন। কিশোরের কথা শুনে বললেন, 'মারথা যে বুড়োর কথা বলেছে, তার ব্যাপারে তদন্ত করা দরকার। পাওয়ারসের গ্যালারিতে হয়তো ওকেই দেখেছ; তোমাদের গাড়িতেও সাপ রেখেছে সে।'

'পুরানো জিনিসের বাজারে যে সব মাল বিক্রি করে সে,' কিশোর বলল, 'ওগুলোও নিশ্চয় চোরাই মাল। শুধু গ্যালারিতেই নয়, আরও নানা জায়গায় চুরি করে বেড়ায় সে।'

'খুব জোরাল যুক্তি। এক কাজ করো না, চলেই যাও।'

'সোয়াম্প ক্রীকে যেতে বলছেন?' উত্তেজিত স্বরে বলল কিশোর।

'অসুবিধে কি? খরচের কথা ভেব না। তদন্ত করতে গেলে গোয়েন্দার খরচ-খরচার ভার তো মক্কেলকেই নিতে হয়, তাই না?' হাসলেন সাইমন।

চুপ করে রইল কিশোর।

'কালই রওনা হয়ে যাও তাহলে। পাওয়ারসকে বলে প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করছি আমি। তোমরা তৈরি হতে থাকো। রাখলাম।'

সাইমন কি বলেছেন দুই সহকারীকে জানাল কিশোর।

সেই রাতেই ফোন করল বিডকে। বলল, 'বিড? কাল জর্জিয়ায় যাচ্ছি আমরা, বেড়াতে।' গ্যালারিতে চুরির কথাটা গোপন রাখল সে। 'সেখান থেকে ইচ্ছে করলে নিউ অরলীনসে যেতে পারি।'

'তারমানে দাদার কেসটার তদন্ত করবে!' উত্তেজিত হয়ে উঠল বিড।

'যাব যখন করতে অসুবিধে কি? কিন্তু তাঁকে পাব কি করে?'

'সহজ, একেবারেই সহজ। নিজের নামেই ক্লাবের নাম রেখেছে দাদা। বুরবন স্ট্রীটে পাবে ওটা। আরও অনেক জ্যাজ ক্লাব আছে ওখানে। ক্লাবের ওপরতলায় তার বাসা, এক্সট্রা শোবার ঘরও আছে। তোমাদের থাকার অসুবিধে হবে না।'

'তাহলে তো ভালই।'

'যাও, বুঝলে, খারাপ লাগবে না। তা ছাড়া এখন মারদি গ্রাসের সময়। ভাল লাগবে তোমাদের, বলতে পারি।'

বাৎসরিক একটা উৎসব হয় নিউ অরলীনসে, শুনেছে কিশোর, এক হপ্তা ধরে বিশাল এক পার্টিতে পরিণত হয় যেন পুরো শহরটা। বলল, 'তদন্তের কাজে ব্যস্ত থেকে কতটা কি দেখতে পারব জানি না। তবু কিছু তো পারব।'

পরদিনই রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। ওয়াশিংটনে প্লেন বদল করতে হলো। দক্ষিণে সাভান্নার দিকে চলল প্লেন। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে পুরানো একটা সুন্দর বন্দর ওটা। একসময় তুলার ব্যবসায় সরগরম ছিল শহরটা। প্রায় একশো বছর আগে তাই নামই দিয়ে ফেলা হয়েছিল: দি কুইন অভ দা জর্জিয়া কোস্ট—অর্থাৎ, জর্জিয়া উপকূলের রানী।

প্লেন থেকে নেমে শহরের পথ ধরে বাস স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল, 'এ তো মনে হচ্ছে অন্য কোন যুগে চলে এলাম!'

হাসল কিশোর। 'অন্য যুগ না হলে কি ভূতপ্রেতের উপাসনা মানায়?'

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল মুসা।

আরও দক্ষিণে যাওয়ার একটা বাসে চাপল ওরা।

ছোট্ট শহর সোয়াম্প ক্রীকে নামতে নামতে রাত হয়ে গেল।

প্রধান সড়কের ধারে কয়েকটা দোকানপাট আর একটা মোটেল। দোকানগুলো সব বন্ধ। একটা লোকও চোখে পড়ল না। পথের ধারে সারি সারি সাইপ্রাস গাছ থেকে বুড়ো মানুষের দাড়ির মত ঝুলে আছে এক ধরনের শ্যাওলা, স্প্যানিশ মস। অদ্ভুত দৃশ্য। গায়ে কাঁটা দেয়।

হাতে সুটকেসের বোঝা নিয়ে একটা মোটেলে ঢুকল ওরা। রাত কাটানোর ঘর চাইল। লবিতে লাল নিওনের আলো দিয়ে লেখা মোটেলের নাম:

সোয়াম্প ক্রীক ইন।

ডেস্কে বসে আছে একজন ক্লার্ক। দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মানুষজন থাকে না নাকি এদিকে?'

'থাকবে না কেন। সবাই এখন ডিনার খাচ্ছে,' মোলায়েম জড়ানো গলায় বলল লোকটা। মুসাকে চাবি ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'সোজা চলে যাও। শেষ মাথায় পাবে ঘর।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'খাব কোথায়? কাছাকাছি রেস্টুরেন্ট আছে?'

বুড়ো আঙুল বাঁকা করে লবির পেছন দেখাল ক্লার্ক, 'ওদিকে। খোলা আছে।'

ঘরে মালপত্র রেখে রেস্টুরেন্টে চলল তিন গোয়েন্দা।

টেবিল চেয়ার প্রচুর আছে, কিন্তু মানুষ নেই। দরজায় দাঁড়িয়ে গেল ছেলেরা। ঢুকবে কিনা দ্বিধা করতে লাগল।

'কি সাহায্য করতে পারি?' পাশ থেকে এগিয়ে এল একটা মেয়ে, ওদের দু-

তিন বছরের বড় হবে। ওয়েইট্রেসের সাদা পোশাক পরনে। হালকা বাদামী চুল, নীল চোখ। দক্ষিণী টানে সুরেলা স্বরে কথা বলে।

'খাবার পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল রবিন।

'যাবে।' বসার জন্যে একটা টেবিল দেখিয়ে দিল মেয়েটা। খাবারের মেন্যু দিল। 'রাউন্ডআপে এলে নাকি?'

অবাক হলো কিশোর। 'রাউন্ডআপ?'

'র‍্যাটলস্নেক রাউন্ডআপ। আগামীকাল শুরু হবে।'

ছেলেরা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না জেনে বুঝিয়ে দিল মেয়েটা। বলল, আগামী দিন থেকে সোয়াম্প ক্রীকের বাৎসরিক র‍্যাটলস্নেক ফেস্টিভাল শুরু হবে। আশপাশের সব জায়গা থেকে লোক আসবে সাপ ধরায় সাহায্য করার জন্যে।

'সাপ ধরে কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ধরবে না? না ধরে উপায় কি। প্রতি বছর যে হারে বংশ বৃদ্ধি করে সাপেরা। ধরে ধরে কমিয়ে রাখি আমরা। নইলে সাপ ছাড়া এখন আর কিছু দেখতে পেতে না শহরটাতে। এই সময়টাতেই ধরা সহজ। বাসার মধ্যে থাকে ওরা।' দরজা দিয়ে অনেকগুলো ঘরের দরজা চোখে পড়ে। সেগুলো দেখিয়ে মেয়েটা বলল, 'আজ সব খালি দেখছ। কাল একটা ঘরও থাকবে না, বোঝাই হয়ে যাবে। রাউন্ডআপের জন্যে আসবে সবাই। আমি তো ভেবেছি তোমরাও এ জন্যেই এসেছ।'

'না, আমরা এসেছি তদন্ত করার জন্যে,' গর্ব করে বলতে গিয়ে ফাঁস করে দিল মুসা। 'সাপ ধরার চেয়ে সেটা অনেক জরুরী।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটার। 'এফবিআইয়ের এজেন্ট নাকি তোমরা?'

'আরে না, ওসব কিছু না,' কিশোর বলল। 'আমরা আসলে একজন লোককে খুঁজতে এসেছি।' হাতব্যাগ খুলে র‍্যাটলস্নেক আঁকা চটের বস্তাটা বের করল সে। মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল, 'এখানে এ জিনিস দেখেছ?'

'দেখেছি। বুড়ো ডনিগান ব্যবহার করে এই থলে। এটা তারই জিনিস।'

'কি জানো তার সম্পর্কে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মেয়েটা, 'তাকেই খুঁজতে এসেছ?'

'কি জানি, হয়তো,' এড়িয়ে গেল কিশোর। 'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে, জানো?'

'হাল স্ট্রীটে থাকে। পুরো নাম ভিরেনসন ডনিগান। বাড়িতে তো কমই থাকে। তাকে কি দরকার?'

'কয়েকটা প্রশ্ন করব,' রবিন বলল। 'তাকে পাব কি করে?'

'এক মিনিট। আসছি।' তাড়াহুড়ো করে চলে গেল মেয়েটা। মোটেলের ক্লার্ককে নিয়ে ফিরে এল। ছেলেদের দিকে এগোনোর সময় মাথা চুলকাতে লাগল লোকটা।

'আমার ভাস্তি এনডি বলল,' একটা চেয়ার টেনে বসে মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল সে, 'তোমরা নাকি বুড়ো ডনিগানকে খুঁজছ। তাকে কি দরকার?'

আর গোপন করে লাভ হবে না বুঝে কিশোর বলল, 'আমরা শখের গোয়েন্দা। তাকে দরকার আছে। কি দরকার সেটা বলা যাবে না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ক্লার্ক। তারপর বলল, 'কাল রাউন্ডআপে আসতে পারে। হাল স্ট্রীটে বাড়ি আছে তার, কিন্তু সেখানে পাবে না। ফেস্টিভালে আসে গোলমাল বাধানোর জন্যে।' ছেলেদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে বুঝিয়ে দিল সে, বুড়ো র‍্যাটলস্নেক ভালবাসে। তার মতে প্রতি বছর হাজার হাজার সাপকে খুন করাটা অত্যন্ত অমানবিক, নিষ্ঠুরতা। এটা বন্ধ করা দরকার। সুতরাং উৎসবে আসে খুনের আনন্দে মেতে ওঠা মানুষগুলোকে ঠেকাতে।

সবশেষে বলল ক্লার্ক, 'পাগলাটে বুড়ো। সাবধান, তার সঙ্গে গোলমাল কোরো না। হঠাৎ দেখবে তোমার শার্টের ভেতর র‍্যাটলস্নেক ঢুকে বসে আছে। কামড় খেয়ে মরবে।'

নীল-চোখ ওয়েইট্রেস মেয়েটা ওদের খাবার এনে দিল। গরম গরম গরুর মাংসের শিককাবাব, কর্ন, আর হুশ পাপি।

একটা মুহূর্ত দেরি করল না মুসা। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল। অন্য দু-জনেরও খিদে পেয়েছে। ওরাও প্লেট টেনে নিল।

খাওয়া শেষ করে বিল মিটিয়ে, মেয়েটাকে ধন্যবাদ দিয়ে রুমে ফিরে এল ওরা। খরচ কমানোর জন্যে একটাই ঘর নিয়েছে। তাতে দুটো বিছানা। তিনজন থাকতে পারবে না। তাই ক্লার্ককে বলে একটা বাড়তি লোহার চারপায়ার ব্যবস্থা করল রবিন।

বিছানায় শুয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'র‍্যাটলস্নেক রাউন্ডআপের কথা পড়েছি আমি। সাপের বংশ ধ্বংস করার জন্যে সাপ মারে না ওরা। আসলে একটা বড় ধরনের উৎসব চায় শহরে, যাতে সবাই কিছু টাকা কামাতে পারে।'

'এ ছাড়া আর করবেই বা কি?' মুসা বলল, 'শহরটার যা অবস্থা। সাপ মারার জন্যে লোক এলে মোটেলে ওঠে, দোকানগুলোতে বিক্রিটিক্রি হয়। টাকার বোধহয় খুব অভাব এখানকার মানুষের।'

'হাজার হাজার সাপের জীবনের বিনিময়ে টাকা রোজগার করবে মানুষ,' চারপায়ায় শুয়ে রবিন বলল। 'বুড়ো ডনিগানের মত আমিও মানতে পারছি না ব্যাপারটা। বড় নিষ্ঠুরতা। সমস্ত প্রাণীর জন্ম হয়েছে যেন কেবল মানুষের খেদমত করার জন্যে!'

আস্তে আস্তে বন্ধ হলো আলোচনা। ঘুমের জগতে ভেসে যাওয়ার আগে একটা কথা বিস্মিত করল তিনজনকেই— গ্যালারিতে চুরির সঙ্গে বুড়ো ডনিগানের যোগাযোগটা কোনখানে?

রাস্তার কোলাহলে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল ওদের।

উঠে গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল রবিন। একবার তাকিয়েই চিৎকার করে ডাকল দুই বন্ধুকে, 'অ্যাই, দেখে যাও অবস্থা!'

পাঁচ

আগের রাতে যে রাস্তাটাকে দেখেছিল একেবারে নির্জন, সেটাতে এখন মানুষের ঢল নেমেছে। রাউন্ডআপে অংশ নিতে এসেছে ওরা। অনেকের হাতেই সাপ ধরার লাঠি আর ব্যাগ। দুটো টেলিফোনের থামে আটকে দেয়া হয়েছে লম্বা একটা কাপড়ের ব্যানার। তাতে লেখা:

WELCOME TO SWAMP CREEK'S
ANNUAL RATTLESNAKE ROUNDUP.

যার বাংলা করলে দাঁড়ায়: সোয়াম্প ক্রীকের বার্ষিক র‍্যাটলস্নেক ধরায় স্বাগতম।

রবিনের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'বাপরে বাপ, কি আয়োজন!'

'দেখতে যাবে নাকি?'

'কপাল গুণে এসে যখন পড়েছি, যাব তো বটেই।'

পোশাক বদলে বাইরের রোদে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। একটা খাবারের দোকানে ঢুকে তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে নিল। আবার বেরিয়ে মিশে গেল সর্প শিকারীদের সঙ্গে।

শহরের কেন্দ্রে জেনারেল স্টোরের বাইরে একটা বিরাট বেদি তৈরি করা হয়েছে। তাতে গিয়ে উঠেছে কিছু লোক। মাথায় খড়ের তৈরি বড় হ্যাট। চূড়ার কাছে র‍্যাটলস্নেকের চামড়া জড়ানো।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে সেদিকে এগোতে এগোতে রবিন বলল, 'ওরা সম্ভবত নেতা গোছের কিছু।'

বেদিতে দাঁড়ানো একজন ঘোষণা করল, কয়েক দলে ভাগ হয়ে যাবে শিকারীরা। প্রত্যেক দলের একজন করে সর্দার থাকবে।

ভাগাভাগি হতে দেরি হলো না। খড়ের হ্যাট পরা একজনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'জলাভূমির দিকে যাবে কোন দলটা?'

'আমারটাই,' জবাব দিল লোকটা। 'তোমরা গেলে চলে এসো।' ছোটখাট মানুষ সে, কোটরে বসা চোখ, শরীরের সর্বত্র মোটা মোটা রগ ফুলে আছে। 'আমার নাম ড্রেক।' নিজের পরিচয় দিয়ে দলের অন্যান্যদের দিকে তাকাল সে। 'এর আগে কে কে রাউন্ডআপ করেছ?'

বেশিরভাগ হাতই উঠে গেল।

খুশি হলো নেতা। বলল, 'ভাল। তারমানে শেখানোর প্রয়োজন পড়বে না। সময় যত কম নষ্ট হয় তত ভাল। নতুনরা পুরানোদের দিকে ভালমত নজর রাখবে। শিখতে দেরি হবে না।'

কিশোর আর রবিন লক্ষ করল, উৎসাহে চকচক করছে মুসার চোখ।

নেতাকে সামনে রেখে শহরের প্রধান সড়ক ধরে এগোল দলটা। পথের মাথায় বন। জলাভূমিকে ঘিরে রেখেছে। তাতে ঢুকল।

খানিকদূর এগিয়ে বাঁয়ে ঘন লতাপাতা, ঝোপ, সাইপ্রাসের জঙ্গল আর জলে ঢাকা কাদাভূমি দেখিয়ে দলের নতুন সদস্যদের বলল ড্রেক, 'ওইটা ওকিফেনোকি সোয়াম্প। কম পক্ষে চল্লিশ জাতের সাপের বাস ওখানে। র‍্যাটলের তো সীমাসংখ্যা নেই, কোরাল আর জলঢোঁড়াও আছে।' পাকা শিকারীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'তাহলে, আজ কি শিকার করব আমরা? হীরকছাপ র‍্যাটল?'

'শুধু হীরকছাপ কেন?' প্রশ্ন করল একজন।

'কারণ ওগুলোকে ধরাই সবচেয়ে সহজ।' চোখ টিপে, হেসে রসিকতা করল ড্রেক, 'অন্য সাপও ধরতে পারো ইচ্ছে করলে। কি ধরবে? ঢোঁড়া?' এটাও রসিকতা।

অনেকেই হাসল। পরিবেশটা সহজ করে দলবল নিয়ে আবার বনের দিকে এগোল নেতা।

কিছুক্ষণ পর আবার থামল। একটা পাথুরে পাহাড় দেখিয়ে বলল, 'ওখানে অনেক সাপের বাসা। জানি আমি।'

সাবধানে, পা টিপে টিপে পাহাড়ের দিকে এগোল দলটা। কোন সাপ চোখে পড়ল না প্রথমে। খালি পাথর আর পাথর—আড়াল, কোণ, ফাটল কোথাও কিচ্ছু নেই।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'নেই মানে! আরে এ তো বোঝাই! ওই দেখো, হাজার হাজার!'

পাথরের আড়াল, ফাটলের মধ্যে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ। আরব্য রজনীর সিন্দবাদের গল্পের মত। পাথরের পাহাড়ে যেদিকেই তাকানো যায় শুধু সাপ আর সাপ। রবিনের মনে হতে লাগল ওগুলোর কাছে পাহাড়ের গর্তগুলোতে খুঁজলে পাওয়া যাবে ধনরত্ন, মণিমানিক্য—মুঠো ভরে তুলে নিতে পারবে সিন্দবাদ নাবিকের মত।

হীরকছাপ র‍্যাটলের আড্ডা এখানে। সাপগুলোর ফণার পেছনে হীরার মত দেখতে ছাপের জন্যেই এই নাম হয়েছে। নড়ছে খুব ধীরে। বেশিরভাগই কুণ্ডলী পাকানো। দীর্ঘ শীত কাটিয়ে রোগা আর আলসে হয়ে গেছে সাপগুলো, গতি তাই ধীর। আরাম করে রোদ পোহাচ্ছে।

শিকারীদের হাতের লাঠিগুলোর মাথায় ফর্ক—একটা গোড়া থেকে দুটো শাখা বেরিয়েছে কয়েক ইঞ্চি করে। এটা দিয়ে সাপ ধরতে সুবিধে। কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা সাপের মাথার পেছনে ঘাড়ের কাছটায় চেপে ধরতে লাগল শিকারীরা, তারপর দুই আঙুলে টিপে ধরে তুলে অবলীলায় ব্যাগে ভরে ফেলতে লাগল।

গোয়েন্দাদের কাছে কাজটা অবশ্য মোটেও সহজ মনে হলো না। তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে রইল ওরা।

কারও কাছ থেকে একটা লাঠি চেয়ে নিয়ে নিজেও যাবে কি না ভাবছে মুসা, এই সময় আকাশ থেকে যেন উড়ে এল একটা বড় র‍্যাটলস্নেক। পড়ল তার পায়ের কয়েক ফুট দূরে।

'খাইছে!' বলে চিৎকার দিয়ে সরে গেল সে।

পর পর আরও দুটো সাপ এসে পড়ল পায়ের কাছে। লাফিয়ে সরে গেল কিশোর আর রবিন।

'গাছ থেকে পড়ছে!' বলে উঠল একজন শিকারী। 'ডালে লুকিয়ে বসে কেউ ছুঁড়ে মারছে!'

আরেকটা সাপ পড়ল মাটিতে। গায়ে পড়লে সর্বনাশ। ভয় পেয়ে গেল সবাই। ওপরে তাকিয়ে ডালের ফাঁকে লোকটাকে খুঁজতে লাগল।

হা-হা করে ওপর থেকে বিকট হাসি হেসে উঠল কে যেন। গমগমে ভারী কণ্ঠে বলল, 'এই তো সাহস! ছুহ্! এই সাহস নিয়ে র‍্যাটল মারতে এসেছ? শেয়ালের দল!'

একটা মোটা ডালের গোড়ায় বসে আছে একজন বুড়ো মানুষ। মাথায় তিনকোনা হ্যাট। হাতে চটের থলেতে সাপ ভরা। বের করে ছুঁড়ে মারছে শিকারীদের দিকে।

'ও নিশ্চয় ডনিগান!' মুসা বলল।

'তেকোনা হ্যাট দেখেছ!' গাছের কাছ থেকে সরে গেল রবিন।

শিকারীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ডনিগানের চেহারা। তিন-চারটে সাপ একসঙ্গে বের করে ছুঁড়ে ফেলল।

ছিটকে এদিক ওদিক সরে গেল শিকারীরা।

'এখন ভাগো কেন!' খেঁকিয়ে উঠল বুড়ো। 'আর যদি এখানে দেখি, সোজা গায়ের ওপর সাপ ফেলব!'

রাগ দেখিয়ে ড্রেক বলল, 'এর জন্যে তোমাকে হাজতে যেতে হবে, ডনিগান!'

'কে ঢোকাবে? তুমি? যাও না, করো না ব্যবস্থা! দেখি কেমন বাপের ব্যাটা!'

বস্তার খোলা মুখ উল্টো করে ধরল বুড়ো। হড়হড় করে ঝরে পড়ল অনেকগুলো সাপ। বস্তাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডালে বাঁধা একটা মোটা দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল সে। দড়িটার আরেক মাথা কোণাকুণি করে বাঁধা দূরের গাছের আরেকটা ডালের সঙ্গে।

শাঁ করে পিছলে নেমে যেতে লাগল সে, শিকারীদের কাছ থেকে দূরে। কেউ নড়ল না। তাকে ধরতে গেল না।

এই অচেনা বনভূমিতে, জলার মধ্যে বুড়োকে ধরতে পারবে না বুঝে গেছে তিন গোয়েন্দা। অহেতুক দৌড়াদৌড়ি করল না। নিচু হয়ে বস্তাটা কুড়িয়ে নিল রবিন। রকি বীচে যেটা পেয়েছে অবিকল সেটার মতই বস্তাটা, তবে আরও বড়, অনেক বেশি সাপ রাখার জন্যে নিয়েছিল ডনিগান।

এ ভাবে বাধা পেয়ে শিকারীরা সবাই বিরক্ত হয়েছে। সাপ ধরা বাদ দিয়ে সোয়াম্প ক্রীকে ফিরে এল। ডনিগানের নামে নালিশ করার জন্যে।

ড্রেকের সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টি পুলিশ স্টেশনে চলল তিন গোয়েন্দা।

ডেস্কের ওপাশে বসে ক্যান্ডি খাচ্ছেন শেরিফ। চওড়া কাঁধ তাঁর, পেশীটেশীও আছে, তবে কোমরের কাছে মেদ জমেছে ভালই।

'আরে, ড্রেক। এসো, এসো। সাপ ধরা বাদ দিয়ে এখানে যে?' হাতের

ক্যান্ডিটা মুখে পুরে দিলেন শেরিফ। মোড়কটা ফেললেন ময়লা ফেলার ঝুড়িতে।

ডনিগানের শয়তানীর কথা সবিস্তারে জানাল ড্রেক।

হালকা হাসি ফুটল শেরিফের মুখে। 'আবার তাহলে জ্বালাতে এসেছে ডনিগান। যতই দিন যাচ্ছে সীমা ছাড়াচ্ছে তার খেপামি।'

'কিন্তু তার খেপামির জন্যে মানুষ মারা পড়তে পারত,' সাপের মতই ফুঁসে উঠল সাপ-শিকারীদের নেতা। 'কারও গায়ে পড়লেই তো মরেছিল কামড় খেয়ে। তাকে ধরে গারদে পোরা দরকার, শেরিফ। আর ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়।'

'কথা বলব তার সঙ্গে। তুমি ঠিকই বলেছ। তার পাগলামি অন্যকে বিপদে ফেলতে পারে।'

ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। বলল, 'শেরিফ, আমরা বহুদূর থেকে এসেছি। লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচ থেকে। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

ভুরু কুঁচকে তাকালেন শেরিফ। 'বলো?'

নিজের পরিচয় দিল কিশোর। ডনিগানের সঙ্গে কেন কথা বলতে চায় জানাল।

শুনতে শুনতে বিস্ময় ফুটল শেরিফের চোখে। 'ডনিগান গ্যালারিতে চুরি করেছে?'

'তাকে ধরে জিজ্ঞেস করুন, গত দু-তিন হপ্তা সে কোথায় কাটিয়েছে। তাহলেই অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।'

'কিন্তুহ্...' বিশ্বাস করতে পারছেন না শেরিফ। 'ডনিগান পাগল হতে পারে, কিন্তু সে চুরি করবে...' মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি।

'এমন কতগুলো ঘটনা ঘটেছে, যাতে তার ওপরই সন্দেহ পড়ে,' শেরিফকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করল কিশোর।

রবিনও এগিয়ে গেল। দুটো বস্তা ছড়িয়ে রাখল শেরিফের টেবিলে। বলল, 'দেখুন, এটা রকি বীচে পেয়েছি। আর এটা পেয়েছি এখানে, আজ বনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছে। অবিকল এক জিনিস। দুটোই তার, তাই মনে হয় না? রকি বীচে গ্যালারিতে রাতের বেলা চোর ঢুকেছিল। তাকে ধরার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। সে জন্যে রাগ করে আমাদের গাড়িতে একগাদা সাপ ফেলে রেখে গেছে। গাড়ির কাছে একটা গাছে ঝোলানো পেয়েছি এই বস্তাটা।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে বস্তা দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। চোখ তুলে তাকালেন গোয়েন্দাদের দিকে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'রাউন্ডআপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শহর ছেড়ে যাবে না ডনিগান। পারলে তার সঙ্গে কথা বলো তোমরা। সে-ই চুরি করেছে, এ ব্যাপারে প্রমাণ না পাওয়া গেলে আমি কিছু করতে পারছি না। কাল খুব ভোরে ওর বাড়িতে যাও। দেখা পেয়ে যেতে পারো।'

শেরিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। শহরের কেন্দ্রে ফিরে দেখল শিকারীদের অনেকেই ফিরে এসেছে। সেদিনের মত সাপ ধরা শেষ। জেনারেল স্টোরের পেছনে বিরাট এক কুয়া খোঁড়া হয়েছে। তাতে ঢেলে দেয়া হয়েছে ধরে আনা সমস্ত সাপ। কিলবিল করছে ওগুলো।

কিনারে দাঁড়িয়ে নিচে একবার উঁকি দিয়েই শিউরে উঠল মুসা। এর মধ্যে পড়লে এখন কি হবে, ভাবনাটা মনে এলেও জোর করে সরিয়ে দিল। 'এগুলোকে দিয়ে কি করবে এখন?'

কিশোর জবাব দিল, 'মেরে ফেলবে হয়তো। কিংবা চিড়িয়াখানা আর ল্যাবরেটরির গবেষকদের কাছে বেচে দেবে।'

খিদে পেয়েছে তিনজনেরই। মোটেলে ফিরে এল ওরা।

ওয়েইট্রেস মেয়েটা ঠিকই বলেছে—গতদিনের নির্জন রেস্টুরেন্ট আজ সাপ-শিকারীদের ভিড়ে সরগরম। স্থানীয় একটা ব্যান্ড পার্টিকেও বাজনা বাজিয়ে শিকারীদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভাড়া করে আনা হয়েছে। কোণের দিকে একটা খালি টেবিল দেখে সেখানে বসল তিন গোয়েন্দা।

শঙ্কিত স্বরে মুসা বলল, 'আজ খাবার পাব কিনা কে জানে! বাজনা শুনে তো আর পেট ভরবে না!'

এনডির চোখ পড়ল ওদের ওপর। হাসিমুখে এগিয়ে এল সে। 'খাবার চাই?'

'আছে?'

'প্রচুর।'

'আজকের স্পেশাল কি?'

'খাবার আজ একটাই,' হাসতে হাসতে বলল মেয়েটা।

'কী?'

'র‍্যাটলস্নেকের রোস্ট।'

হাসি দূর হয়ে গেল মুসার। খাবারের ব্যাপারে কোন অনীহা নেই তার, ঠেকায় পড়লে সবই খেতে পারে। সেটা জঙ্গলে কিংবা নির্জন কোন দ্বীপে হলে। কিন্তু এ রকম লোকালয়ে বসে সাপের রোস্ট খাওয়ার কথাটা ভাল লাগল না তার।

খাবারের নাম শুনে কিশোর আর রবিনের মুখও কালো হয়ে গেল।

কিন্তু উপায় নেই। আজ আর শহরের কোন রেস্টুরেন্টেই অন্য খাবার পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে শেষে সাপের রোস্ট অর্ডার দিতে হলো।

তবে প্লেটে করে খাবারটা যখন নিয়ে আসা হলো অতটা খারাপ আর মনে হলো না। মুসা তো একটুকরো মুখে দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'উফ্, দারুণ!'

যতই ভাল হোক, কিশোর আর রবিনের রুচল না এই খাবার। অনেক চেষ্টা করে কোথা থেকে যেন কয়েকটা বনরুটি আনিয়ে দিল এনডি। সেগুলো আর পানি খেলো কেবল ওরা। ভাগ্যিস পাওয়া গিয়েছিল। নইলে না খেয়েই থাকতে হত।

খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে চলল ওরা।

দরজা খুলল মুসা। ঘর অন্ধকার। আলো নেভানো। সে ভেতরে পা দিতে না দিতেই খড়খড় শব্দ হলো। পরক্ষণে ব্যথায় আর্তচিৎকার করে উঠল মুসা।

অন্ধকারে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে একটা হীরকছাপ র‍্যাটল।

ছয়

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল রবিন।

আবার ছোবল মারতে তৈরি হয়েছে সাপটা। লাফ দিয়ে সরে এল মুসা। ককিয়ে উঠল, 'বাবাগো, দিয়েছে কামড়ে!'

'বেরোও, জলদি!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

ছুটে দরজার বাইরে বেরোল মুসা। দু-দিক থেকে তাকে ধরে প্রায় চ্যাঙদোলা করে তুলে নিয়ে দৌড় দিল কিশোর আর রবিন। লবিতে পৌঁছতে পৌঁছতে ফুলে গেল পা। তীব্র ব্যথা শুরু হয়েছে।

'একজন ডাক্তার দরকার,' ক্লার্ককে বলল রবিন।

মুসার পা-টা পরীক্ষা করে দেখল লোকটা। শিস দিয়ে উঠল। 'অবস্থা খারাপই মনে হচ্ছে। আমার গাড়িতে তোলো। নীল রঙের শেভি।'

মুসাকে বয়ে নিয়ে চলল কিশোর আর রবিন। গোঙাতে লাগল সে। কয়েক সেকেন্ড পর বেরিয়ে এল ক্লার্ক, হাতে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, পেছনে এনডি।

রবিনের দিকে চাবি ছুঁড়ে দিয়ে ক্লার্ক বলল, 'চালাও।'

মুসাকে তুলে দেয়া হলো পেছনের সীটে। এনডি আর ক্লার্ক বসল তার সঙ্গে। কিশোর আর রবিন সামনে। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার রাস্তা বাতলে দিতে থাকল ক্লার্ক। হাতও থেমে নেই তার। মুসার পায়ে টর্নিকেট বাঁধতে ব্যস্ত। ক্ষতের সামান্য ওপর থেকে নিচের দিকে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিল। মুসার মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছে এনডি। বার বার রুমাল দিয়ে কপাল মুছে দিচ্ছে। গায়ের উত্তাপ অনেক বেড়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

ডাক্তারের বাড়িতে এসে মুসাকে বয়ে নিয়ে ঢোকানো হলো তাঁর চেম্বারে। ক্ষীণদেহী একজন মানুষ, ধূসর হয়ে এসেছে চুল, চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। কিশোর আর রবিনকে বললেন রোগীকে টেবিলে শুইয়ে দিতে।

আহত জায়গায় আলতো টিপ দিয়ে মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যথা লাগে?'

'আঁউ' করে উঠল মুসা। 'লাগে!'

'ভাল। বিষ বেশি ঢুকলে অবশ হয়ে যেত।'

কামড়টা কতখানি মারাত্মক বোঝার জন্যে আরও নানা ভাবে মুসাকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। মুখে ঝিঁঝি ধরা অনুভূতি হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন। চোখ দেখলেন হলুদ হয়েছে কিনা। তারপর অ্যানটিভেনম ইনজেকশন দিলেন। অ্যানটিসেপটিক দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন জখমের ওপর।

কাজ শেষ করে উদ্বিগ্ন চেহারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করলেন ডাক্তার, 'ভয় নেই, দু-একদিনেই সেরে যাবে।'

হাঁপ ছেড়ে বলল রবিন, 'সারবে তো?'

'সারবে। তবে বিশ্রাম দরকার। বিছানা থেকে নামতে দেবে না। ফোলাটা

সেরে যাবে কাল সকালের মধ্যেই।'

মোটেলে ফিরে এল ওরা। ঘরের সাপটাকে ধরতে কিশোর আর রবিনকে সাহায্য করল ক্লার্ক। হীরকছাপ র‍্যাটল। আরও সাপ আছে কিনা দেখল। নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে মুসাকে এনে শুইয়ে দিল বিছানায়।

'আহ্, কি ভারীর ভারী!' হেসে রসিকতা করল কিশোর। 'এবার থেকে কম খাবে। জান বের করে দিয়েছ আমাদের।'

মলিন হাসি হাসল মুসা। 'অনেক কষ্ট দিলাম, না? ভাল করে না দেখে আর কখনও ঘরে ঢুকব না এখানে।'

ক্লার্ক চলে গেল।

চারপায়ায় উঠে বসল রবিন। 'ডনিগানের শয়তানী। সে-ই সাপটা রেখে গেছে।'

কিশোর বলল, 'সাপের তো ছড়াছড়ি। জানালা দিয়েও ঢুকতে পারে।'

'ডনিগান রেখে গিয়ে থাকলে বুঝতে হবে অহেতুক হুমকি দেয়নি সে। পিগমির চেয়ে হীরকছাপ অনেক বেশি মারাত্মক।'

'পুলিশের কাছে যাচ্ছ না কেন?' মুসা বলল। 'আরেকটু হলেই আমাকে খুন করে ফেলেছিল সে!'

'যাব যে, প্রমাণ কোথায়?' হাত নাড়ল রবিন।

'কাল সকালেই মিস্টার সাইমনকে ফোন করব,' কিশোর বলল। 'আমরা আসার পর আর কিছু ঘটেছে কিনা জানব। হয়তো ডনিগানের বিরুদ্ধে কিছু খাড়া করা যাবে।'

সুতরাং পরদিন সকালে উঠে আগে ফোনটা সেরে নিল সে। ধরল বাবুর্চি নিশান জাং কিম। মুসাকে সাপে কামড়েছে শুনে আঁতকে উঠল। সাবধান করে দিল, আর যাতে সাপের কাছে না যায়। শেষে বলল, বাড়ি ফেরার সময় গোটা কয়েক র‍্যাটল নিয়ে যেতে। সাপের মাংসের কাবাব নাকি খুব ভাল বানাতে পারে সে।

শুনেই মুখ কুঁচকে ফেলল কিশোর। কিমকে কিছু বলল না এ ব্যাপারে। মিস্টার সাইমনকে ডেকে দিতে বলল।

সাইমন ধরলে পুরো ঘটনা খুলে বলল কিশোর।

মন দিয়ে শুনলেন গোয়েন্দা। মন্তব্য করলেন, 'ডনিগানের ওপর সন্দেহ বাড়ছে।'

'আমরা আসার পর আর কোন গ্যালারি কিংবা অ্যানটিক শপে চুরি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হয়েছে। তবে চুরির ধরনটা অন্য রকম। যেটার তদন্ত করতে গেছ, তার সঙ্গে মেলে না।'

'রকি বীচ থেকে সোয়াম্প ক্রীকে কি করে যাতায়াত করে ডনিগান, জানতে পারলে তার বিরুদ্ধে কেস খাড়া করতে পারব হয়তো।'

'প্লেন ছাড়া আর কিসে? আমি সাভান্না এয়ারপোর্টে খোঁজ নিচ্ছি। তোমরা ওখানকার প্রাইভেট এয়ারপোর্টগুলোতে তল্লাশি চালাও।'

'ঠিক আছে।'

সাইমনকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকা দুই বন্ধুকে জানাল সব। বলল, 'এখানে কোন প্রাইভেট এয়ারপোর্ট আছে কিনা খোঁজ নিতে হবে।'

দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ হলো।

উঠে গিয়ে ছিটকানি খুলে দিল রবিন।

ঘরে ঢুকল এনডি। হাতে একটা মোটা বই। মুসার বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বইটা দেখিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে এনেছি। সাপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে। মনে হলো, কামড় যখন খেয়েছ, ইনটারেস্টেড হবে।'

এনডিকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছে মুসা। মেয়েটা বেশ আন্তরিক। বইটা হাতে নিতে নিতে বলল, আগাগোড়া পড়ে দেখবে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এনডি, এখানে কোন প্রাইভেট এয়ারপোর্ট আছে?'

'আছে। উত্তরে। কেন, তোমাদের তদন্তের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে?'

একেবারেই কিছু না বললে মেয়েটার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না ভেবে খানিকটা বলল। তারপর অনুরোধ করল ওদেরকে ওখানে নিয়ে যেতে।

খুশি হয়েই রাজি হলো এনডি। গোয়েন্দাগিরি তার ভাল লাগে।

'আমিও যাব,' মুসা বলল।

'না, তোমার যাওয়া চলবে না,' বলল কিশোর। 'ডাক্তার কি বলেছেন, মনে নেই? তোমাকে শুয়ে থাকতে হবে।'

ওদের করুণা জাগানোর জন্যে গোঙাতে শুরু করল মুসা। কিন্তু আরেক দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর আর রবিন। এনডি কথা দিল, একটু ভাল হয়ে উঠলেই গাড়িতে চড়িয়ে শহরটা মুসাকে ঘুরিয়ে দেখাবে সে। এখন যেন যাওয়ার জন্যে আর চাপাচাপি না করে।

শহরের বাইরে কয়েক মাইল দূরে ছোট্ট এয়ারপোর্টটায় পৌঁছল গোয়েন্দারা। ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিল, কয়েক দিনের মধ্যে প্লেনে করে কোথাও যাওয়া আসা করেছে কিনা ভিরেনসন ডনিগান।

জানা গেল, করেনি।

'গত কয়েক দিনে লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচে কেউ গেছে, বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'রকি বীচ?' গাল চুলকাল ম্যানেজার। 'হ্যাঁ, গেছে। একটা নীল রঙের সেসনা বিমান গিয়েছিল। এখন এখানেই আছে ওটা। পাইলট অল্প ক'দিন হলো এসেছে এখানে। ওর নাম হোভার ম্যানিলা।'

'দেখতে কেমন?'

'পুরো চেহারা ভালমত কখনোই দেখিনি। ইয়াবড় সানগ্লাস পরে থাকে। মাথায় হ্যাট। কানাটা কপালের ওপর অনেকখানি নামিয়ে দেয়। ইচ্ছে করেই করে মনে হয়, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে।'

আঙুল দিয়ে চুটকি বাজাল রবিন, 'সে-ই আমাদের লোক! নিশ্চয় ডনিগান!'

'বয়স্ক লোক নাকি?' ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'বুড়ো?'

মাথা নাড়ল ম্যানেজার। নিরাশ করল রবিনকে।

ছেলেদের হতাশা দেখে যেন মায়া হলো লোকটার, বলল, 'পাইলটের বয়েস কম, তবে তার সঙ্গে একজন প্যাসেঞ্জার ছিল, দূর থেকে দেখেছি। বয়েস আন্দাজ করতে পারিনি। ওই লোকটা বুড়ো হতে পারে। তোমরা যাকে খুঁজছ।'

আবার আশা বাড়ল কিশোরের। 'ওই লোকটা কি তার পরিচয় গোপন করেছে?'

'করতে পারে। ইচ্ছে করেই আমার কাছ থেকে দূরে থেকেছে কিনা তা-ও জানি না।'

'প্লেনের ভেতরটা একটু দেখা যাবে?' অনুরোধ করল রবিন।

'সরি, আমি সেটা করতে দিতে পারি না। পাইলটের অনুমতি লাগবে। ও কোথায় থাকে, ঠিকানা জানি না।'

সেসনার পাইলট আর সেই যাত্রী যদি ফেরত আসে, তাহলে যেন সোয়াম্প ক্রীক ইনে ফোন করে জানায় ম্যানেজার, এই অনুরোধ করে অফিস থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। মোটেলে ফিরে রেজিস্টার চেক করে দেখল হোভার ম্যানিলা নামে কেউ ওখানে উঠেছে কিনা। নামটা নেই। শহরের পরিচিত যে কজনকে দেখল এনডি, সবাইকে জিজ্ঞেস করল লোকটার কথা। কেউ কিছু বলতে পারল না।

'ছদ্মনাম ব্যবহার করছে হয়তো,' কিশোর বলল। 'আর আসল নাম হলেও এখন জানাটা কঠিন হবে। শহরে অপরিচিত লোকের অভাব নেই। রাউণ্ডআপ শেষ না হলে কিছু বোঝা যাবে না।'

ঘরে ফিরে এসে আবার মিস্টার সাইমনকে ফোন করল কিশোর। তিনি জানালেন, গত এক বছরে প্লেনে করে সাভান্নার বাইরে কোথাও যায়নি ডনিগান। নীল সেসনা আর হোভার ম্যানিলার কথা জানাল কিশোর। বিমানটার লাইসেন্স নম্বর দিয়ে খোঁজ নিতে অনুরোধ করল।

চেষ্টা করবেন, বললেন তিনি। 'ভাল কথা, তোমার বন্ধু বিড ওয়াকার ফোন করেছিল। তোমরা নিউ অরলীনসে যাচ্ছ কিনা জানতে চেয়েছে।'

'ইচ্ছে তো আছে। তবে কবে যাব বলতে পারছি না। আগে এই কেসটার একটা সমাধান হোক, তারপর।'

'আচ্ছা। তাকে বলে দেব। গুড লাক।'

রিসিভার রেখে মুসার দিকে নজর দিল কিশোর, 'তারপর, কেমন আছ তুমি?'

'আমি?' মাথা নাড়ল মুসা, 'ভাল না। জানতামই না সাপের মধ্যে ভুডু ঢুকিয়ে দেবে। সাপের সঙ্গে বোধহয় সম্পর্ক আছে। বোধহয় শিরশিরানি অনুভূতিটার জন্যেই। সাপ শুনলে যেমন শিরশির করে গায়ের মধ্যে, ভুডু শুনলেও তাই!'

সাত

'কি লিখেছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'লিখেছে ভুডু হলো এক ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিক, আফ্রিকান সাপ-পূজারীদের কাছ থেকে এসেছে।' বিছানায় উঠে বসল মুসা। 'এখন এটা শুধু হাইতিতে চালু আছে। ঘরের চালের আড়ায় ওখানে সাপ রেখে দেয় লোকে।'

'হাইতি,' বিড়বিড় করল কিশোর। ফ্লোরিডার দক্ষিণে কিউবার সামান্য পুবে ক্যারিবিয়ানের একটা দ্বীপ ওটা। 'ফরাসী ভাষা থেকে নিয়ে একটা ভাষা তৈরি করেছে ওখানকার লোকে, ক্রিয়োল ভাষা।'

কি বলতে চাইছে কিশোর, বুঝে ফেলল রবিন। উজ্জ্বল হলো চোখ। 'নিউ অরলীনসেও ক্রিয়োল ভাষা চালু আছে! তারমানে ওখানে ভালই ভুডুর প্র্যাকটিস হয়!'

'বিডের সন্দেহও মনে হয় ঠিক। ভুডুওলাদের সঙ্গে মিশে গণ্ডগোল বাধিয়েছে তার দাদা।'

'এ সব ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে দূরে থাকাই উচিত আমাদের,' মুসা বলল। 'তোমাকে পছন্দ না হলে কি করবে জানো? তোমার পোশাকের একটুকরো কাপড় চুরি করে নিয়ে যাবে। সেটা দিয়ে তোমার চেহারার একটা পুতুল বানাবে। তার গায়ে একটা পিন ফুটিয়ে রেখে দেবে। অসুস্থ হয়ে তখন মারা যাবে তুমি।'

'বিশ্বাস করো নাকি এ কথা?' মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'অনেকেই করে,' ঘুরিয়ে জবাব দিল মুসা। 'বইয়ে পড়লাম, শত শত বছর ধরে হাইতিতে ভুডু প্র্যাকটিস করছে লোকে। ওদের তো খুব বিশ্বাস এই বিদ্যার ওপর।'

হাত তুলল কিশোর, 'ভুডুর চিন্তা আপাতত আমাদের মাথা থেকে বাদ দেয়া উচিত। এখন কেবল একটা দিকেই মনোযোগ—ডনিগান।'

মুসার পায়ের ফোলা কমে গেছে। তবে ডাক্তার বলেছেন, পুরোপুরি সারতে কমপক্ষে আরও একদিন লাগবে, তখন হাঁটাহাঁটি করতে পারবে। তাকে বিছানায় রেখে বেরোল কিশোর আর রবিন। হাল স্ট্রীটে রওনা হলো, ডনিগানের বাড়িতে।

জায়গাটা শহরের একধারে। ওখানে পৌঁছে একজন পথচারীকে বাড়িটার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। দেখিয়ে দিল সে। ছোট একটা কটেজ। গাছপালায় ঢাকা।

লতায় ছাওয়া ঝোপের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বলল, 'আমাদের দেখলে আবার রেগে যাবে না তো?'

সামনের উঠানে এসে দাঁড়াল ওরা। নানা রকম বাতিল জিনিস পড়ে আছে। খোলা গ্যারেজের সামনে একটা পুরানো মরচে পরা লাঙল, পাওয়ালা একটা আদিম বাথটাব, তার চেয়েও আদিম একটা কাঠকয়লায় জ্বালানো স্টোভ, আরও নানা

টুকিটাকি জিনিস।

'রঙ করার জন্যে রাখা হয়েছে স্টোভটা,' দেখতে দেখতে বলল রবিন। 'মনে হয় অ্যানটিক হিসেবে বিক্রি করবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিন্তু লোকজন তো কাউকে দেখছি না। দরজায় ধাক্কা দেব নাকি?'

দরজার পাশে কলিংবেলের সুইচ আছে। কিন্তু নষ্ট। শেষে দরজায় টোকা দিল সে।

ভেতরে খসখস শব্দ হলো। তবে কেউ এল না দরজা খুলে দিতে।

আবার টোকা দিল কিশোর। থাবা দিল ঘনঘন। কয়েক মিনিট পর পদশব্দ শোনা গেল। কর্কশ গলায় প্রশ্ন হলো, 'কি চাই?'

'আমি কিশোর। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। একটু সময় হবে, প্লীজ?'

'কি নিয়ে কথা?'

'র‍্যাটলস্নেক।'

'দাঁড়াও, আসছি,' কণ্ঠস্বর পাল্টে আন্তরিক হয়ে গেল ডনিগানের।

'প্রিয় প্রাণীটার কথা শুনেই একেবারে গলে...' রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল বুড়ো। ওভারঅল আর টারটলনেক সোয়েটার পরেছে। ছেলেদের দেখেই মুহূর্তে হাসি উধাও হয়ে গেল মুখ থেকে।

'কি চাও?' আবার কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠ।

'রকি বীচ থেকে এসেছি আমরা,' জবাব দিল কিশোর, 'জানার জন্যে, দু-দিন আগে কোথায় ছিলেন আপনি?'

'জন হেমিংওয়ে পাওয়ারসের গ্যালারিতে কি করছিলেন?' যোগ করল রবিন।

রীতিমত অবাক হলো বুড়ো মানুষটা। চোখের পাতা সরু করে তাকাচ্ছে দু-জনের দিকে। 'র‍্যাটলস্নেকের ব্যাপারে জানতে চাও বলেছিলে না? এসো, ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। ঘরে খুব সাধারণ আসবাবপত্র। পেছনের আঙিনায় ওদেরকে নিয়ে এল ডনিগান। একটা কাঠের ছাউনিতে অনেকগুলো খাঁচায় রাখা অসংখ্য র‍্যাটলস্নেক। সব জাতের সব আকারের। তার মধ্যে হীরকছাপ আর পিগমিও আছে।

'এগুলো আমার পোষা,' ডনিগান বলল। 'কে সৎ কে অসৎ বলে দিতে পারে।' রহস্যময় হাসি হেসে একটা খাঁচা খুলে দুটো হীরকছাপ র‍্যাটল বের করল সে। একটা করে বাড়িয়ে দিল কিশোর আর রবিনের দিকে। 'দেখি, ধরো তো, কেমন সাহস? খেলা করো এদের নিয়ে।' খিকখিক করে হাসল বুড়ো।

আগের দিন শিকারীরা কি করে সাপ ধরেছে, দেখেছে দুই গোয়েন্দা। মাথার পেছনে টিপে ধরল ওরা।

'না না, ওভাবে নয়।' খাঁচা থেকে আরেকটা সাপ বের করে ধরে দেখিয়ে দিল ডনিগান। 'এখানটায় ধরতে হবে।' আবার রেখে দিল খাঁচায়।

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। তারপর ডনিগান যে ভাবে

ধরতে বলেছে সে-ভাবে ধরল। বুড়োর পেট থেকে কথা আদায় করতে হলে আগে তার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।

'বাহ্, সুন্দর সাপটা!' পোষা পাখিকে যে ভাবে আদর করে সেই সুরে বলল রবিন। 'চমৎকার! এমন একটা সাপ পোষার শখ আমার অনেক দিনের...'

'হয়েছে,' সন্তুষ্ট হয়ে হাত বাড়াল ডনিগান, 'আর লাগবে না। দাও।' সাপ দুটো নিয়ে আবার খাঁচায় রেখে দিল।

কপালের ঘাম মুছল কিশোর। 'এবার বোধহয় আমরা কথা বলতে পারি?'

'এসো, ঘরে।'

কটেজের ছোট রান্নাঘরে ওদেরকে নিয়ে এল ডনিগান। দুটো পুরানো চেয়ার দেখিয়ে দিল বসার জন্যে। বলল, 'আমি ভেবেছিলাম রাজা পাঠিয়েছে তোমাদের। ভুল করেছি মনে হচ্ছে।'

'এই রাজাটি কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'কেন, কিং জর্জ দি থার্ড,' ডনিগানের চোখে হাসি ঝিলিক দিল, 'রাজা তৃতীয় জর্জ। ইংল্যাণ্ডের রাজা, আমার এক নম্বর শত্রু।' হুক থেকে একটা তিনকোণা হ্যাট খুলে এনে মাথায় দিল সে। 'দাঁড়াও, বলছি।'

রান্নাঘরে বসা ডনিগানকে অন্য রকম লাগছে ছেলেদের কাছে। বনের মধ্যে গাছের মাথায় বসা সেই সর্পবুড়ো নয় যেন। চোখের তারায় জমে থাকা সন্দেহ আর নেই এখন। তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে ধোঁয়াটে একটা ভাব, যেন বহুদূরে বিচরণ করছে তার মন।

'জানো,' বলতে লাগল বুড়ো, 'আমার দাদার-দাদার-দাদা ছিল হ্যামারসন ডনিগান। সোয়াম্প ফক্স বা জলাভূমির শেয়াল বলে চিনত তাকে সবাই। এই হ্যাটটা তার। পরতে ভাল লাগে আমার। তাই পরি।'

'আপনার বস্তায় বিপ্লবের প্রতীক আঁকেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'হ্যামারসনের পছন্দ ছিল বলে?'

মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। 'আমার দাদার-দাদা তার সৈন্যদল নিয়ে গিয়ে জলাভূমিতে আশ্রয় নিত। দিনে লুকিয়ে থাকত, রাতে আক্রমণ করত ইংরেজদের ঘাঁটিতে। সে-জন্যে ওরাই তার নাম দিয়েছিল সোয়াম্প ফক্স।'

'কিন্তু যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে দু-শো বছর আগে,' কিশোর বলল। 'এখন আর এই প্রতীক ব্যবহার করছেন কেন?'

'কই শেষ হয়েছে?'

জবাব দিতে পারল না দুই গোয়েন্দা। একে অন্যের দিকে তাকাল ওরা। বুড়োটা কি আসলেই খেপা, না চালাকি করছে?

তার পরের কথাটা শুনে খেপা বলেই মনে হলো, 'যুদ্ধ শেষ হয়নি এখনও, তার কারণ তৃতীয় জর্জ এখনও বেঁচে আছে। কলোনির লোকদের কাছ থেকে চায়ের কর আদায় করে চলেছে। আমার কাজ সেটা বন্ধ করা।'

মুসা হলে এক কথা ছিল, বলা যেত ইতিহাস জানে না, কিন্তু কিশোর আর রবিনের ভালমত পড়া আছে—আমেরিকার বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় জর্জ। আমেরিকার আদি বসতিকারীদের অনেকেই ঘৃণা করত

তাঁকে, কারণ তাদের মালপত্রের ওপর মোটা কর ধার্য করেছিলেন তিনি। অসন্তোষ থেকে শুরু হলো বিপ্লব, এক সময় ফেটে পড়ল সেটা। কিন্তু সে তো দু-শো বছর আগের কথা।

'রাজা তৃতীয় জর্জ এখনও বেঁচে আছেন, কে বলল আপনাকে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'আমি তাকে দেখেছি!' প্রায় চিৎকার করে জবাব দিল ডনিগান। 'জলাভূমি থেকে বেরিয়ে আসে লোকের কাছ থেকে জোর করে কর আদায় করার জন্যে। সে মারা যায়নি, হলফ করে বলতে পারি এ কথা। এখনও লুকিয়ে আছে ওই জলাভূমিতে।'

বহু আগে মরে যাওয়া একজন রাজাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে আবার গ্যালারিতে চুরির প্রসঙ্গে ফিরে এল কিশোর।

'রকি বীচের নামই শুনিনি কখনও!' গরম হয়ে জবাব দিল বুড়ো। 'ওখানে গিয়ে চুরি করার প্রশ্নই ওঠে না। আর আমার বস্তা কি করে ওখানে গেল, তেকোণা হ্যাট পরা লোকটা কে, কিচ্ছু বলতে পারব না। একটা কথাই বলতে পারি, সে আমি নই।'

উঠে দাঁড়াল রবিন। মুঠো হয়ে গেছে আঙুল। 'অনেক হয়েছে, প্রচুর মিথ্যে কথা বলেছেন! এখনও সময় আছে, সব খুলে বলুন, নইলে পুলিশের কাছে যাব।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডনিগান। সে-ও রেগে গেছে। 'দেখো, আমাকে হুমকি দিয়ো না! ডনিগানরা কারও হুমকির পরোয়া করে না! আমি বলছি কখনও রকি বীচে যাইনি, এবং মিথ্যে বলা আমার স্বভাব নয়!'

'বেশ, রকি বীচে যাননি বুঝলাম। মোটেলে আমাদের ঘরে সাপটা ফেলে দিয়ে এসেছে কে? সেটাও আপনি নন, অস্বীকার করতে চান?'

'না,' বসে পড়ল আবার ডনিগান। স্বর নরম করে বলল, 'ওটা আমিই ফেলে এসেছি। খানিকটা রসিকতা করার জন্যে। কানে এল, আমার ব্যাপারে খোঁজখবর করছ তোমরা, আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও। ভাবলাম, সেটা বন্ধ করা দরকার। তাই ভয় দেখানোর জন্যে ওকাজ করেছি। বিশ্বাস করো, খুন করার জন্যে নয়। সাপের দেশে রাউণ্ডআপের সময় এসে তোমরা যে এতটা অসাবধান থাকবে কল্পনাই করতে পারিনি।'

'কেন, আমাদের ভয় দেখানোর দরকার পড়ল কেন?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল কিশোর।

'তোমাদেরকে আমার শত্রু ভেবেছি। মনে করেছি তোমরা রাজার লোক। সে জানে তাকে ধরতে চাইছি আমি, সেটা করার আগেই আমাকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে ভেবেছি। সে-কারণেই আজও যখন এলে, হাতে সাপ ধরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেছি আসলেই তোমরা রাজার অনুচর কিনা। আমি জানি, রাজার লোক হলে সাপ দেখলেই কুঁকড়ে যেতে, ধরা তো দূরের কথা।'

ডনিগানের কথা খুবই রহস্যময় মনে হলো গোয়েন্দাদের কাছে। আধুনিক এই 'সোয়াম্প ফক্সের' মুখ থেকে আর কিছু আদায় করতে পারবে না বুঝে বেরিয়ে চলে এল ওরা।

শহরের দিকে ফেরার পথে রবিন বলল, 'হয় জলাভূমির গ্যাসে মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুড়োটার, নয়তো চালাকি করে বোকা বানাতে চেয়েছে আমাদের। রাজা তৃতীয় জর্জের কাহিনীটা একেবারেই গাঁজাখুরি।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল কিশোর। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'প্লেনের পাইলট হোভার ম্যানিলাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

আধঘণ্টা পর সোয়াম্প ক্রীকের প্রধান সড়কে এসে নামল দুই গোয়েন্দা।

মোটেলের দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর। হাত তুলে বলল, 'অ্যাই, দেখো, শেরিফের গাড়ি!'

আট

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ছেলেরা। খারাপ কিছু ঘটেছে ভেবে মুসার জন্যে উদ্বিগ্ন।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বিছানায় বসে আছে মুসা।

শেরিফ দাঁড়িয়ে আছেন জানালার কাছে শার্সির কাঁচ ভাঙা। নিচে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে কাঁচের গুঁড়ো।

শব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন শেরিফ। 'এসেছ। তোমাদের বন্ধু আমাকে ফোন করল। জানালা দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে কেউ। তাতে এই এটা আটকানো ছিল।'

এক টুকরো দলামোচড়া করা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

দেখার জন্যে ঝুঁকে এল রবিন আর কিশোর।

সেই একই প্রতীক: র‍্যাটলস্নেক। ছবির নিচে লেখা DON'T TREAD ON ME.

সবশেষে নিচে লেখা:

সূর্যাস্তের সময় জলাভূমিতে
দেখা কোরো আমার সঙ্গে।
কনি হুবার্টকে বললেই নিয়ে
যাবে ওখানে,

—ডনিগান।

'এইমাত্র এলাম ডনিগানের কাছ থেকে,' কিশোর বলল। 'এই নোট তার লেখা হতে পারে না।'

'হয়তো তাড়াহুড়ো করেছে,' শেরিফ বললেন। 'তোমাদের আগেই চলে এসেছে এখানে। পাঁচ মিনিট আগে এ ঘটনা ঘটেছে।'

'কনি হুবার্ট কে?' রবিনের প্রশ্ন।

'তোমাদেরই বয়েসী একটা ছেলে। এয়ারবোট চালায়। ওকিফেনোকি সোয়াম্পের নাড়িনক্ষত্র সব চেনে। ট্যুরিস্টদের দেখাতে নিয়ে যায়।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'যে রাস্তা দিয়ে ডনিগানের বাড়ি গেছ, সেটা ধরেই যাবে। বুড়োর বাড়ি ছাড়িয়ে আরও আধ মাইল এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলেই জলাভূমি পড়বে। সাইনবোর্ড আছে।'

'হুঁ,' রবিনের মনে পড়ল, 'সাইনবোর্ড দেখেছি। ওকিফেনোকি সোয়াম্পে নৌকাভ্রমণে যাওয়ার বিজ্ঞাপন করা আছে ওগুলোতে। কিশোর, চলো। সূর্যাস্তের সময় পৌঁছতে হলে এখনই যাওয়া দরকার।'

'কি হয় জানিয়ো,' শেরিফ বললেন। 'ডনিগানকে বোলো, বেশি বাড়াবাড়ি করছে সে। এই জানালা ভাঙার ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

যে পথে এসেছিল সে-পথে ফিরে চলল রবিন আর কিশোর। ডনিগানের বাড়ি ছাড়িয়ে আধ মাইল মত যেতে চোখে পড়ল সাইনবোর্ড। নির্দেশ মত এগিয়ে জলাভূমির কিনারে একটা ডক দেখতে পেল।

ডকে বাঁধা লম্বা, চ্যাপ্টা একটা এয়ারবোট। পেছন দিকে বিশাল এক ফ্যান লাগানো। সাধারণ আউটবোর্ড মোটর অগভীর জলাভূমিতে চালাতে পারে না নৌকাটাকে, তাই এই বিশেষ ফ্যানের ব্যবস্থা।

ডকের পাশের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল একটা লম্বা ছিপছিপে ছেলে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কিশোর আর রবিন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'তুমি নিশ্চয় কনি?'

'হ্যাঁ।'

'ডনিগান একটা চিঠি পাঠিয়েছে। বলেছে তুমি আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারো।'

মাথা ঝাঁকাল কনি। 'কিছু একটা দেখাতে চায় বোধহয় তোমাদের। খুব জরুরী মনে হলো। চলো, নিয়ে যাব।'

বোটের সামনের দিকে সীটে বসল দুই গোয়েন্দা। পেছনে বসল কনি, যেখান থেকে ফ্যানটা চালাতে পারে।

ইঞ্জিন চালু করল সে। ধীরে ধীরে পিছিয়ে আনতে শুরু করল বোট।

ফ্যানের শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কতদূর যেতে হবে?'

'অনেক দূর। ওকিফেনোকি সোয়াম্প অনেক বড়।'

এনডির কাছে এই সোয়াম্প সম্পর্কে জেনেছে কিশোররা। এটা ন্যাশনাল পার্ক, দক্ষিণ-পূর্ব জর্জিয়া আর উত্তর ফ্লোরিডার সত্তর বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এর মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে সুওয়ানি নদী। জলাভূমির বেশির ভাগ জায়গাতেই পানি আর কাদা। গাছপালা আছে। সাপ, পাখি আর কুমিরের আরেক প্রজাতি অ্যালিগেটরের রাজত্ব।

পানির গভীরতা খুবই কম। কোথাও কোথাও হাত-খানেকের কম। কিন্তু তাতে বোট চালাতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না কনির। বোটটা এ রকম জায়গায় চলার জন্যেই তৈরি। কোথাও কোথাও পানিই নেই, থিকথিকে কাদা, তার ওপর দিয়েও প্রায় উড়ে পার হয়ে যাচ্ছে বোট। পানির নিচে লুকিয়ে আছে কাদা ভরা ডোবা, পা দিলেই তলিয়ে যাবে কোমর কিংবা গলা পর্যন্ত। ওগুলোতে কেউ নামলে

অন্যের সাহায্য ছাড়া ওঠা অসম্ভব। সে-সব ডোবা আর শ্যাওলা ও জলজ উদ্ভিদে ছাওয়া জায়গাগুলো সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছে কনি। এখানকার কোথায় কি আছে তার মুখস্থ।

পানির সমতল থেকে উঁচু এক জায়গায় অনেক গাছপালা জন্মে আছে। সেটার কিনারে বোট রেখে কনি বলল, 'এখানেই নামতে হবে। বনের ভেতর একটা ছাউনি পাবে। ওখানে আছে ডনিগান। তোমরা যাও, আমি এখানেই বসি।'

কনিকে ধন্যবাদ দিয়ে বোট থেকে নামল কিশোর আর রবিন। বনের ভেতর দিয়ে এগোল। আশা করছে যে কোন মুহূর্তে ছাউনিটা দেখতে পাবে। কিন্তু মানুষ বসবাসের কোন চিহ্ন কোথাও চোখে পড়ল না।

'কই,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল রবিন, 'কিছু তো দেখছি না। কনি নিশ্চয় ভুল করেছে।'

এই সময় এয়ারবোটের ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ কানে এল ওদের।

'এই কিশোর, ও পালাচ্ছে না তো!' বলেই দৌড় দিল রবিন।

তীরে এসে বোটটা পলকের জন্যে চোখে পড়ল ওদের। জলজ শ্যাওলার ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না। প্ল্যান করেই ওদেরকে এখানে এনে ফেলে যাওয়া হয়েছে।

'শয়তান!' কনির উদ্দেশ্যে রাগে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'দাঁড়া, ফিরে আসি! তারপর দেখাব মজা! তোর ওই বোটসুদ্ধ তোকে জলায় না ডুবিয়েছি তো...'

'খামোকা রাগ করছ,' শান্ত থাকার চেষ্টা করছে কিশোর। পেটের মধ্যে এক ধরনের শূন্য অনুভূতি হচ্ছে তার, বুঝতে দিল না রবিনকে। 'ফিরে যাব কি করে ভেবেছ? জলাভূমির কম পক্ষে দশ মাইল ভেতরে এনে ফেলে যাওয়া হয়েছে আমাদের।'

দিগন্তরেখার কাছাকাছি নেমে গেছে সূর্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্ধকার নামবে।

সেদিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'ভাল বিপদেই ফেলে গেছে শয়তান ছেলেটা। আলো থাকলেও নাহয় চেষ্টা করে দেখা যেত যাওয়া যায় কিনা।'

'এই রাতের বেলা হাজার আলো থাকলেও অ্যালিগেটরের সঙ্গে সাঁতার কাটতে রাজি নই আমি। তার চেয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা দরকার কতখানি ঠাণ্ডা পড়বে বুঝতে পারছি না।'

কনকনে ঠাণ্ডা পড়ল রাতের বেলা। ভাগ্যিস দেশলাই এনেছে সঙ্গে। শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে আগুন ধরাতে পেরেছে। আগুনের কাছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে।

আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দ আর গাছের ডালে বাতাসের কানাকানি নেশা ধরাল যেন। এই বিপদে থেকেও ঢুলতে আরম্ভ করল কিশোর। খানিক পর পরই আগুনে কাঠ ফেলতে লাগল রবিন। একটা সময় সে-ও আর চোখ মেলে রাখতে পারল না।

কাঠ পুড়ে কখন ছাই হলো বলতে পারবে না। আগুন নিভু নিভু। হঠাৎ একটা

শব্দ শুনে চমকে জেগে গেল সে। ভয়ে ভয়ে তাকাল অন্ধকারের দিকে। কান পাতল। সত্যি কি শুনেছে? নাকি দুঃস্বপ্ন?

আবার শুনতে পেল শব্দটা। চেনা চেনা। এ রকম শব্দ আগেও শুনেছে।

আরও এগিয়ে এল শব্দের মালিক। এইবার চিনতে পারল রবিন। কিশোরের হাত খামচে ধরে আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'জলদি ওঠো!'

'কি হয়েছে?' ঘুমজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইল কিশোর।

'শোনো! শুনলেই বুঝবে!'

কাছেই ঝোপের মধ্যে খসখস শব্দ হলো। ওদেরকে ঘিরে চক্কর মারছে বোঝা যায়। অন্ধকারে আবার গর্জন করে উঠল ওটা।

চিনতে পারল কিশোরও। 'পুমা!'

প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিল সে।

শিকারকে নড়তে দেখে রেগে গেল পুমাটা। জোরে গরগর করে উঠল। এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'আসছে!' খসখসে হয়ে গেছে রবিনের কণ্ঠ। সে-ও একটা কাঠ তুলে নিল আগুন থেকে।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজোড়া পান্না রঙের জ্বলন্ত চোখ। সাধারণ অবস্থায় ততটা ভয়ঙ্কর না হলেও খিদে পেলে সাংঘাতিক হিংস্র হয়ে ওঠে পুমা। মানুষ মারতেও দ্বিধা করে না। এটার খিদে কতটা বুঝতে পারল না কিশোর। কিন্তু সুযোগ দিতে চাইল না। জানোয়ারটা দেখা দিতেই আক্রমণ করে বসল। কাঠের জ্বলন্ত মাথাটা সামনে বাড়িয়ে বিকট চিৎকার করে ধেয়ে গেল।

দ্বিধায় পড়ে গেল পুমা। আগুনকে তার বেজায় ভয়। তা ছাড়া যে মানুষ তাকে দেখলে পালাতে পথ পায় না, সে-ই মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে, ব্যাপারটা ঠিক মেলাতে পারল না। ষোলোকলা পূর্ণ করে দিল রবিন। জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারল পুমাকে সই করে। ঘাড়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতে ব্যথায়, রাগে, তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল জানোয়ারটা। এই শিকারগুলো মোটেও নিরাপদ নয় বুঝে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে। তার ছুটে পালানোর শব্দ শোনা গেল।

'খিদে বোধহয় তেমন নেই ব্যাটার,' হাঁপ ছেড়ে বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'আমাদের মত থাকলেও সহজে ছাড়ত না।'

আরও অনেকগুলো কাঠ ফেলে আগুনটা উস্কে দিল রবিন। তৈরি হয়ে বসে রইল দু-জনে। পুমাটা আবার ফিরে যে আসবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মুহূর্তের জন্যে ঘুমাল না আর।

ভোর হলো। পুমাটা পালানোর পর থেকেই একটা কথা ভাবছে কিশোর। ওই জানোয়ার ডাঙার জীব, পাহাড়ে বাস করে। জলাভূমিতে এসেছে নিশ্চয় শিকারের আশায়। ওটা যখন আসতে পেরেছে, নিশ্চয় কোন পথ আছে। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তাই গিয়ে দেখল।

ভাল করে দেখে বুঝল একটা দ্বীপমত জায়গায় রয়েছে ওরা। একদিকে একচিলতে জলাভূমির ওপাশে রয়েছে মাটি, মূল ভূখণ্ড। পানিটা পেরোতে পারলেই ডাঙায় উঠে যাবে।

কোন রকম দ্বিধা না করে পানিতে নেমে পড়ল দু-জনে। পানি একেবারেই কম, হাঁটুও ডোবে না। নিচে কাদাও মোটামুটি শক্ত। হাঁটতে কষ্ট হয় না।

পানিতে ঢাকা জায়গাটা প্রায় পার হয়ে এসেছে, এই সময় থমকে দাঁড়াল রবিন। হাত তুলে বলল, 'দেখো, ওগুলোর হাবভাব বিশেষ সুবিধের লাগছে না!'

কিশোরও দেখল। পানিতে শরীর ডুবিয়ে রোদ পোহাচ্ছে দুটো বিশাল অ্যালিগেটর। সমস্ত শরীর ডোবা, কেবল মাথা আর পিঠের মাঝখানটা উঁচু হয়ে আছে।

নড়ে উঠল একটা অ্যালিগেটর। বোধহয় ওদের প্রতি নজর পড়েছে। সাঁতরে আসতে শুরু করল ধীরে ধীরে।

বরফের মত জমে গেল দুই গোয়েন্দা।

নিচু গলায় তিক্ত কণ্ঠে রসিকতা করল কিশোর, 'অ্যালিগেটরের সঙ্গে কখনও কুস্তি করেছ?'

'এক সেকেন্ডও টিকব না!' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল রবিনের গলা থেকে।

এগিয়ে আসছে অ্যালিগেটর। লড়াই করার জন্যে তৈরি হলো ওরা। বিনা যুদ্ধে হাল ছাড়তে রাজি না।

কিন্তু পুমাটার মতই বোধহয় এই অ্যালিগেটরটাও তেমন ক্ষুধার্ত নয়। ওদের কয়েক ফুটের মধ্যে এসে থেমে গেল। কুৎসিত চোখ মেলে দেখল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত, তারপর মোড় নিয়ে চলে গেল গভীর পানির দিকে।

হাঁপ ছাড়ার সময় হয়নি এখনও। আবার আসতে পারে ওটা। তাছাড়া দ্বিতীয় অ্যালিগেটরটা তো রয়েছেই।

পানিতে কোন রকম শব্দ না করে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে শুরু করল ওরা। তারপর দ্বিতীয় অ্যালিগেটরটার অনেকখানি দূর দিয়ে ঘুরে এসে নিরাপদে ডাঙায় উঠল।

ডাঙা মানেই শুকনো নয়। ভেজা কাদা। মাঝে মাঝে কাদার ডোবা; বলা যায় না, চোরাকাদাও থাকতে পারে। খুব সাবধানে ওগুলো পার হয়ে কিছুদূর আসার পর উঁচু, শুকনো ডাঙার দেখা মিলল।

সূর্য দেখে দিক ঠিক করল রবিন, 'পশ্চিমে এগোচ্ছি আমরা। সোয়াম্প ক্রীক শহরটা উত্তরে থাকার কথা।'

'জানি,' কিশোর বলল। 'সম্ভবত সুওয়ানি নদীর দিকে চলেছি আমরা। উত্তর থেকে দক্ষিণে বইছে ওটা। ওটার কাছে পৌছতে পারলে তীর ধরে ধরে চলে যেতে পারব উত্তরে।'

পশ্চিমেই এগিয়ে চলল ওরা। রাস্তা বলতে কিছু নেই। ঘন জঙ্গল আর ঝোপঝাড় পথ আটকাচ্ছে ওদের। তার ওপর রয়েছে সাপের ভয়। সাবধানে দেখেশুনে পা ফেলতে গিয়ে গতি কমে যাচ্ছে।

নদীর তীরে পৌছল অবশেষে। কাঁটা ঝোপে লেগে কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা। হাত-মুখের চামড়াও অক্ষত নেই।

পা ভেঙে আসছে। পেট জ্বলছে খিদেয়। বিশ্রামের জন্যে বসল ওরা। এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া নদীটার দিকে তাকিয়ে আফসোস করল রবিন, 'ইস্, একটা

নৌকা পেলে আরামে যেতে পারতাম!'

'কিন্তু আরামটা আর করতে পারছি না, দুঃখিত,' উত্তর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। নদীর তীরেও মাঝে মাঝে জলা জায়গা। 'পাঁচ মাইল হাঁটতে হবে এই জলা ধরে। তারপর আরও মাইল দুয়েক উঁচু জায়গা দিয়ে হাঁটলে পরে সোয়াম্প ক্রীক। আশা করি যেতে পারব।'

কষ্টটার কথা ভেবে গোঙানি বেরিয়ে এল রবিনের।

বসে থাকলে কষ্ট শেষ হবে না। আবার রওনা হলো ওরা। নদীর কাছে আসার সময় যতটা কষ্ট হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি কষ্ট লাগল ওটার তীর ধরে হাঁটতে গিয়ে। নদীর তীর বলতে সাধারণত যা বোঝায়—শুকনো বালি কিংবা মাটির পাড়, তা নয়। এখানে কোথাও থিকথিকে কাদা, কোথাও শ্যাওলায় ভরা অগভীর পানি, কোথাও বা আবার গভীর পানির ডোবা। সাঁতরে পেরোতে হলো ওসব জায়গা। সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত থাকতে হচ্ছে অ্যালিগেটরের ভয়ে। কোন দিক দিয়ে এসে টান দিয়ে নিয়ে চলে যাবে টেরও পাওয়া যাবে না। আরও নানা ক্ষতিকর প্রাণী আছে জলাভূমিতে। বিষাক্ত জলজ সাপ আছে, আর জোঁকের তো ছড়াছড়ি।

মাইল দুয়েক এগোনোর পরই একেবারে নেতিয়ে পড়ল দু-জনে।

রবিন বলল, 'আমি আর না ঘুমিয়ে পারব না!'

মাথা নাড়ল কেবল কিশোর। কিছু বলারও যেন শক্তি নেই।

নদীর পাড়ের ভেজা কাদা. একটা মরা গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল ওরা।

'কল্পনাই করতে পারিনি এতটা খারাপ হবে!' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। তার গায়ের ওপর দিয়ে সড়সড় করে সরে গেল একটা সাপ, কিছুই করল না সে। হাত নাড়ানোরও যেন সাধ্য নেই। ব্যাঙ ধরার জন্যে পানিতে গিয়ে নামল সাপটা।

একটা ঝিরঝির শব্দ কানে আসছে। নদীর দিকে চোখ ফিরিয়ে আচমকা ঝটকা দিয়ে উঠে বসল রবিন। 'দেখো, দেখো, একটা বোট!'

কিশোরও উঠে বসল। দক্ষিণে ভাটির দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা মাঝারি আকারের মোটর বোট।

'স্বপ্ন দেখছি না তো!' কিশোর বলল।

'না!'

নদীর পানির কাছাকাছি সরে চলে এল ওরা। বোটটা কাছে এলে হাত নেড়ে, চিৎকার করে ডাকতে লাগল।

বোটের আরোহী দু-জন বয়স্ক দম্পতি। মাথায় খড়ের হ্যাট, গায়ে উজ্জ্বল রঙের শার্ট। চাষী কিংবা জেলে হবে সম্ভবত। পানি আর কাদায় মাখামাখি দুটো ছেলেকে এ রকম একটা নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে আসতে দ্বিধা করতে লাগল ওরা। তবে শেষ পর্যন্ত বোটের নাক ঘোরাল এদিকে।

'এখানে এলে কি করে?' বোট থেকে তীরে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'রসিকতা করে আমাদের ফেলে রেখে গেছে একজন,' বলল কিশোর।

'এটা কি ধরনের রসিকতা হলো!' অবাক হয়ে বলল লোকটা।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মহিলা, 'সর্বনাশ! জোঁকে খেয়ে ফেলল তো তোমাদের!'

এতক্ষণে লক্ষ করল দুই গোয়েন্দা, অনেকগুলো বড় বড় জোঁক ওদের চামড়া কামড়ে ধরে ঝুলছে। ক্লান্তি, ভয় আর অনিশ্চয়তায় কোন সাড়ই ছিল না যেন শরীরের। টান দিয়ে খসাতে গেল ওরা জোঁকগুলো। বাধা দিল মহিলা। ওভাবে সরালে রক্ত বন্ধ হবে না। বোট থেকে খানিকটা নুন নিয়ে এল।

কিশোর আর রবিনকে গায়ের সব কাপড় খুলে ফেলতে বলল মহিলা। লজ্জায় দ্বিধা করতে গিয়ে ধমক খেতে হলো। দম্পতিকে রাগিয়ে দিয়ে বিপদে পড়তে চায় না, তাই শেষ পর্যন্ত খুলতে বাধ্য হলো দু-জনে। লবণের সাহায্যে নির্বিকার মুখে ওদের গা থেকে জোঁকগুলোকে খসিয়ে দিল মহিলা। নদীর পানিতে গা ধুয়ে উঠে আবার কাপড় পরল ছেলেরা।

জানা গেল, সোয়াম্প ক্রীকেই যাচ্ছে দম্পতি। কিশোর আর রবিনকে বোটে তুলে নিল। ওরা অনেকক্ষণ কিছু খায়নি শুনে স্যাণ্ডউইচ বের করে দিল। বিনিময়ে কি করে এই অজায়গায় এসেছে, সেই গল্প শুনিয়ে বুড়োবুড়িকে তাজ্জব করে দিল গোয়েন্দারা।

সোয়াম্প ক্রীকে পৌঁছল বোট। গোয়েন্দাদের বোটে থাকতে বলে মোটেলে গিয়ে শুকনো কাপড়-চোপড় নিয়ে এল মহিলা। তার সঙ্গে এল মুসা।

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে রবিন বলল, 'অনেক করেছেন আমাদের জন্যে। কি বলে যে ধন্যবাদ দেব!'

হাত নেড়ে বলল মহিলা, 'কি আর এমন করলাম। ও রকম জায়গায় আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তোমরাও তুলে নিয়ে আসতে।'

দম্পতিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বোট থেকে নামল দুই গোয়েন্দা। কনির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া রয়েছে। মুসাও চলল ওদের সঙ্গে।

আগের দিন বোটটা যেখানে ডকে বাঁধা দেখেছিল, সেখানেই দেখা গেল।

এক ধাক্কায় কেবিনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। পেছনে ঢুকল রবিন আর মুসা।

ওদেরকে দেখে হাঁ হয়ে গেল কনির মুখ। তোতলাতে শুরু করল, 'কি-ক্কি করে তোমরা...'

তার কলার ধরে একটানে তুলে নিয়ে দেয়ালে ঠেসে ধরল মুসা, 'সত্যি কথা বলো, যদি শেরিফের কাছে যেতে না চাও।'

'আ-আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে ও!' হাত তুলে টেবিল দেখাল কনি, 'ওই যে ওখানে দেখো। একটা চিঠি আছে।'

টেবিল থেকে কাগজের টুকরোটা তুলে নিল কিশোর। মোটেলের জানালা দিয়ে যে চিঠিটা ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল ওদের, ওটার মতই এটাতেও বিপ্লবীদের প্রতীক আঁকা। চিঠিতে আদেশ দেয়া হয়েছে গোয়েন্দাদেরকে জলাভূমিতে নিয়ে গিয়ে সাপ আর অ্যালিগেটরের মুখে ফেলে আসার জন্যে। কনি কথা না শুনলে তার ওপর আসবে সোয়াম্প ফক্সের অতর্কিত আঘাত। নিচে ডনিগানের নাম সই করা।

চিঠিটা পড়ে মুসাকে বলল কিশোর, 'ওকে ছেড়ে দাও। যত শয়তানী

ডনিগানের। হাজতে ভরা দরকার ওটাকে।'
'ভরা হয়ে গেছে,' মুসা জানাল। 'কাল রাতেই শেরিফ ওকে ধরে নিয়ে গেছেন।'
'কিসের অভিযোগে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
হাসল মুসা। 'রকি বীচ গ্যালারিতে চুরি।'

নয়

কনিকে ছেড়ে দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। শেরিফের অফিসে রওনা হলো শেরিফ এবং ডনিগানের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

দুটো সেলের একটাতে ভরে রাখা হয়েছে ডনিগানকে। খাঁচায় বন্দি বুনো জানোয়ারের মত পায়চারি করছে সে।

'আমি চুরি করিনি!' শেরিফ আর ছেলেদের দেখে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো।

'কনিকেও নিশ্চয় চিঠি লেখেননি আমাদের জলাভূমিতে ফেলে আসার জন্যে?' বাঁকা করে বলল রবিন।

সেলের শিক চেপে ধরল ডনিগান, 'অবশ্যই না! সমস্ত শয়তানী রাজা জর্জের! সে-ই সব কিছুর হোতা!'

লোকটার মাথার স্থিরতা সম্পর্কে সন্দেহ বাড়ল কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'রকি বীচ গ্যালারিতে চুরিও কি আপনার রাজাই করেছে?'

'তা তো করেছেই,' জোর গলায় বলল ডনিগান। 'তোমাদের বলেছি কলোনির লোকের কাছ থেকে এখনও ট্যাক্স আদায় করে সে। টাকার বদলে জিনিস নিয়ে যায়।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে আঙুলের ইশারায় ছেলেদের সরে আসতে বললেন শেরিফ। অফিসে নিয়ে এলেন। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এসে চেয়ারে বসে বললেন, 'আমিও এর বেশি কথা আদায় করতে পারিনি তার কাছ থেকে। তবে প্রমাণপত্র যা পেয়েছি তাতে সব পরিষ্কার। ডনিগানকেই দোষী মনে হয়। আজ সকালে ওই জিনিসগুলো পেয়েছি তার গ্যারেজে।'

এককোণে টেবিলে রাখা কতগুলো রূপার জিনিস আর ক্যানভাসে আঁকা তিনটে ছবি দেখালেন তিনি।

'কাল রাতে তোমরা যখন ফিরলে না, মুসা আমাকে ফোন করল,' একটা ক্যান্ডি বের করে তার মোড়ক ছাড়াতে লাগলেন শেরিফ। 'দু-জন ডেপুটিকে নিয়ে জলাভূমিতে গেলাম। তোমাদের পেলাম না। কনিকেও না. তাকে পেলে সুবিধে হত। গেলাম তখন ডনিগানের বাড়িতে। বাড়ি সার্চ করে গ্যারেজের মধ্যে পেয়েছি জিনিসগুলো।'

'পাওয়ারসের গ্যালারি থেকে কি এগুলোই চুরি হয়েছিল?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ। গ্যারেজে অন্য সব জিনিসের সঙ্গে এগুলো মেলে না। অনেক বেশি দামী। রকি বীচ পুলিশকে ফোন করে জিনিসগুলোর বর্ণনা দিলাম। ওরা বলল এগুলো গ্যালারি থেকেই চুরি হয়েছে। তখন অ্যারেস্ট করলাম ডনিগানকে।'

কাজে সন্তুষ্ট হয়ে যেন কাওকে পুরস্কৃত করছেন, খানিকটা ক্যান্ডি মুখে পুরে দিলেন শেরিফ। তাঁর ভাবভঙ্গিতে সে-রকমই লাগল। কিশোর আর রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল রাতে কি হয়েছিল তোমাদের?'

সব ঘটনা খুলে বলল দুই গোয়েন্দা।

'ভাগ্য ভাল তোমাদের মোটরবোটটা এসেছিল,' গোয়েন্দাদের আটকা পড়ার রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে শুনতে ক্যান্ডি খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শেরিফের, আবার শুরু করলেন। 'নইলে আরও একটা রাত কাটাতে হত ওই ভয়াবহ জলাভূমিতে। খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে যেত আমাদের জন্যে।'

'আচ্ছা,' অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল কিশোর, 'এই রাজা জর্জের ব্যাপারটা কি বলুন তো? বার বার এক কথা কেন বলছে ডনিগান?'

বাকি ক্যান্ডিটুকু মুখে পুরে দিলেন শেরিফ। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'ডনিগানের ধারণা আমেরিকার বিপ্লব এখনও চলছে। ওর এক পূর্বপুরুষ হ্যামারনস ডনিগান ছিল বিখ্যাত বিপ্লবী। নাম হয়ে গিয়েছিল জলাভূমির শেয়াল বলে। বিপ্লবের সময়...'

বাধা দিল রবিন, 'এসব গল্প আমাদের বলেছে ডনিগান। একটা কথা বুঝতে পারছি না সে এখনও কেন বিশ্বাস করছে রাজা তৃতীয় জর্জ বেঁচে আছেন এবং কর আদায় করছেন কলোনিবাসীদের কাছ থেকে?'

'এর একটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি,' শেরিফ বললেন। 'গ্যারেজে একটা লাল জ্যাকেট আর কিছু পুরানো কাপড়চোপড় পেয়েছি, আঠারো শতকের কোন সম্ভ্রান্ত ইংরেজের হবে ওগুলো। আমি মানসিক রোগের ডাক্তার নই, তবু বলতে পারি কেসটা মানসিক।'

'আপনি বলতে চান,' কিশোর বলল, 'জলাভূমির শেয়াল আর রাজা তৃতীয় জর্জের ব্যাপারটা মানসিক রোগ?'

মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। 'অনেক বয়েস হয়েছে ডনিগানের। সবাই জানে তার মাথায় ছিট আছে। তেকোনা হ্যাট পরে বিপ্লবী সেজে থাকে। তার মাথায় এখনও গেড়ে বসে আছে আমেরিকার বিপ্লব। তাই কিছুতেই জলাভূমির শেয়াল আর রাজা তৃতীয় জর্জকে দূর করতে পারছে না মগজ থেকে।'

'খাইছে! তারমানে তো বদ্ধ উন্মাদ! গ্যালারিতে চুরির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে ভাবছেন?' মুসার প্রশ্ন।

আবার মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। 'সবই আমার অনুমান, তবু বলি। তার এখনও বিশ্বাস, গ্যালারির মালিকেরা যেহেতু বড়লোক, তারা ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে আছে; বিপ্লবের সময় বেশির ভাগ ধনীই যা করেছিল। সুতরাং তাদের মাল লুট করে আনা উচিত। তাতে কোন দোষ নেই।'

'হুঁ,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'পাগলে অনেক কিছুই করে। তবু বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'এ ছাড়া অবশ্য আর কোন ব্যাখ্যাও নেই,' শেরিফ বললেন। 'শহরের অনেকে নাকি রাজা জর্জের ভূত দেখেছে। জলাভূমির কিনারে রাতের বেলা দেখা দেয় এই ভূত। পাঁচ-ছয়জন লোক কসম খেয়ে বলেছে দু-দিন আগেও ভূতটাকে দেখেছে।'

'গ্যাসের কারসাজি হতে পারে এটা। আপনি নিশ্চয় জানেন জলাভূমিতে মিথেন গ্যাসের বাষ্প তৈরি হয়, আর মানুষের মগজে এমন সব বিক্রিয়া করে এই গ্যাস আবল-তাবল দেখতে থাকে মানুষ। ওই সময় কল্পনায় ভূত দেখাটা বিচিত্র নয়।'

'প্রথমে আমিও এ কথাই ভেবেছিলাম,' নড়েচড়ে বসলেন শেরিফ। 'তারপর আমার একজন লোক এসে বলল সে-ও ভূত দেখেছে। একেবারে স্পষ্ট দেখেছে। নতুন করে ভাবতে হলো আমাকে। মনে এল ডনিগানের কথা। রাজা জর্জের বিরুদ্ধে তার আক্রোশের কথা শুনেছি। মনে হলো, সে-ই কোন কারণে রাজা সেজে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে না তো?'

'হয়তো দেখিয়েছে,' তর্ক শুরু করল কিশোর, 'তাতে কি? তাতে প্রমাণ হয় না দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়িয়ে গ্যালারি আর অ্যানটিক শপগুলোতে চুরি করেছে সে। তাছাড়া জিনিস তো পেয়েছেন মোটে এই কটা। বাকিগুলো কোথায়?'

'হয়তো অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। জলাভূমিরই কোথাও। সে মুখ না খুললে যেখান থেকে কোনদিনই উদ্ধার করা যাবে না জিনিসগুলো।'

ডনিগানের সঙ্গে আরেকবার কথা বলার অনুমতি চাইল কিশোর। রাজি হলেন শেরিফ।

কোমল স্বরে ডনিগানকে বলল কিশোর, 'একটা কথা সত্যি বলবেন; কোথায়, কখন আপনার সঙ্গে রাজার দেখা হয়েছে?'

'গত বছর,' জবাব দিল ডনিগান। 'মারদি গ্রাস প্যারেডে, ফ্যাট টিউজডেতে। তাকে অনুসরণ করে তার পার্টিতে গেলাম। ফ্যাট টিউজডের দিনে অনেকেই পার্টি দেয়, জানো বোধহয়।'

'কিসের পার্টি?'

'সবাই তো দেয় খাওয়া আর নাচগানের পার্টি। কিন্তু রাজারটা অন্য রকম। সে লুটের মাল ভাগ করে দেয় তার দলের লোককে।'

'কোন জায়গায়?'

'শহরের বাইরে সুন্দর একটা বাড়িতে।'

'ঠিকানা বলতে পারেন?'

মাথা নাড়ল ডনিগান। 'না। তাকে অনুসরণ করে গিয়েছি। ঠিকানা জানি না।'

'আপনার বাড়িতে যে রূপার জিনিস আর ছবিগুলো পাওয়া গেছে, এ ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য?'

'বাড়িতে নয়, আমার গ্যারেজে। সারাক্ষণ খোলা থাকে ওটা। যে কেউ গিয়ে ফেলে রেখে আসতে পারে। ওগুলো আমি রাখিনি, আমি চোর নই, এ কথা বিশ্বাস করতে পারো!'

থানা থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। ডনিগান চোর, এটা কিশোরও বিশ্বাস

করতে পারছে না। মন খুঁতখুঁত করছে তার। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়েছে।
মোটেলে ফিরতে দেখা হলো এনডির সঙ্গে। সে বলল, 'এয়ারপোর্ট ম্যানেজার কয়েকবার ফোন করেছে তোমাদের। বলেছে এলেই যেন ফোন করো। জরুরী।'
ফোন করল কিশোর।
তখনই ওদেরকে দেখা করতে বলল ম্যানেজার।
ঘরে ঢুকল না আর গোয়েন্দারা। আবার মোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো এয়ারপোর্টে।

দশ

সেসনাটা নেই এয়ারপোর্টে।
ম্যানেজার জানাল, চলে গেছে।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কথা জিজ্ঞেস করেননি?'
'তোমাদের কথা বলাতেই তো পালাল। এমন তাড়াহুড়া শুরু করল···সে ওড়ার আগেই তোমাদের ফোন করেছি। পেলাম না।'
'জরুরী কাজে আটকা পড়েছিলাম। লোকটার চেহারা দেখেছেন এবার?'
'না। চোখে আরও বড় চশমা পরেছে। তবে শরীরটা দেখেছি। মাঝারি উচ্চতা, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল না—রোগাই বলা চলে, কালো কোঁকড়া চুল। তার সঙ্গের যাত্রী ভদ্রলোক এবারও অনেক দূরে দূরে ছিল। প্লেনে ওঠার আগের মুহূর্তে তাকে দেখলাম। ওই লোকটা লম্বা।'
'সেসনাটা যাবে কোথায়?'
'ফ্লাইট প্ল্যানে আছে নর্থ ক্যারোলিনার শ্যারলোটি। কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যে কথা বলেছে। উল্টো দিকে গেছে প্লেনটা।' এক মুহূর্ত ভেবে বলল ম্যানেজার, 'সম্ভবত নিউ অরলীনসে।'
শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'আপনি শিওর?'
'অন্য কোনখানেও যেতে পারে। তবে তেল নেয়ার জন্যে হলেও নিউ অরলীনসে নামতে হবে।'
ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে মোটেলে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা।
রবিন বলল, 'আগে যে সন্দেহ করা হয়েছিল হোভার ম্যানিলার প্যাসেঞ্জার ডনিগান, সেটা এবার বাদ দিতে হচ্ছে। ডনিগান হাজতে বন্দি।'
'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল কিশোর। 'ব্যাপারটা শুরু থেকেই কেমন লাগছিল আমার। সে যে চোর এটা প্রমাণের জন্যে জোর করে সব সাক্ষি-প্রমাণ হাজির করা হচ্ছে। অথচ লোকটাকে সে-রকম মনে হয় না।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাওয়া গাছের সারি দেখল কয়েক সেকেন্ড। 'এখন আমার মনে হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা সাজানো। কেউ তাকে চোর প্রমাণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'তারমানে,' মুসা বলল, 'ভুল লোকের পেছনে লাগিয়ে আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কেউ?'

'সম্ভবত। ডনিগানের ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে নানা রকম ফন্দি করে চলেছে।'

'কে সেই লোক? হোভার ম্যানিলা? নাকি তার প্যাসেঞ্জার?' রবিনের প্রশ্ন।

মোটেলে ফিরে মিস্টার সাইমনকে ফোন করল কিশোর। যা যা ঘটেছে জানাল। নীল সেসনাটা নিউ অরলীনসের দিকে গেছে শুনে তিনি বললেন, 'ওখানকার এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে শিওর হয়ে নাও, সত্যি প্লেনটা গেছে কিনা ওখানে।'

তাই করল কিশোর। জানা গেল, গেছে।

ব্যাগ গোছাতে দেরি করল না তিন গোয়েন্দা। নিউ অরলীনসে যাবে। মোটেল থেকে বেরোনোর আগে এনডির কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। মুসা ওদের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল চিঠি লিখতে। সাপের কামড় খেয়ে সে বিছানায় পড়ে থাকার সময় অনেক সেবা-যত্ন করেছে মেয়েটা।

রাত-দুপুরে নিউ অরলীনস এয়ারপোর্টে নামল তিন গোয়েন্দা। ক্লান্ত। অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে—বাসে করে সাভান্না, তারপর বিমান।

পুরানো দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরটায় হাজার হাজার লোকের ভিড়। মারদি গ্রাস উৎসব দেখতে এসেছে কেউ, কেউ এসেছে যোগ দিতে। অনেকের পরনে উজ্জ্বল রঙের ঝলমলে উৎসবের পোশাক। ঝাঁক বেঁধে এগোচ্ছে রাস্তা দিয়ে। দু'ধারের রেস্টুরেন্টগুলোতে তিল ধারণের জায়গা নেই, জোর বাজনা ভেসে আসছে ভেতর থেকে।

'উফ্, আর পারি না,' পা টেনে টেনে হাঁটছে মুসা। 'জলদি একটা হোটেলে ঢুকে শুয়ে পড়া দরকার।'

'হোটেল লাগবে না আমাদের,' মনে করিয়ে দিল রবিন, 'বিড ওয়াকার তার দাদার ঠিকানা দিয়েছে। ক্লাবের ওপরতলায় থাকার ঘর আছে।'

বুরবন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে ওরা। জ্যাজ মিউজিকের জন্যে সবচেয়ে বিখ্যাত জায়গা ওটা। ইতিহাস হয়ে গেছে।

ভিড় ঠেলে একটা ক্লাবের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। লাল নিওন সাইনে দরজার সামনে লেখা রয়েছে:

ওয়াকার'স মিউজিক সেন্টার

তুমুল গানবাজনা চলছে তখন ক্লাবের ভেতর। নাম জিজ্ঞেস করতেই একজন লোক দেখিয়ে দিল বিডের দাদা ডেভিড ওয়াকারকে।

পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা।

তাঁর নাতির বন্ধু শুনে হাসি একান ওকান হয়ে গেল ওয়াকারের। বললেন, 'বিড ফোন করেছিল। বলল তোমরা আসছ। নিশ্চয় খুব টায়ারড। ওপরতলায় ঘর রেডিই আছে। ইচ্ছে করলে শুয়ে পড়তে পারো গিয়ে।'

বিডের দাদাকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিশোর বলল, 'আমরা আসলে উৎসব দেখতে আসিনি। একটা কেসের তদন্ত করতে এসেছি। বিড নিশ্চয় বলেছে

আপনাকে, আমরা গোয়েন্দা। আমাদের বলেছে আপনি এখানে ভুডুওলাদের নিয়ে খুব বিপদের মধ্যে আছেন।'

মরা পাখি আর বিড়ের নাম নয়বার লিখে একটা কাগজ পাঠানো হয়েছে শুনে মুখ শুকিয়ে গেল ওয়াকারের। রাগে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, 'নিউ অরলীনস থেকেই পাঠানো হয়েছে! শয়তানগুলো এখন আমার পরিবারের পিছে লেগেছে! ব্যাপারটা পরিবারের কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। আর রাখা যাবে না।'

'তারমানে সত্যি সত্যি বিপদের মধ্যে আছেন আপনি?'

কোণের একটা টেবিলে ছেলেদের নিয়ে গেলেন ওয়াকার। চেয়ারে বসলেন। দু-হাতে মাথা টিপে ধরে বললেন, 'ব্যাপারটার কি ভাবে ব্যাখ্যা করব বুঝতে পারছি না। ভুডুওলারা জ্বালাচ্ছে খুব।' ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের বোধহয় খাওয়া হয়নি। এখনই সব শুনতে হবে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, পরে বললেও চলবে। আগে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিই।'

দোতলার শোবার ঘর দেখিয়ে দিলেন ওয়াকার। খাবারের ব্যবস্থা করলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার ওয়াকারের সঙ্গে কথা বলতে বসল কিশোর। রবিন দাঁড়াল গিয়ে জানালার ধারে। ওখান থেকে রাস্তা আর লোকজন দেখা যায়। মুসার শরীর খারাপ, সাপের কামড়ের ধকল পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, সে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ, এইবার বলুন,' কিশোর বলল।

'কি আর বলব, মাঝে মাঝেই ক্লাবে ঢুকে পড়ে ভুডুওলারা,' দুঃখের সঙ্গে বললেন ওয়াকার। 'ভেঙেচুরে তছনছ করে। কি যে চায় ওরা কিছু বুঝি না। কয়েক হপ্তা ধরে চলছে এই জ্বালাতন। আমার অনেক কর্মচারী ভয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। এ ভাবে চলতে থাকলে ব্যান্ডই বন্ধ হয়ে যাবে, ব্যবসা খতম।'

'পুলিশকে জানাননি?'

'জানিয়েছি। ওরা কিছু করতে পারছে না। আসলে করার চেষ্টাও করছে না। ব্যাপারটাকে স্রেফ রসিকতা বলে ধরে নিয়েছে। মারদি গ্রাসের সময় লোকে এরকম রসিকতা করেই থাকে। শহরে লোকের ভিড়। সাংঘাতিক ঝামেলা। পুলিশ এখন ওদের সামলাতে ব্যস্ত।'

'আপনারও কি রসিকতা মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না,' নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ওয়াকার। 'রসিকতা হলেও তার ঠেলায় আমার ব্যবসা লাটে ওঠার জোগাড় হয়েছে। কর্মচারীরা এটাকে রসিকতা মনে করছে না।'

'আপনার পেছনে কেন লেগেছে ওরা বুঝতে পারছেন না?'

'না। শুরুতে অবশ্য বলেছিল আমাকে, এই ক্লাবটা কোন এক ভুডু দেবতার বাড়ি। ওরা দেবতাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। তখন পাগলই ভেবেছিলাম লোকগুলোকে।'

জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'ওরা কি আপনার

তেমন কোন ক্ষতি করেছে? মানে মারপিট, এসব?'

'কিছু কিছু তো করেছেই, কর্মচারীদের। সেই ভয়েই তো পালিয়েছে ওরা। এখানে এই গণ্ডগোল রেখে রকি বীচেও যেতে পারলাম না। আমি সরলেই জায়গাটাকে ধ্বংস করে দেবে ওরা।' দুশ্চিন্তার কালো ছায়া দেখা দিল বৃদ্ধ বংশীবাদকের মুখে। 'বুঝতে পারছি না ওরা আমার নাতির ঠিকানা পেল কি করে? ওকে মরা পাখিই বা পাঠাল কেন?'

'হয়তো ওটাও রসিকতা,' অনুমান করল কিশোর। 'কিংবা তাকে হুমকি দিয়েছে আপনাকে ভয় দেখানোর জন্যে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন ওয়াকার। 'জানা মতে আমার কোন শত্রু নেই। কখনও কারও কোন ক্ষতি করিনি। আমার পেছনে লাগল কেন?'

'সেটা জানার জন্যেই এসেছি আমরা,' বিছানা থেকে জবাব দিল মুসা। ঘুমায়নি এখনও।

এগারো

সকাল বেলা এয়ারপোর্টে গেল ওরা নীল বিমানটার খোঁজে। বিমানটার খোঁজ পাওয়া গেল। কিন্তু ম্যানেজার জানাল, পাইলট কিংবা তার যাত্রী কোথায় উঠেছে, জানে না।

'নাহ্, লাভ হলো না,' কিশোর বলল। 'শহর ভর্তি লোক। কোথায় খুঁজব ওদের?'

রবিন বলল, 'চোরাই মাল নিউ অরলীনসে খালাস করতে এসে থাকলে চোর-ডাকাতরা তার খবর জানবে।'

'সেই চোর-ডাকাতদেরই বা কোথায় পাব?'

'তাহলে কি করব?' মুসার প্রশ্ন। 'তুমিই যদি উপায় বের করতে না পারো, আমরা কি বলব?'

'এক কাজ করা যায়,' কিশোর বলল। 'পুলিশের কাছে গিয়ে এখানকার হোটেলে নতুন যারা উঠেছে তাদের নাম জানতে পারি। তাতে হয়তো ম্যানিলার নাম বেরোতেও পারে। যদিও খুব একটা আশা নেই।'

থানায় এসে পুলিশ চীফ হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করল ওরা। নিজেদের পরিচয় দিল। গোয়েন্দা ভিক্টর সাইমনের কথা বলল। ওদেরকে দেয়া ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসাপত্রটা দেখাল। তারপর সাহায্য চাইল। চীফ কথা দিলেন, হোভার ম্যানিলার নাম তাঁর তালিকায় এলে ওয়াকারের ক্লাবে ফোন করে জানাবেন।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তা ধরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে একটা সাইনবোর্ড দেখে থমকে দাঁড়াল রবিন। হাত তুলে অন্য দু-জনকে দেখাল নোংরা জানালার আজব লেখাগুলো:

উইচক্র্যাফট, ম্যাজিক, ভুডু

'চলো, ঢুকে দেখি,' বলল সে।
'কি দেখব?' ভয় পাচ্ছে মুসা।
'ভুডুর ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু জানবে এরা,' জবাবটা দিল কিশোর।
দোকানের মালিক একজন অল্পবয়েসী মহিলা। ঘরের কোণে পিঠউঁচু, ভারী গদিওয়ালা অনেক পুরানো একটা চেয়ারে বসে আছে। পরনে ঢোলা গাউন, গলায় পুঁতির মালা। হাতে জটিল অলঙ্করণ করা অনেকগুলো রূপার ব্রেসলেট।
দেয়ালের তাকে সারি সারি বয়মে নানা রঙের তরল পদার্থ আর গাছগাছড়ার আরক ও রস ভরা।
চেয়ার থেকে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল মহিলা, 'কিছু লাগবে?'
'আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি,' সৌজন্য দেখিয়ে খুব ভদ্রভাবে বলল কিশোর, 'লস অ্যাঞ্জেলেস। আপনি কি আমাদের একটা সাহায্য করতে পারেন?'
'কি সাহায্য, বলো?'
'বংশীবাদক ওয়াকারের ক্লাবে শুনলাম বেশ কিছু ভুডুওয়ালা উৎপাত করছে। আপনি জানেন কিছু?'
'এখন তো এ সব ঘটবেই,' গুরুত্বই দিল না মহিলা। 'মারদি গ্রাসের সময় নানা রকম কাণ্ড করে লোকে। রসিকতা করে। নিশ্চয় ওরকমই কিছু হবে। ভুডুর বাহানা করে মজা করছে। সত্যি সত্যি যারা ভুডুর চর্চা করে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করে। জাহির করে না।'
'কিন্তু মিস্টার ওয়াকারের কাছে যা শুনলাম, ওরা রসিকতা করছে না। জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করেছে, কর্মচারীদের মেরে তাড়িয়েছে।'
'এমন কোন দলের কথা তো শুনিনি। এখানে পুরানো যারা ভুডুর প্র্যাকটিস করে তাদের সবাইকেই চিনি আমি। নতুন একজনই আসে আমার এখানে জিনিসপত্র কিনতে। লোকটাকে রহস্যময়ই লাগে আমার কাছে। ভুডু চর্চা করে কিনা বলতে পারব না।'
আগ্রহী হলো কিশোর। 'তার নামটা বলতে পারবেন, প্লীজ?'
'এক মিনিট।' টেবিলে রাখা একটা রেজিস্টার বের করে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল মহিলা। 'যারা জিনিস কিনতে আসে, তাদের নাম লিখে রাখি। বলা যায় না কোথায় গিয়ে কি অঘটন ঘটিয়ে বসবে। পুলিশ এসে হানা দেবে আমার এখানে।...এই যে পেয়েছি। নিকোলাস বাজোরা।'
নোটবুকে নাম-ঠিকানা লিখে নিল রবিন।
মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে কিশোর জানতে চাইল, 'আপনিও কি ভুডু চর্চা করেন?'
'না, আমি ডাইনী।'
'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। 'আপনি কী?'
'ডাইনী,' হাসল মহিলা। 'ভয় নেই, ক্ষতি করি না আমি কারও। জাদুর জালেও জড়াই না। বিদ্যেটা জানি আরকি।'
'ও,' নিশ্চিন্ত হতে পারছে না মুসা।
'ভুডুর ব্যাপারে খোঁজ পেতে পারো আরেকজনের কাছে গেলে। ভুডু

বিশেষজ্ঞ। তার নাম হিউগ নিরমান্তি।' ঠিকানা আর ফোন নম্বর বলল মহিলা, রবিন লিখে নিল। 'আমার কথা বললে খুশি হয়ে সাহায্য করবে।'

এ ভাবে অযাচিত সাহায্য পেয়ে খুশি হলো কিশোর। মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

বাইরে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ল মুসা, 'বাপরে বাপ, বাঁচলাম! ভয়ই পাচ্ছিলাম, জাদু-টোনা না করে বসে!'

'অকারণে করতে যাবে কেন?' রবিন বলল, 'তা ছাড়া শুনলে না বলল কারও ক্ষতি করে না।'

'কি জানি বাপু! ডাইনী ডাইনীই! ভাল মানুষ ডাইনী হতে যাবে কোন দুঃখে!'

এ সব আলোচনায় কান দিল না কিশোর। সে ভাবছে কোন ঠিকানাটায় আগে যাবে? প্রথমে নিকোলাস বাজোরার ওখানে যাওয়া স্থির করল।

নিউ অরলীনসের পুরানো এলাকার ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে পাওয়া গেল বাড়িটা। নিকোলাসের নাম লেখা রয়েছে একটা বেল বাজানোর ঘণ্টার নিচে। সেটা দেখে বোঝা যায় কয় তলায় থাকে। টিপ দিল কিশোর। জবাব এল না।

মুসাকে বলল সে, 'টপ ফ্লোরে থাকে নিকোলাস। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওপরের জানালার দিকে চোখ রাখো। দেখো কেউ ঢোকে বেরোয় কিনা। জরুরী মনে হলে নিরমান্তির ফোন নম্বরে ফোন কোরো আমাদের। আমি আর রবিন ওখানে যাচ্ছি।'

একা থাকতে ভাল লাগল না মুসার। কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতে সব ব্যাপারই পছন্দ হবে, এমন কোন কথা নেই। তাই কিছু বলল না।

হিউগ নিরমান্তিও ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারেই বাস করেন। কলেজের প্রফেসর ছিলেন। অবসর নেয়ার পর ভুডু আর ব্ল্যাক আর্ট নিয়ে গবেষণা করছেন। একা থাকেন। কিশোর আর রবিনকে দেখে খুশিই হলেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন তাঁর সংগ্রহের নানা অদ্ভুত জিনিস। ভুডু আর ব্ল্যাক আর্টের চর্চা করতে কাজে লাগে ওগুলো। আফ্রিকা থেকে কি করে এই বিদ্যাটা হাইতিতে এবং পরে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, বললেন।

'নিউ অরলীনসে প্রচুর লোক ভুডু চর্চা করে,' জানালেন তিনি। 'মিসিসিপি নদীতে প্রায়ই ভেসে যেতে দেখা যায় মুণ্ডু কাটা মোরগ, বিড়াল, ছাগল এ সব জানোয়ার। বলি দেয়া হয় ওগুলো।'

'আচ্ছা,' রবিন জিজ্ঞেস করল, 'বংশীবাদক ওয়াকারের ক্লাবটা চেনেন নাকি?'

'চিনব না কেন। চিনি।'

'ওখানে নাকি ইদানীং ভুডুওয়ালারা উৎপাত করছে, শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'কি মনে হয় আপনার?'

'আসলে মারদি গ্রাসের সময় এই ধরনের ব্যাপার ঘটেই থাকে। লোকে মজা করার জন্যে করে এ সব। কোনটা যে আসল আর কোনটা মজা, বোঝাই মুশকিল।'

এই সময় ফোন বাজল। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকালেন নিরমান্তি।

ওপাশের কথা শুনে রিসিভারটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার।'
মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পেল কিশোর, 'একটা লোক ঢুকেছিল। সবুজ ক্যাডিলাক নিয়ে এসেছিল। ঢুকে, কয়েক মিনিট থেকে বেরিয়ে গেছে।'
'কথা বলেছ তার সঙ্গে?'
'মাথা খারাপ। বিশাল দেহী, ভাবভঙ্গি একটুও ভাল লাগল না। কাছাকাছি ফোন পেলাম না, তাই তোমাকে জানাতে দেরি হলো।'
'হুঁ। ইয়ে করো, ওয়াকারের ক্লাবে চলে যাও। আমরা ওখানে যাচ্ছি।'
প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

বারো

'নিকোলাস বাজোরাকে চিনি আমি,' সব শুনেটুনে বললেন ওয়াকার। 'সে-ও মিউজিশিয়ান। আগে ড্রাম বাজাত। এখন ভুডু কিং।'
'আপনি চেনেন!' সামনে ঝুঁকে বসল কিশোর।
'চিনি। কিন্তু বহু বছর ধরে দেখাসাক্ষাৎ নেই। জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে শুনেছি একটা ক্লাবের মালিক হয়েছে, হাফ-মালিক।'
'আপনার সঙ্গে শত্রুতা আছে নাকি?'
আনমনে কাঁধ ঝাঁকালেন বংশীবাদক। 'না। তবে ওর কথা কিছু বলা যায় না। স্বভাবটাই বুনো। খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল যখন, তখন থেকেই শুরু হলো অধঃপতন। ওর মিউজিশিয়ান বন্ধুরা অনেক চেষ্টা করেও আর ভাল করতে পারল না।'
'এখন একটা ক্লাবের আংশিক মালিকানা তার, বলছেন।'
'হ্যাঁ। মিউজিক হেভেন। শহরের বাইরে। ছোট ক্লাব।'
'ওর লোকেরা কেন আপনাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে জানেন না?'
মাথা নাড়লেন ওয়াকার, 'না।'
চিন্তিত ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল কিশোর। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। রাস্তায় অসম্ভব ভিড়। গাড়িগুলো চলছে শামুকের গতিতে।
আবার ফিরে তাকাল কিশোর, 'গত কিছু দিনের মধ্যে আপনার ক্লাবটা কেনার প্রস্তাব দিয়েছে কেউ?'
ভুরুজোড়া কাছাকাছি হলো ওয়াকারের। 'হ্যাঁ! তুমি জানলে কি করে?'
'অনুমান। খুলে বলুন।'
'কয়েক হপ্তা আগে কিনতে এসেছিল। কিন্তু দাম এত কম বলল, বিক্রির উৎসাহ জাগে না। তা ছাড়া বেচতে আমি চাইও না।'
'কে কিনতে চায়?'
'টপ হিগিনস নামে এক লোক। জমির দালালি করে। ওর কোম্পানির নাম হিগিনস রিয়্যাল-এস্টেট। এই তো ব্লক দুয়েক দূরে অফিস।'

রাস্তায় এত লোকের ভিড়, কিন্তু ক্লাবে কেউ নেই বললেই চলে।

শূন্য চেয়ার-টেবিলগুলোর দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠলেন ওয়াকার, 'অন্যান্য বছর ভিড়ের ঠেলায় দম ফেলতে পারতাম না। এবার লোকই ঢুকছে না। লোকে নিশ্চয় জেনে ফেলেছে খবরটা। ভুডুওয়ালারা আমার সর্বনাশ করে ছাড়ল।'

'তাই তো করতে চাইছে ওরা,' জবাব দিল কিশোর।

'কিন্তু কেন?'

জবাব জানা নেই গোয়েন্দাদের।

'এক কাজ করলেই পারেন,' মুসা বলল। 'পুলিশকে বলুন, শয়তানগুলোকে হাজতে পুরে দিক।'

'পাব কোথায় ওদের? কাকে ধরতে বলব? প্রমাণ কোথায়?'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

ওয়াকার বললেন, 'এই অবস্থা চলতে থাকলে ক্লাব বিক্রি করে দিতে বাধ্য হব আমি।'

'এত অধৈর্য হবেন না,' কিশোর বলল। 'তদন্ত এখনও শেষ হয়নি আমাদের। আগে হোক। আমরা কিছু করতে না পারলে তখন বিক্রির কথা ভাববেন। টপ হিগিনসের সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

অনেক বড় বাড়ির পেছনের দিকে একটা ছোট ঘরে হিগিনসের অফিস। ছোটখাট মানুষ, চোখে কালো কাঁচের চশমা। হালকা রঙের স্যুটটা গায়ে লাগেনি ঠিকমত, ঢলঢলে হয়ে আছে। ইস্ত্রিও করা হয়নি অনেক দিন।

খাঁটি ব্যবসায়ী হাসি দিয়ে ছেলেদের জিজ্ঞেস করল সে, 'কি সাহায্য করতে পারি?'

'আমরা বংশীবাদক জনি ওয়াকারের বন্ধু,' ডেস্কে হাত রেখে সামনে ঝুঁকে বলল কিশোর। 'শুনলাম তাঁর ক্লাবটা কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন। দাম অনেক কম। এই দামে তিনি বেচবেন এই ধারণা কি করে হলো আপনার?'

'ইয়ে...' কয়েক সেকেন্ড জবাব দিতে পারল না দালাল। 'শুনলাম তার ক্লাবে ঝামেলা হচ্ছে, ব্যবসা ভাল না। এ সব অবস্থায় সাধারণত বেচে দিয়ে কেটে পড়তে চায় লোকে। মনে হলো তাকে প্রস্তাবটা দেয়া যায়।'

'তার মানে ভুডুওয়ালাদের কথা জানেন আপনি?' রবিনের প্রশ্ন।

সতর্ক হলো লোকটা। 'হ্যাঁ, জানি। কি বলতে চাও তোমরা?'

কিশোরের মতই মুসাও সামনে ঝুঁকল, 'বলতে চাই, এতে আপনার কোন হাত নেই তো? ভুডুওয়ালাদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে ব্যবসা নষ্ট করে ক্লাবটা হয়তো পানির দামে কেনার ইচ্ছে হয়েছে আপনার। ভুল বললাম?'

নড়েচড়ে বসল হিগিনস। হাসল। প্রাণ নেই হাসিতে। 'কি যে বলো। আমি করতে যাব কেন এ সব? তবে একটা কথা ঠিক, গোলমালের খবর রাখি আমি। কেউ বিপদে পড়লে যতটা সম্ভব কম দামে তার কাছ থেকে জায়গা কেনার চেষ্টা করি। এটাকে খারাপ কিছু বলতে পারবে না। এটাই আমার ব্যবসা। তো, কিছু মনে না করলে আমাকে মাপ করতে হবে। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

কিছু একটা লুকাতে চাইছে হিগিনস, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না গোয়েন্দাদের। অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

'আমি শিওর,' বাইরে বেরিয়েই বলে উঠল মুসা, 'ভুডুওয়ালাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে লোকটা।'

'কিন্তু সেটা প্রমাণ করা যাবে না,' রবিন বলল।

'নজর রাখতে হবে ওর ওপর,' বলল কিশোর।

ক্লাবে ফেরার পথে ওরা দেখল ভিড় আরও বাড়ছে। নানা রকম বিচিত্র পোশাক পরে রাস্তায় নেমেছে লোকে।

'বাপরে বাপ, কি ভিড়!' কোনমতে এগোতে এগোতে বলল মুসা।

'হবেই,' কিশোর বলল। 'আগামীকাল মারদি গ্রাস। ওরা বলে ফ্যাট টিউসডে। সারাদিন সারারাত ধরে ভিড় থাকবে রাস্তায়, প্যারেড চলবে।'

একটা দৃশ্য দেখতে দেখতে পেছনে ফিরেছিল রবিন, হঠাৎ কিশোরের হাত খামচে ধরল। 'আমাদের পিছু নিয়েছে মনে হচ্ছে!'

অনুসরণকারীর সন্দেহ যাতে না জাগে এমন ভঙ্গিতে আস্তে করে ফিরে তাকাল কিশোর। বিশ ফুট দূরে অদ্ভুত পোশাক পরা একজন লোক ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল।

'ঠিকই বলেছ,' নিচু স্বরে বলল কিশোর। 'আমাদের পিছে লেগেছে ব্যাটা।'

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দা। চট করে একবার ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, লোকটাও গতি বাড়িয়েছে।

একটা মোড়ের কাছে এসে প্রায় দৌড়াতে শুরু করল ওরা। দেখল, লোকটাও দৌড়াচ্ছে। আর কোনই সন্দেহ রইল না, ওদের পিছুই নিয়েছে। তাকে খসানোর জন্যে রাস্তার মাঝখানে প্যারেডের ভিড়ে ঢুকে পড়ল ওরা। কিছুদূর এগোনোর পর আর দেখা গেল না লোকটাকে।

ক্লাবে ফিরে ওয়াকারকে পেল না ওরা। নিজেদের ঘরে চলে এল।

কিশোর বলল, 'মিস্টার সাইমনকে ফোন করা দরকার। দেখি, কিছু জানতে পারলেন কিনা?'

জরুরী তথ্য পাওয়া গেল তাঁর কাছে। বুড়ো ডনিগানকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে পুলিশ। অনুমতি নিয়ে মারদি গ্রাসে যোগ দেয়ার জন্যে নিউ অরলীনসে রওনা হয়েছে সে। রেকর্ড চেক করে হোভার ম্যানিলার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায়নি। আর দশজন সাধারণ পাইলটের মতই পাইলট সে। ভাড়ায় যাত্রী বহন করে।

এদিককার খবর সাইমনকে জানিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর। যা যা জেনেছে বন্ধুদের জানাল।

ডনিগানের নিউ অরলীনসে আসার সংবাদটা বিস্মিত করেছে ওদের। সেটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

তেরো

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার বেরোল ওরা। ওয়াকার তখনও ফেরেননি। কোথায় গেছে বলতে পারল না ক্লাবের দারোয়ান।

চিন্তিত হলো কিশোর। বলল, 'ফিরে এসে না দেখলে পুলিশকে জানাতে হবে। ভুডুওয়ালারা ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে পারে।'

'এমনই পরিস্থিতি এখন শহরের,' মুসা বলল, 'কেউ কাউকে খুন করে ফেললেও কারও চোখে পড়বে না!'

শহরের জমিজমা তদারকীর ভার যে সরকারী দপ্তরগুলোর ওপর, সেগুলোতে খোঁজখবর নিতে লাগল ওরা। ফাইলে দেখা গেল, নিউ অরলীনসের বেশ কয়েকটা জ্যাজ ক্লাব ইতিমধ্যেই কিনে নিয়েছে হিগিনস। ক্লাব বন্ধ করে দিয়ে সে-সব জায়গায় অন্য ব্যবসা ফেঁদেছে। আরও একটা মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল, মিউজিক হেভেনের দু-জন মালিকের একজন তো নিকোলাস বাজোরা, অন্যজন দালাল টপ হিগিনস।

'এইবার বুঝতে পারছি ঘটনাটা,' রবিন বলল। 'বাজোরা আর হিগিনস একসঙ্গে কাজ করছে। ভয় দেখিয়ে ক্লাবগুলোর ব্যবসা বন্ধ করে নামমাত্র মূল্যে কিনে নিচ্ছে ওগুলো। তাতে দুটো লাভ। এক, জায়গা দখল; দুই, ক্লাব ব্যবসায় প্রতিযোগিতা কমিয়ে ফেলা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ভুডুর একটা দল আছে বাজোরার। ওদেরকে দিয়ে গুণ্ডামি-পাণ্ডামি আর যত অপকর্ম করায় সে।'

'সুতরাং মিউজিক হেভেনে গিয়ে এখন হানা দিতে হবে আমাদের,' মুসা বলল

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'আগে ক্লাবে ফিরে যাব। দেখি, ওয়াকার ফিরলেন কিনা।'

সাবধানে রাস্তা দিয়ে এগোল ওরা। কেউ অনুসরণ করে কিনা সে-ব্যাপারে সতর্ক। ক্লাবের কাছাকাছি চলে এসেছে এই সময় একটা বিল্ডিঙের কোণ থেকে বেরোল একটা ভূতুড়ে মূর্তি।

'খাইছে! ভূত!' বলে চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

সাদা চাদরে ঢাকা মূর্তিটার চোখের কাছে গোল গোল দুটো ফুটো। এগিয়ে আসছে। ভূতের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে তৈরি হলো তিনজনে।

এই সময় মানুষের গলায় কথা বলে উঠল চাদরে ঢাকা মূর্তিটা, 'চমকে গেছ, না? আমি, ওয়াকার।'

হাঁপ ছাড়ল তিন গোয়েন্দা।

'আপনি, এ ভাবে...' বলতে গিয়ে বাধা পেল রবিন।

হাত তুলে ওকে কথা বলতে নিষেধ করলেন বংশীবাদক। তাঁকে অনুসরণ

করতে ইশারা করলেন।

পিছনে পিছনে রওনা হলো বিস্মিত গোয়েন্দারা। একটা গলি পেরিয়ে এসে ঢুকল ফলের বাজারে। এখানেও লোকের ভিড়। মাথার ওপর থেকে চাদর সরালেন ওয়াকার। হেসে বললেন মুসাকে, 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে!'

'ভূতকে ও সাংঘাতিক ভয় পায়,' বলল রবিন। 'ঘটনাটা কি বলুন তো?'

'আজ ক্লাবে এসেছিল বাজোরা আর তার দল। তোমরা তখন বাইরে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। ভয় পেয়ে গেলাম। তোমাদের ক্ষতি না করে বসে। আমি বললাম, নেই। আমার কথা বিশ্বাস করল না। ওপরে উঠে তোমাদের ঘরেও দেখে এল। তারপর ওদেরই আরও একজন ক্লাবে ঢুকল। বলল, রাস্তায় দেখে এসেছে তোমাদের। তখন চলে গেল বাজোরা।'

'কিন্তু আপনি চাদরে ঢাকা কেন?'

'ক্লাবে এখন তোমাদের জন্যে ওত পেতে বসে আছে বাজোরা। আবার এসেছে। পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। তোমাদের জন্যে বসে আছি। এলেই যাতে সময় মত সরিয়ে নিতে পারি। চাদরে ঢেকে না থাকলে চিনে ফেলত আমাকে।'

'কি করব তাহলে আমরা এখন?' মুসার প্রশ্ন। 'বাইরে বাইরে থাকব? ওরা কতক্ষণ বসে থাকবে কে জানে!'

'বাজোরা নেই,' কিশোর বলল, 'মিউজিক হেভেনে যাওয়ার এটাই চমৎকার সুযোগ। ওরা আমাদের জন্যে বসে থাকুক, এই সুযোগে তার জায়গাটায় গিয়ে একবার ঢুঁ মেরে আসি আমরা।'

ফলের বাতিল বস্তার অভাব নেই। ওগুলো দিয়ে অদ্ভুত তিনটে পোশাক বানিয়ে নিল তিন গোয়েন্দা। তার আড়ালে ঢেকে নিল নিজেদের। মারদি গ্রাসের সময় এই এক সুবিধে, কে কি পরল না পরল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না লোকে। সহজেই রাস্তা পার হয়ে এসে ওয়াকারের গাড়িতে উঠল। তাঁর ক্লাব এখান থেকে চার ব্লক দূরে।

একটা শপিংমলের একপ্রান্তে একটা কাঠের বাড়িতে মিউজিক হেভেন। ওরা পৌছতে পৌছতে অন্ধকার হয়ে গেল। মিউজিক শুরু হতে দেরি আছে এখনও।

'এই ছালা পরেই ভেতরে ঢুকব নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়লেন ওয়াকার। 'দরকার নেই আর। এখানে ছদ্মবেশ লাগবে না। ভেতরে অন্ধকার। কোণের দিকে বসব।'

ক্লাবে ঢুকল ওরা। খাবারের অর্ডার দিলেন ওয়াকার।

খিদে ভালই পেয়েছে। কয়েক মিনিট চুপচাপ খাওয়ার পর কিশোর বলল, 'বাজোরার কথা বলুন।'

'ওই তো,' ওয়াকার বললেন, 'অনেক আগে আমি আর ও বন্ধু ছিলাম। যেখানেই বাজনা বাজাতে যেতাম, একসঙ্গে। দু-জনেরই একটা উদ্দেশ্য থাকত, আসর জমজমাট করে তোলা।'

'জেলে গেল কেন?'

'ঠিক জানি না। চুরির দায়ে হতে পারে। খারাপ লোকের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ

করল। ফেরানোর চেষ্টা করে করে হাল ছেড়ে দিলাম আমরা। তারপর ওকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলাম।'

'এখন মনে হচ্ছে ভালই আছে,' ক্লাবের দামী সাজসজ্জা দেখিয়ে বলল মুসা।

নাক দিয়ে একটা শব্দ করলেন ওয়াকার। 'শহরের অন্য ক্লাবগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে খারাপ ছিল। লোকে জায়গা না পেয়ে এখন এখানেই আসে।'

'বাজোরা কি এখনও ব্যান্ডে বাজায়?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বাজায়, নেতৃত্ব দেয়, ক্লাবের আয়ের একটা মোটা কমিশন বাগিয়ে নেয়। এই ব্যবসায় সবাইকে টেক্কা দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। সেটাই হতে যাচ্ছে।'

খাবারে ভীষণ ঝাল। সোডা দিয়ে সেটা মুখ থেকে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করল কিশোর। 'সে আর হিগিনসের মধ্যে নিশ্চয় একটা চুক্তি হয়েছে—সে ভয় দেখিয়ে ক্লাবগুলোকে বন্ধ করবে, হিগিনস তখন অল্প পয়সায় কিনে নেবে...'

সামনের দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল রবিন, 'ওই যে, এসে গেছে!'

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল চারজনেই। ভেতরে ঢুকল নিকোলাস বাজোরা। স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল। তার পেছনে হুড়মুড় করে লোক ঢুকতে শুরু করল। দেখতে দেখতে ভরে গেল ক্লাবটা। সামান্য আলো যা ছিল, সব নিভে গিয়ে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল স্টেজে। স্পটলাইট পড়ল বাজোরার ওপর। সে আর তার দল বাজনা বাজাতে শুরু করল।

আবার সফট ড্রিংকের অর্ডার দিলেন ওয়াকার। সামনের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। লোক ঢোকার বিরাম নেই।

'হিগিনস!' ফিসফিস করে হঠাৎ বলে উঠল সে।

অন্য তিনজোড়া চোখ ঘুরে গেল দালালের দিকে।

স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। কয়েকটা টেবিল আলাদা করে রাখা হয়েছে। তারই একটাতে বসল। বাজনা শুরু হলো। গান ধরল বাজোরা।

'গায় কিন্তু ভাল,' রবিন বলল। ওয়াকারের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কি গান? শুনিনি তো কখনও।'

'চল্লিশ বছর আগে ওই গান আমিই লিখেছি,' গর্বের সঙ্গে বললেন ওয়াকার। 'উত্তরে তুমি এটা তেমন শুনতে পাবে না। তবে এই অঞ্চলে মাঝে মাঝেই গাওয়া হয় এটা। আমার জন্মস্থান মিসিসিপি ডেলটাকে নিয়ে লেখা এই গান।'

'সত্যি ভাল,' তালে তালে পা ঠুকতে লাগল মুসা।

বাজোরার পরনে ডিনার জ্যাকেট, চোখে কালো চশমা, হাতে মাইক্রোফোন। চিৎকার করে গাইছে সে।

রেগে গেলেন ওয়াকার, 'আরি, ব্যাটা ভুল গাইছে! আমি তো এ রকম লিখিনি! বানিয়ে নিয়েছে!'

'হয়তো ভুলে গেছে,' ওয়াকারকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর।

'অসম্ভব! হাজার বার আমার সঙ্গে গেয়েছে সে। ভুলতেই পারে না! ইচ্ছে করে অন্য কথা বলছে!'

গানের শেষ পর্যায়ে এতটাই উত্তেজিত হয়ে গেলেন ওয়াকার, চিৎকার করে

উঠতে যাচ্ছিলেন বাজোরার উদ্দেশ্যে। তাঁকে থামাতে বেগ পেতে হলো গোয়েন্দাদের।

গান শেষ হলো। অন্য গান ধরল গায়করা। বাজোরা চুপ হয়ে গেছে। হিগিনস উঠে বেরিয়ে গেল। যেন ওই একটা গান শোনার জন্যেই এসেছিল সে।

'পিছু নেব নাকি?' মুসার প্রশ্ন। 'এই কিশোর?'

ভাবনায় ডুবে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান। মুসার কথার জবাব দিল না। খানিক পর ওয়াকারকে জিজ্ঞেস করল, 'কথার কি কি পরিবর্তন করা হয়েছে?'

'সব নয়, মাত্র কয়েকটা লাইন।'

'সেগুলোই বলুন।'

'আমি লিখেছি:

লর্ড, টেক মি হোয়্যার দা লিভিং'স ফ্রী
ডাউন বাই দা রিভার দ্যাট রানস টু দা সী
হোয়্যার দা ওয়াটার'স ক্লিয়ার অ্যাজ দা ডিপ ব্লু স্কাই
অ্যান্ড আই উইল বি গোইং বাই অ্যান্ড বাই।

কিন্তু সে বলছে:

লর্ড, টেক মি হোয়্যার দা লিভিং'স ফ্রী
ডাউন বাই দা রিভার অ্যাট ওল্ড বেলি লী
গোল্ড অ্যান্ড সিলভার উইল বি ওয়েইটিং দেয়ার
ইন আ সানলিট রুম আপ অ্যা উইনডিং স্টেয়ার।'

আঙুল দিয়ে চুটকি বাজাল কিশোর, 'শিওর, হিগিনসের জন্যে এটা একটা মেসেজ!'

'মেসেজ!' বুঝতে পারল না মুসা।

'হ্যাঁ! এটাতেই লুকিয়ে আছে রহস্যের চাবিকাঠি!'

চোদ্দ

'হিগিনসকে এ ভাবে মেসেজ দিতে যাবে কেন বাজোরা?' যুক্তি দেখাল রবিন। 'ওরা পার্টনার, যে কোন সময় নিরালায় বসে কথা বলতে পারে।'

রবিনের সঙ্গে একমত হলো মুসা, 'তাই তো।'

কিশোর বলল, 'তাহলে মেসেজটা অন্য কারও উদ্দেশ্যে দিয়েছে, যার সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলার সুযোগ নেই বাজোরার। এই ভিড়ের মধ্যেই রয়েছে সেই লোক।'

'হ্যাঁ, এটা হতে পারে,' রবিন বলল।

এখানে আর কাজ নেই। খাবারের দাম চুকিয়ে দিলেন ওয়াকার। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বেরোলেন।

নিজের ক্লাবে পৌঁছে আগে নিশ্চিত হয়ে নিলেন ভুডুওয়ালাদের কেউ আছে

কিনা। নেই দেখে গাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এলেন গোয়েন্দাদের।

নিজের ঘরে চলে এল ওরা।

বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে মুসা বলল, 'ঘুমানোর এখনও অনেক দেরি। চলো বরং প্যারেড দেখে আসি।'

'ভাল কথা বলেছ,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল রবিন। 'তাতে পেটও খালি হবে। কিশোর, কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

নিচে নেমে দেখল ওরা, টেবিলে বসে কাজ করছেন ওয়াকার। ওরা প্যারেড দেখতে যাচ্ছে শুনে তিনটে মুখোশ বের করে দিয়ে বললেন, 'এগুলো পরে নাও। প্যারেডে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে হয়। এগুলো পরা থাকলে আরও একটা সুবিধে হবে, কেউ চিনতে পারবে না।'

তুঙ্গে উঠেছে উৎসব। বাজি পোড়ানো হচ্ছে। রাস্তায় ট্যুরিস্টের ভিড়। দেখেই বোঝা যায় বাইরে থেকে এসেছে। স্থানীয়দের সঙ্গে আলাদা করে চিনতে অসুবিধে হয় না।

অনেক বাজিয়ে দল অংশ নিয়েছে প্যারেডে। বাজনা বাজাতে বাজাতে চলেছে তারা। সামনে পেছনে তালে তালে নেচে গেয়ে এগোচ্ছে অনেকে। ঝলমলে রঙ আর রঙিন বাতিতে সজ্জিত অসংখ্য ফ্লোট যেন ভেসে চলেছে মানুষের মাথার ওপর দিয়ে। আসলে ওগুলো গাড়ি, কাঠবোর্ড দিয়ে ঢেকে তৈরি করা হয়েছে নানা জীবের প্রতিকৃতি। শুধু জীব নয়, জড় জিনিসের প্রতিকৃতিও আছে। এই যেমন বিশাল চেয়ার, আদিম ঘোড়ার গাড়ি, ইত্যাদি।

'দেখার মত জিনিস!' হাসতে হাসতে ভিড় ঠেলে এগোল মুসা।

'বাজিগুলো দেখো!' আকাশের দিকে হাত তুলল রবিন। 'ওগুলো আরও ভাল।'

আকাশে উঠে ফাটছে বাজি। রঙিন ফুলঝুরি তৈরি করে ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে। কোন কোনটা বিকট শব্দ করে ফাটছে। একটা বাজি অনেক ওপরে উঠে ফেটে গিয়ে গরুর গাড়ির চাকার রূপ নিয়ে ভাসতে থাকল। আরেকটা তৈরি করে ফেলল রঙিন ফোয়ারা। দেখে মনে হচ্ছে পদ্মফুলের ভেতর থেকে পানি উপচে পড়ছে।

মুগ্ধ হয়ে দেখছে মুসা আর রবিন। কানের কাছে কিশোরের কথা শোনা গেল, 'অ্যাই, শুনছ!'

দুই সহকারী গোয়েন্দাও কান পাতল। ওরাও শুনতে পেল। বেশ দূরে রয়েছে এখনও। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে ছন্দে ছন্দে সুর করে চিৎকার করছে একদল লোক: হিয়ার কামস দা কিং! হিয়ার কামস দা কিং!

বাজি দেখা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেদিকে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

'ভুডু কিং সেজে নিশ্চয় বাজোরা আসছে ফ্লোটে চড়ে,' রবিন বলল।

'না, ক্লাব থেকে বেরিয়ে এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না সে,' বলল কিশোর।

'কিন্তু কিং আর কে হবে?'

আরেকটু এগিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'খাইছে!'
বিড়বিড় করল কিশোর, 'কিং জর্জ!'
হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিনজনে।
পথের মোড় ঘুরে বেরিয়ে এসেছে একটা ফ্লোট। বিশাল সিংহাসনে বসে আছে একজন মানুষ। পাউডার দিয়ে সাদা করা পরচুলা মাথায়, লাল কোট, মুখে এক চিলতে একটা মুখোশ— তাতে সারা মুখ ঢাকা পরে না, কেবল চোখ, কপাল আর নাকের খানিকটা বাদে। সিংহাসনের ওপর থেকে ভারিক্কি ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে পথের মানুষের দিকে, যেন সব তার প্রজা। ফ্লোটের চারপাশে তার দলের লোকেরা চিৎকার করছে: হিয়ার কামস দা কিং!
কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কিং জর্জ বুঝলে কি করে?'
'দেখছ না ফ্লোটের গায়ে লেখা আছে।'
মানুষটার দিকে তাকিয়ে ছিল মুসা, তাই লেখাটা দেখতে পায়নি। এখন দেখল চকচকে সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে:

KING GEORGE III
OF ENGLAND.

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'ডনিগান তাহলে মিথ্যে বলেনি। মারদি গ্রাস প্যারেডে অংশ নিতে এসেছে রাজা তৃতীয় জর্জ!'
'এ তো সাজানো লোক,' মুসা বলল। 'আসল রাজা নন।'
'হয়তো এই রাজার কথাই বলেছে ডনিগান,' রবিন বলল। 'নিজেই হয়তো রাজা সেজে এখন বসে আছে সিংহাসনে।'
'কি করে জানব ডনিগানই বসে আছে?' প্রশ্নটা নিজেকেই যেন করল কিশোর। এগিয়ে গেল সে।
ফ্লোটের কাছে 'হিয়ার কামস দা কিংস!' বলে চিৎকার করছে দু-জন লোক। একজনের পরনে 'আংকেল স্যামের' পোশাক। রাজার ব্যাপারে তার কাছে জানতে চাইল কিশোর।
কোলাহল ছাপিয়ে চিৎকার করে জবাব দিল লোকটা, 'প্রতি বছর জলাভূমি থেকে উঠে আসেন রাজা জর্জ, মারদি গ্রাসে যোগ দেয়ার জন্যে। গত পাঁচ বছর ধরেই আসছেন। কোনবার ব্যতিক্রম হয় না।'
'উৎসবটা তাঁর খুব পছন্দ হচ্ছে?'
কিন্তু এ ধরনের আলাপে বোধহয় মজা পেল না আংকেল স্যাম। কিশোরের প্রতি আগ্রহ হারাল। চিৎকার করতে করতে এগিয়ে গেল ফ্লোটের সঙ্গে।
'অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করা দরকার,' রবিন বলল।
স্থানীয় লোকদের প্রশ্ন শুরু করল ওরা। কয়েক মিনিট পরই বুঝে গেল, রাজা সেজেছে কে, জানে না কেউ।
রবিন বলল তখন, 'চলো ফ্লোটের সঙ্গে সঙ্গে যাই। প্যারেডের শেষ মাথায় থেমে যখন নামবে, তখন দেখার চেষ্টা করব লোকটা কে।'
ভাল বুদ্ধি। কিন্তু অসুবিধে হয়ে গেল। প্রশ্ন করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছে ওরা। আবার ভিড় ঠেলে ফ্লোটের কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। প্যারেডের শেষ

মাথায় যখন পৌঁছল, ফ্লোট থেকে নেমে চলে গেছে ততক্ষণে রাজা জর্জ। কোথাও দেখা গেল না তাকে।

'ধূর, গেল!' বিরক্ত হয়ে ঘামে ভেজা কপাল ডলল মুসা।

'কোন সরকারী কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যেতে পারে,' হাল ছাড়তে রাজি নয় কিশোর।

প্যারেডের শেষ মাথায় ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন লোককে দেখা গেল। একে ওকে আদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে ওরা। সেদিকে এগোল তিন গোয়েন্দা।

একজনের ঠোঁটে একটা ইয়াবড় সিগার লটকে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আচ্ছা, এই কিং জর্জ লোকটা কে বলতে পারেন?'

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল লোকটা। মাথা নাড়ল, 'না।'

'কে বলতে পারবে, জানেন?'

'হয়তো পার্ক সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের লোকে। কিন্তু এখন তো তাদের কাউকে পাবে না। অফিস বন্ধ।'

হতাশ হয়ে সরে এল কিশোর।

আপাতত আর কিছু করার নেই। প্যারেডও দেখা হয়েছে। ক্লাবে ফিরে চলল ওরা।

তখনও খাতাপত্র নিয়ে কাজ করছেন ওয়াকার। মুখ তুলে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্যারেড দেখা হয়েছে?'

কিং জর্জের কথা তাঁকেও জিজ্ঞেস করল কিশোর।

তিনি বললেন, 'মারদি গ্রাসের সময় কত লোক কত কি সাজে। ও নিয়ে কে মাথা ঘামায়।'

ঘরে ফিরে এল গোয়েন্দারা।

নতুন কোন তথ্য জানতে পেরেছেন কিনা জানার জন্যে রকি বীচে সাইমনকে ফোন করল কিশোর। তিনি জানালেন, 'একটা মূল্যবান তথ্য জানতে পেরেছি। শুনলে চমকে যাবে। হোভার ম্যানিলার যাত্রী কে ছিল জানো? জন হেমিংওয়ে পাওয়ারস, আর্ট গ্যালারির মালিক, আমাদের মক্কেল।'

'বলেন কি! সত্যি?'

'বললাম না চমকে যাবে।'

কথা শেষ করে লাইন কেটে দিল কিশোর। দুই বন্ধুকে জানাল খবরটা। কিশোরের মতই চমকে গেল ওরা।

রবিন প্রশ্ন তুলল, 'চোরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হবে কি করে?'

'হতে পারে কাকতালীয় ঘটনা। হোভার ম্যানিলার প্লেনটাই শুধু ভাড়া করেছেন, কোন কিছুতে হাত নেই তাঁর, কিছু জানেন না। কিংবা হয়তো ম্যানিলা তাঁকে আগে থেকেই চেনে। জানে, একটা আর্ট গ্যালারির মালিক তিনি। কোন এক সুযোগে গিয়ে চুরি করেছে সে।'

মাথা নাড়ল রবিন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'আমিও না,' বলল কিশোর।

'তাহলে বললে কেন?'

'কিছু একটা বলা দরকার, তাই।'

মুসা বলল, 'ভূতের পক্ষেই কেবল এ রকম ঘটনা ঘটানো সম্ভব! কিশোর, কিং জর্জ সত্যি সত্যি মানুষ তো? আমার মনে হয় অনেক পুরানো প্রেতাত্মা। সমস্ত শয়তানীর মূলে রয়েছে সে!'

পনেরো

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে বাজোরার মেসেজ নিয়ে আলোচনা করতে লাগল গোয়েন্দারা। ওয়াকারও বসেছেন ওদের সঙ্গে।

মেসেজটার মানে করতে লাগল কিশোর, '*ডাউন বাই দা রিভার অ্যাট ওল্ড বেলি লী।* মানে সহজ। কোন একটা নদী ধরে ভাটির দিকে যেতে হবে। তার পাড়েই হয়তো পাওয়া যাবে পুরানো বেলি লী। *গোল্ড অ্যান্ড সিলভার উইল বি ওয়েইটিং দেয়ার।* অর্থাৎ, সোনা আর রূপার ছড়াছড়ি ওখানে। *ইন আ সানলিট রুম আপ অ্যা উইনডিং স্টেয়ার।* ঘোরানো কোন সিঁড়ির ওপরে রৌদ্রালোকিত কোন ঘরে।' সবার মুখের দিকে একবার করে তাকাল সে। তারপর বলল, 'একটা জায়গা এখন বের করতে পারলেই বাকি কাজ সহজ হয়ে যায়। কোন নদীর কথা বলেছে সে, যেটা ধরে এগোলে পাওয়া যাবে পুরানো বেলি লী?'

চিন্তা করছেন ওয়াকার। কিছুক্ষণ পর উজ্জ্বল হলো তাঁর চেহারা। টেবিলে চাপড় দিয়ে বললেন, 'বুঝেছি! নদী একটা আছে। শহর থেকে বেরোলেই পাবে। ওটা ধরে কয়েক মাইল এগোলে পড়ে গামবো ডিনার। তার আধ মাইল পর থেকে শুরু হয়েছে একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, অনেক পুরানো। বড় বড় কোটিপতিরাই কেবল বাস করতে পারে ওখানে। কয়েক একর জায়গা জুড়ে একেকটা বাড়ির চৌহদ্দি। আমার খুব পছন্দ। খুব আশা ছিল, ওখানে একটা বাড়ি কিনে বাস করব। কিন্তু জানি, সেটা সম্ভব হবে না কোনদিন।'

'তা তো বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু এর সঙ্গে বেলি লীর সম্পর্ক কি?'

'বেলি লী ওখানে একটা বাড়ির নাম।'

চিবানো বন্ধ হয়ে গেল কিশোরের। পুরো দশ সেকেন্ড তাকিয়ে রইল ওয়াকারের মুখের দিকে। তারপর আবার সচল হলো তার চোয়াল। বলল, 'এখনই ওখানে রওনা হব আমরা। আপনি যাবেন?'

মাথা নাড়লেন ওয়াকার। 'না, আমার জরুরী কাজ আছে।'

'তাহলে নকশা এঁকে দেখিয়ে দিন, কি ভাবে যেতে হবে।'

নকশা দেখে বাড়িটা খুঁজে বের করতে মোটেও বেগ পেতে হলো না গোয়েন্দাদের। ওয়াকার তাঁর গাড়িটা ছেলেদের দিয়েছেন ব্যবহার করার জন্যে।

এলাকাটাকে মোটেও রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া বলে মনে হয় না। বরং জঙ্গল। অনেক গাছপালার মধ্যে একেকটা বাড়ি চোখে পড়ে কি পড়ে না।

মস্ত এক লোহার গেট দেখে মুসাকে গাড়ি থামাতে বলল রবিন। গেটের পাশে

পাথরের দেয়ালে পিতলের ফলকে লেখা রয়েছে: বেলি লী।

গাড়ি থামল। পেছনে তাকিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি করব?'

'ভেতরে ঢুকব,' জবাব দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল কিশোর। গেটটা খোলা কিনা দেখার জন্যে। খোলাই আছে। পাল্লা ঠেলে ফাঁক করে দিয়ে মুসাকে গাড়ি নিয়ে আসতে ইশারা করল সে।

প্রায় আধমাইল লম্বা ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে বিশাল এক অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ি। নেমে সদর দরজায় দিকে এগোল কিশোর।

ঘণ্টা বাজানোর আগেই খুলে গেল দরজা। দেখা দিল এক লোক। শরীরটা রোগাটে, কিন্তু চোয়াল বসা নয়, বরং গোল। লম্বা একটা কাঠির মাথায় যেন একটা বল বসানো। কিশোরকে দেখে কুঁচকে ফেলল ভুরু। 'কি চাই?'

'দেখুন, আমরা বেড়াতে এসেছি। এত্তবড় বাড়ি দেখে কৌতূহল হলো। দেখতে ঢুকলাম। এত সুন্দর জায়গা আর দেখিনি। একটু ঘুরে দেখতে পারি?'

'না।'

কিশোরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন। 'অনেক লোকজন আছে মনে হচ্ছে ভেতরে? পার্টি হবে নাকি?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। 'দেখো, ফালতু কথা বলার সময় নেই আমার। যাও এখন।'

এই সময় পাল্লা ঠেলে উঁকি দিল আরেকজন লোক। 'ঝাড়বাতিটা কোন ঘরে লাগাব, মিস্টার ম্যানিলা?'

'বলরুমে,' জবাব দিল কাঠি।

রবিন আর কিশোরের বুঝতে অসুবিধে হলো না, এই লোকই হোভার ম্যানিলা, নীল সেসনার পাইলট। কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল রবিন, চোখ টিপে তাকে কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর।

আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল ওরা দু-জন।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভওয়ে ধরে ফেরার পথে উত্তেজিত স্বরে বলল রবিন, 'এই লোকই হোভার ম্যানিলা! যাক, পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। কিছু জিজ্ঞেস করতে মানা করলে কেন?'

'রহস্যের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি,' কিশোর বলল। 'লোকটার সন্দেহ জাগিয়ে দিয়ে সব মাটি করতে চাইনি।'

'কি করব এখন?' জানতে চাইল মুসা।

'তিনটে পোশাক জোগাড় করব। রাতে এসে যোগ দেব পার্টিতে।'

কিশোর কি বলতে চায় বুঝে ফেলল রবিন, 'তোমার ধারণা আজ রাতে এখানে পার্টি দেবে রাজা জর্জ?'

'হ্যাঁ।'

'ডনিগান তাহলে ঠিকই বলেছে!' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল মুসা। 'রাজা জর্জ একজন সত্যি আছে।'

'আসল রাজা তো নয়, রাজা সেজে থাকে। আমার বিশ্বাস, এই লোকই

ম্যানিলার প্যাসেঞ্জার।'

'তারমানে সে ডনিগান নয়। কারণ প্লেনটা যখন ছেড়ে এসেছে বুড়ো তখন সোয়াম্প ক্রীকের হাজতে বন্দি।'

'আরও একটা ব্যাপার এখন পরিষ্কার—বাজোরা আর তার ভুডু দলের সঙ্গে এই রাজার সম্পর্ক আছে,' কিশোর বলল।

শহরে ঢুকে থানায় রওনা হলো ওরা। চীফ হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করল। তার সন্দেহের কথা জানাল কিশোর। তারপর অনুরোধ করল, 'আমাদের কাছ থেকে কোন খবর না পাওয়া পর্যন্ত দয়া করে যাবেন না, স্যার।'

কিন্তু মানতে চাইলেন না চীফ। তখনই যেতে চান। আর মারাত্মক বিপদ হতে পারে ভেবে কিশোরদেরও যেতে দিতে নারাজ।

বেশ কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর বললেন, 'ঠিক আছে, সকাল পর্যন্ত দেখব। এর মধ্যে যদি খবর না দাও, সোজা গিয়ে হাজির হব।'

থানা থেকে বেরিয়ে ওয়াকারের ক্লাবে ফিরে এল ওরা। সব কথা তাঁকে জানাল। ছদ্মবেশে পার্টিতে যাওয়ার জন্যে তিনটে বিশেষ পোশাক চাইল কিশোর।

বের করে দিলেন ওয়াকার।

আরব শেখের ছদ্মবেশ নিল মুসা। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে আমাকে?'

'কেমন আর,' কিশোরও হাসল। 'পাক্কা বেদুইন ডাকাত।'

'তাহলে তো ভালই হয়েছে বলতে হবে।'

তিনজন তিন রকম ছদ্মবেশ নিল। পরচুলা পরল। কালো মুখোশ পরল—প্যারেডের সময় কিং জর্জ যেমন পরেছিল অনেকটা সে-রকম।

'দারুণ হয়েছে!' কিশোর আর রবিনের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল মুসা।

ডিনার খেতে বসে প্ল্যান করতে লাগল ওরা, কি করে সবার চোখ এড়িয়ে বাড়িটাতে ঢুকবে। সময় নিয়ে খাওয়া শেষ করল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'সময় হয়েছে। চলো, যাই।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত দেখে নিল ওরা, ছদ্মবেশে কোথাও কোন খুঁত আছে কিনা। তারপর বেরোল। ওয়াকারের গাড়িতে করেই এসে পৌঁছল বেলি লী-তে। বাড়ির কাছ থেকে দূরে রাস্তার পাশে গাড়ি রাখল মুসা। নামল তিনজনে। গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে।

বিচিত্র পোশাক পরা মানুষে গমগম করছে বাড়ি। প্রাসাদের বাইরের আঙিনাতেও ঘোরাঘুরি করছে অনেকে। পেছনের দরজা দিয়ে মেহমানদের ঢুকতে-বেরোতে দেখল গোয়েন্দারা।

'চলো, ওদিক দিয়েই ঢুকি,' রবিন বলল।

'দাঁড়াও,' বাধা দিল কিশোর। 'অত তাড়াহুড়ো করাটা ঠিক হবে না। ওই দেখো, পাহারা আছে।'

আরেকটু এগোল ওরা। একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। যারাই ঢুকছে-বেরোচ্ছে সবার ওপর নজর রাখছে।

'একটা চালাকি করা দরকার,' কিশোর বলল। 'ওই লোককে সরাতে হবে দরজার কাছ থেকে। নইলে ঢুকতে গেলে ধরা পড়ব।'
'চালাকিটা কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
'শেয়াল হতে হবে তোমাকে।'
'শেয়াল!'
'জানো না বুঝি। অনেক সময় চাষার বাড়িতে জোড়া বেঁধে যায় শেয়াল আর শেয়ালনী। চাষার সামনে গিয়ে ইচ্ছে করে তাকে দেখিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে শেয়ালনী। তাকে তাড়া করে যায় চাষা। হাঁসের খোঁয়াড়ের কাছ থেকে চাষা যেই সরে, অমনি টুক করে ঢুকে একটা হাঁস নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘাপটি মেরে থাকা শেয়াল।' হেসে বলল কিশোর, 'সুতরাং বুঝতেই পারছ, কি করতে হবে তোমাকে। কাজ শেষ করে গাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে। পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব আমরা।'
দরজার দিকে এগিয়ে গেল মুসা। কিশোর আর রবিন চলে গেল আরেক দিকে। ঘুরে এগোল দরজার দিকে।
মুসাকে দেখতে পেল প্রহরী। সন্দিহান চোখে তাকিয়ে থাকল শেখের পোশাক পরে এগিয়ে আসা মূর্তিটার দিকে। মুসা কাছে পৌঁছলে হাত বাড়াল, 'দেখি, আমন্ত্রণপত্র?'
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়ার ভান করল মুসা। একটা মুহূর্ত দেরি করল না। আলখেল্লার ঝুল দুই হাতে ধরে হাঁটুর ওপর তুলে ঘুরে দিল দৌড়। সোজা বনের দিকে। দ্বিধা করতে লাগল প্রহরী, দরজা ছাড়বে কি ছাড়বে না ঠিক করতে পারছে না। তারপর মনস্থির করে নিয়ে মুসাকে ধরার জন্যে ছুটল।
সুযোগটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর আর রবিন।
'মুসাকে ধরে না ফেললেই হয়,' রবিন বলল।
'সে-জন্যেই তো ওকে বাছলাম। আমি কিংবা তুমি হলে জোরে দৌড়াতে পারতাম না। ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।'
মেহমানদের ভিড়ে মিশে গেল দু-জনে। আলোকিত বলরুমে চলে এল। খাঁটি ইংরেজদের কায়দায় সাজানো হয়েছে ঘরটা। বাজছে ইংলিশ বাজনা। নাচছে মেহমানরা। বেশ কিছু লোক আঠারো শতকের ইংরেজ রাজপরিবারের লোকের মত সেজেছে। বাকিদের পরনে মারদি গ্রাসের পোশাক। সবার মুখেই মুখোশ।
বলরুমের একপ্রান্তে একটা সিংহাসনে বসেছে কিং জর্জ। কয়েক মিনিট পর উঠে চলে গেল পাশের ঘরে। তার পিছু নেয়ার চেষ্টা করল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু পাশের ঘরটায় ঢুকে দেখল রাজা নেই।
'গেল কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল রবিন।
কিশোরের চোখও খুঁজছে। লম্বা হলঘরের শেষ মাথায় আধো অন্ধকারে একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল। দোতলায় উঠে গেছে। ফিসফিস করে রবিনকে বলল, 'গানের মধ্যে কি বলেছিল বাজোরা, মনে আছে? ইন আ সানলিট রুম আপ অ্যা উইনডিং স্টেয়ার।'
'হ্যাঁ। গোল্ড অ্যান্ড সিলভার উইল বি ওয়েইটিং দেয়ার। কিন্তু ঘোরানো সিঁড়ি

কোথায়? এ তো সরাসরি চলে গেছে দোতলায়।'

'তা ঠিক। তবে ঘোরানো সিঁড়ি একটা এখানে আছে কোথাও, আমি শিওর।'

উল্টো দিকে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করল ওরা। কিন্তু ঘোরানো সিঁড়ি আর পেল না। আবার ফিরে এল হলঘরে।

'এবার?' রবিনের প্রশ্ন।

'দোতলায় যাব।'

ওপরের ঘরগুলো নীরব। মানুষজনও নেই, কোন আসবাবও নেই। এখানেও ঘোরানো সিঁড়ি খুঁজতে লাগল ওরা।

হঠাৎ করিডরের একটা মোড় থেকে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'রবিন, দেখে যাও! পেয়েছি!'

করিডরের আরেক মাথা থেকে দৌড় দিল রবিন। দেখল, একটা সরু সিঁড়ি উঠে গেছে ঘুরে ঘুরে। উত্তেজিত হয়ে পড়ল সে-ও। 'হ্যাঁ, এটাই!'

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল দু-জনে। ওপরে একটা ছোট দরজা। ওটার কাছে আসতে ওপাশে কথা শোনা গেল। দাঁড়িয়ে গিয়ে কান পাতল ওরা।

'হিগিনস, এই টেবিলের সব কিছু তোমার,' বলল একটা কণ্ঠ। 'বাজোরা, তুমি নেবে ওই টেবিলের জিনিস। ইচ্ছে করলে দুটো টেবিলের জিনিস ভাগাভাগি করে নিতে পারো দু-জনে। তোমাদের ইচ্ছে। দলের লোককে কি কি দেবে, সেটা তোমরা ঠিক করবে।'

'আমি কি পাব?' বলল আরেকটা কণ্ঠ।

'রকি বীচে গিয়ে তোমার জিনিস দেয়া হবে, হোভার,' প্রথম কণ্ঠটা বলল।

'লুটের মাল ভাগ করে দিচ্ছে মনে হয় রাজা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'চলো, গিয়ে হাতেনাতে ধরি।'

'না। কম পক্ষে চারজন লোক আছে ওই ঘরে। আমরা দু-জন। কিছুই করতে পারব না।'

'তাহলে পুলিশকে খবর দিতে হয়।'

'হ্যাঁ, তাই করব। জলদি...'

কিশোরের কথা শেষ হলো না। খুলে গেল সিঁড়ির মাথায় চিলেকোঠার ছোট দরজাটা।

ষোলো

সরার সময় পেল না রবিন। কঠিন একটা থাবা তার কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। তাকে মেঝেতে আছড়ে ফেলে বলল বাজোরা, 'সেই বিচ্ছুগুলোর একটা!'

আর কোন উপায় না দেখে ঘরে ঢুকে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোর। জুডোর কায়দায় পরাস্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল অন্যরা। মেঝেতে ফেলে চেপে ধরল তাকে।

চোরাই মালে বোঝাই ঘরটা। রূপার জিনিসপত্র, দামী দামী ল্যাম্প, ফুলদানী, ছবি, আরও নানা রকম জিনিস পড়ে আছে মেঝেতে আর টেবিলে।

'যে কোন সময় পুলিশ এসে পড়বে,' চোরগুলোকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল রবিন।

'এলে কিছুই পাবে না,' হিসহিস করে উঠল রাজা। 'তোমাদেরকেও না।'

লোকটার মুখে মুখোশ। এটা বাদ দিলে চেনা চেনা। কোথায় যেন এই শরীর দেখেছে, শুনেছে এই কণ্ঠ, মনে করতে পারছে না কিশোর আর রবিন।

কিশোরকে চেপে ধরেছে ম্যানিলা আর হিগিনস; তাকে কি করা হবে সেই নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে এসে পড়ল তিন-চারটা হীরকছাপ র‍্যাটল।

'ডনিগান!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

ঘরে ঢুকল বুড়ো। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় তেকোনা হ্যাট। রক্ত হিম করা এক চিৎকার ছেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল সে।

সাপের ছোবল থেকে বাঁচার জন্যে কিশোরকে ছেড়ে লাফ দিয়ে সরে গেল দুই চোর। রবিনকেও ছেড়ে দেয়া হলো। উঠে দাঁড়াল ওরা।

'দেখা তাহলে হলো আবার,' চিবিয়ে চিবিয়ে ডনিগানকে বলল রাজা। 'তবে এবার আর পালাতে পারবে না।'

'ভুলে যেয়ো না আমি জলাভূমির শেয়াল!' পাল্টা হুমকি দিল ডনিগান। 'কলোনির লোকদের জবর দখল করে নেয়া কর ফেরত নিতে এসেছি!'

'বার বার আমার পার্টি নষ্ট করতে আসো। এর শেষ দেখব এবার আমি।'

'কে কার শেষ দেখে দেখা যাবে!' একটা সাপকে বাগিয়ে ধরে রাজার দিকে এগোল ডনিগান।

বিনা যুদ্ধে কেউ কাউকে ছাড়বে না, বোঝা যাচ্ছে। শুরু হয়ে গেল লড়াই। মেঝেতে নড়তে থাকা সাপগুলোকে এড়িয়ে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে পরাস্ত করার চেষ্টা চালাল।

হিগিনসের চোয়ালে কারাতের এক লাথি লাগিয়ে দিয়ে তাকে চিত করে ফেলল রবিন। ম্যানিলার সঙ্গে লাগল কিশোর। তাকে এত সহজে কাবু করতে পারল না সে। শরীরটা কাঠি হলে কি হবে, জোর আছে লোকটার গায়ে। ক্ষিপ্রও খুব। বাগে আনতে পারল না তাকে কিছুতে।

এই সময় দরজায় উদয় হলো শেখের আলখেল্লা পরা মুসা আমান। ঘরের দৃশ্য দেখল এক নজর। পরক্ষণেই ভেতরে ঢুকে 'ইয়া আলী' বলে চিৎকার করে গিয়ে পড়ল বাজোরার সামনে। এক গোড়ালিতে ভর রেখে চরকির মত পাক খেয়ে আরেক পায়ের মারাত্মক লাথি চালাল লোকটার পেটে।

ডনিগানের সাপ অনেকটা ভড়কে দিয়েছে লোকগুলোকে। তার ওপর এই কারাত আর জুডো হজম করতে কষ্ট হলো।

সিঁড়িতে অনেক মানুষের জুতো আর কথার শব্দ শোনা গেল। দরজায় দেখা দিলেন পুলিশ চীফ হ্যারল্ড। তাঁর পেছনে একজন অফিসার। নিচে আরও অনেকে

আছে বোঝা গেল।

চোরদের হাতে হাতকড়া পরাতে দেরি হলো না। চোরাই মালের দিকে তাকানোর অবসর পেলেন এতক্ষণে চীফ। 'সর্বনাশ! এত! গ্যালারিগুলো সাফ করে ফেলছিল এরা!'

'আপনার না সকালে আসার কথা?' কিশোর বলল।

'মুসা ফোন করল। তোমাদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল সে।'

হাতকড়া পরা হাতে চোয়াল ডলতে ডলতে বলল হিগিনস, 'আমি কিছু চুরি করিনি। হোভার আর কিং এনেছে এগুলো।'

'চোরের সঙ্গে সহযোগিতা করাও চুরি করার সামিল,' কঠোর কণ্ঠে বললেন চীফ।

রাজার দিকে এগোল কিশোর। আচমকা হাত বাড়িয়ে একটানে লোকটার মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেলল। এ-কি! জন হেমিংওয়ে পাওয়ারস!

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল গ্যালারির মালিক!

'নিজের ঘরে নিজে চুরি করতে গেলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'এই কিং জর্জ সাজারই বা কি মানে?'

জবাব দিল না পাওয়ারস। কড়া চোখে রবিনের দিকেও একবার তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

'আ-আমি সব জানি,' তাড়াতাড়ি বলল হিগিনস। 'আমাকে ছেড়ে দিলে বলতে পারি।'

চীফ বললেন, 'চোরাই মাল সহ হাতে নাতে ধরা পড়েছ, ছাড়াটা কঠিন হবে। তবে তোমার যাতে শাস্তি কম হয়, এই চেষ্টাটা করতে পারি। বলো, কি বলবে।'

'এই লোকটা একটা ডাকাত,' পাওয়ারসকে দেখাল হিগিনস। 'অনেক গ্যালারি লুট করেছে।'

'চুপ!' ধমকে উঠল পাওয়ারস।

কিন্তু তার ধমকে কান দিল না হিগিনস। পুলিশকে সব বলে দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর দিকেই এখন তার খেয়াল।

'নিজের ঘরে চুরি করল কেন এই লোক?' আবার একই প্রশ্ন করল রবিন।

হিগিনস বলল, 'সে আমাকে বলেছে, গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের ভয়ে এ কাজ করেছে। গ্যালারি চুরির কেসটা নাকি ওই গোয়েন্দার নেয়ার কথা ছিল। অন্য একটা জরুরী কাজে আটকে যাওয়ায় আর নিতে পারেনি। ডনিগান তাঁর শত্রু। বার বার পার্টিতে ঢুকে আমাদের জ্বালাতন করত। এই সুযোগে তাকেও ফাঁসিয়ে দেয়ার চমৎকার একটা প্ল্যান করে সে।'

'রাজার আসল পরিচয় কি জানত ডনিগান?'

'মনে হয় না। পার্টিতে বরাবরই মুখোশ পরা অবস্থায় দেখেছে।'

'তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে তাকে ফাঁসানোর বন্দোবস্ত করেছিল, এই তো?'

মাথা ঝাঁকাল হিগিনস। 'যখন কানে এল ভিকটর সাইমন কেস হাতে নিতে যাচ্ছে, চিন্তায় পড়ে গেল। ডনিগানের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজে বেঁচে যাওয়ার ফন্দি করল।'

'দেখো, টপ,' আবার ধমক দিল পাওয়ারস, 'ভাল চাইলে থামো!'

এবারও তার হুমকির পরোয়া করল না হিগিনিস। হাতকড়া পরা শত্রুকে ভয় পাচ্ছে না আর। বলল, 'চুপ করব কেন? যা করেছ তাই তো বলছি।'

কিশোর বলল, 'প্ল্যানটা কি করেছিল, দাঁড়ান, আমি বলি। জর্জিয়ায় উড়ে গেল পাওয়ারস, ডনিগানের কয়েকটা সাপ নিয়ে এল। রকি বীচে গিয়ে ভিকটর সাইমনকে বলে তার গ্যালারি পাহারা দেয়ার লোক ঠিক করল। অর্থাৎ আমাদের ঠিক করল। রাতে আমরা পাহারা দেয়ার সময় তেকোনা হ্যাট পরে, ডনিগানের একটা বস্তায় সাপ ভরে সে নিজেও গিয়ে হাজির হলো গ্যালারির কাছে।'

'ঠিক!' রবিনও বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটা। 'তাকে তাড়া করলাম আমরা। কিন্তু হারিয়ে ফেললাম। গ্যালারির চাবি আছে তার কাছে। ওখানে ঢুকে বসে রইল। তারপর একটা জানালা খুলে দিল।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমরা অন্য দিকে খোঁজাখুঁজি করছি, এই সুযোগে সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। দরজাটা খোলা রেখে দিল পুলিশের চোখে পড়ার জন্যে। সাপগুলো ফেলল আমাদের গাড়িতে। কি একটা চালাকি!'

কিশোর থামতেই রবিন বলল, 'বস্তার মধ্যে সাপের তেলের শিশি ভরে রাখল। বস্তাটা আটকে রাখল গ্যালারির কাছের একটা গাছে, আমাদের চোখে পড়ার জন্যে। শিশিটা রাখল যাতে আমাদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে কার্নিভালের ওপর; ভাবি, ওখানকার কেউই কাজটা করেছে। তারপর ওখানকার সাপুড়ে মারথাকে কিছু ঘুষ দিয়ে এল যাতে আমাদের কাছে এমন কিছু বলে, আমরা ডনিগানকে সন্দেহ করি।'

'চমৎকার!' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা।

কিশোর বলল, 'ডনিগানের খোঁজে আমরা সোয়াম্প ক্রীকে গিয়ে হাজির হলাম। হোভার ম্যানিলার প্লেনে করে পাওয়ারসও চলে গেল ওখানে। কিং জর্জের পোশাক নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখল ডনিগানের গ্যারেজে। কনি এবং আমাদের কাছে চিঠি সে-ই লিখেছিল, যাতে জলাভূমিতে গিয়ে আটকে থাকি আমরা। আমাদের সময় নষ্ট করতে পারলে তার লাভ।'

নাকমুখ কুঁচকে ফেলল মুসা। 'রাজা সেজে গিয়ে জলাভূমির কিনারে মানুষকে দেখা দিত ভূত বিশ্বাস করানোর জন্যে, তাই না?'

'হ্যাঁ। এ সবও করেছে আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে। ডনিগানকে খেলো করার জন্যে, যাতে তার কথা কেউ বিশ্বাস না করে, ভাবে মাথায় ছিট আছে। নিউ অরলীনসের পার্টির কথা সে হাজার বার বললেও আর তখন কেউ বিশ্বাস করবে না।' হিগিনসের দিকে তাকাল কিশোর। 'কি, যা বলেছি ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল হিগিনস, 'ঠিক।'

'এবার পার্টির ব্যাপারে কিছু বলুন তো? কি প্রয়োজন এর?'

'এক মাসের জন্যে বাড়িটা লীজ নিয়েছি আমি আর বাজোরা, পার্টি দেয়ার জন্যে। আমাদের দলের সবাই জানে ফ্যাট টিউজডের রাতে এই এলাকাতে কোথাও একটা পার্টি দেয়া হয়। কিন্তু কোন বাড়িটায় জানে না। তাই মারদি গ্রাসের রাতে একটা গান গায় বাজোরা। গানের মধ্যে দিয়ে বলা হয় কোন বাড়িটাতে যেতে হবে।'

'তার মানে একেক বছর একেক বাড়িতে পার্টি হয়? গত বছর অন্য বাড়িতে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। সাবধানতার জন্যে। দলের সবাইকে তো আর বিশ্বাস করা যায় না। কে যে কখন কিসের লোভে মুখ ফসকে সব বলে দেবে, ঠিক আছে?'

'কিন্তু এই পার্টির কি উদ্দেশ্য?'

'দুটো উদ্দেশ্য। এক, দলের সবাইকে ডেকে আনা। তাদের নিয়ে মীটিং করা। বলা, কে কোনখানে গিয়ে কোন গ্যালারিতে কি কি মাল চুরি করবে। দুই, যার যার পাওনা বুঝিয়ে দেয়া।'

মাথাটা ঝুলে পড়েছে পাওয়ারসের।

তার দিকে তাকাল কিশোর। 'মিস্টার পাওয়ারস, কিং জর্জের বুদ্ধিটা আপনার মাথায় এল কি করে, বলবেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পাওয়ারস। 'বহু বছর ধরে মারদি গ্রাস উৎসবে যোগ দিচ্ছি আমি। উৎসবটা আমার ভাল লাগে। এখানে স্টার হওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। ভাবলাম, রাজাই সাজি না কেন? সাজলাম। এবং হিট হয়ে গেল।'

রবিন বলল, 'বাৎসরিক মীটিঙটা এমন এক সময় করেন, যখন সারা শহর উৎসবের মধ্যে ব্যস্ত থাকে, প্রচুর বিদেশী লোক আসে। তাতে দুটো লাভ আপনার। কিং জর্জ সেজে নিজেকে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে পারেন। আপনার সহকারীরা যারা আসে, তারাও নিরাপদ থাকে। পুলিশের নজর পড়ে না কারও ওপর। কারণ ওরাও তখন মারদি গ্রাস নিয়ে ব্যস্ত। তাই না?'

'ঠিকই ধরেছ,' আর কোন কিছুই অস্বীকার করল না পাওয়ারস, করে লাভ নেই। 'হট্টগোলের মধ্যে মালগুলোও পুলিশের চোখ এড়িয়ে লীজ নেয়া কোন একটা বাড়িতে তুলে ফেলতে পারি।'

'কিন্তু আপনি একজন ব্যবসায়ী। বহু বছর ধরে রকি বীচে গ্যালারির ব্যবসা করছেন। যতটা জানি, এতে আয়টায় ভালই হয়। চুরির মধ্যে গেলেন কেন?'

হতাশ ভঙ্গিতে আবারও কাঁধ ঝাঁকাল পাওয়ারস। 'শুরুতে ব্যবসা ভালই চলছিল। বেশি লোভ করতে গিয়ে আজেবাজে মালের ওপর অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম। তাতে প্রায় ডুবে গিয়েছিল ব্যবসা। চুরি না করে সেটাকে ঠেকানোর জন্যে টাকা রোজগার করার আর কোন উপায় দেখিনি। তারপর যখন দেখলাম, চুরিতে আরও বেশি টাকা আসে...'

'পাক্কা চোর হয়ে গেলেন!' ভদ্রতার ধারেকাছেও না গিয়ে চড়া গলায় বলে বসল মুসা।

মাথা নিচু করে ফেলল পাওয়ারস।

'তোমাদের কথা শেষ হয়েছে?' চীফ জিজ্ঞেস করলেন। 'আর দেরি করতে পারছি না। এদেরকে থানায় নিয়ে যাই।'

'হয়ে গেছে, আর পাঁচ মিনিট, চীফ,' অনুরোধ করল কিশোর। পাওয়ারসকে জিজ্ঞেস করল, 'হিগিনস আর বাজোরার সঙ্গে পরিচয় হলো কি করে?'

'মারদি গ্রাসের সময়ই দেখা হয়েছে। আলাপ-পরিচয়ের পর ঘনিষ্ঠতা। ওদেরকে ধনী হতে আমিই সাহায্য করেছি।'

'চুরির টাকা দিয়েই নিশ্চয় ক্লাবগুলো কিনেছে ওরা,' অনুমান করল কিশোর।
'শুধু চুরির টাকা দিয়ে কিনলেও তো হত,' রাগত গলায় বলল মুসা, 'শয়তানী বাদ দিয়ে। ভুড়ুর দল গড়ে ক্লাব মালিকদের ভয় দেখিয়ে তাদের বাধ্য করেছে নামমাত্র মূল্যে ক্লাব বেচে দিয়ে চলে যেতে!' বাজোরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হেই মিয়া, বুদ্ধিটা কার? দোজখে গিয়েছিলেন নাকি, শয়তানের কাছ থেকে পরামর্শ আনতে?'
শীতল দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকাল বাজোরা। 'বুদ্ধিটা হিগিনসের। আমি শুধু তার কথামত কাজ করেছি।'
'তাতেও শাস্তির পরিমাণ কম হবে না,' কঠিন গলায় বললেন চীফ। কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি।
কিশোর বলল, 'আর কোন কথা নেই আমাদের।'
অপরাধীদের নিয়ে নিচে নামলেন পুলিশ চীফ।
নিচে নেমে কিশোর আর রবিন দেখল, পুরো বাড়ি ঘিরে রেখেছে পুলিশে। একটা লোকও পালাতে পারেনি।
চীফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে চড়ল তিন গোয়েন্দা। ওয়াকারের ক্লাবে ফিরে চলল।
জেগেই আছেন ওয়াকার। সব শুনে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। ধরা গলায় বললেন, 'তোমরা আমার ক্লাবটাকে বাঁচিয়ে দিলে।'
হেসে বলল মুসা, 'আরও একটা কথা কিন্তু বলছেন না। শুধু বাঁচাইনি, একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ করে দিয়েছি। বাজোরার ক্লাবটাও বন্ধ হয়ে গেল আজ থেকে।'
হেসে ফেললেন বৃদ্ধ। 'কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাদের।'
'ধন্যবাদের দরকার নেই। আগামী বছরের মারদি গ্রাসের দাওযাতটা দিয়ে ফেলুন।'
হাসি বাড়ল ওয়াকারের। 'মজার ছেলে তুমি, মুসা। তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। শুধু আগামী বছর কেন, আমি যদ্দিন বেঁচে থাকি, ততদিনের জন্যে তোমাদের দাওয়াত।'
রাত হয়েছে। ঘুমাতে হবে। নিজেদের ঘরে চলে এল তিন গোয়েন্দা।
বিছানায় শুয়ে হঠাৎ উঠে বসল রবিন, 'অ্যাই, একটা ভুল হয়ে গেছে। ডনিগানকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি। যে বিপদে পড়েছিলাম, সে সময়মত না ঢুকলে মারাই পড়তাম হয়তো!'
'ধন্যবাদটা দেব কি করে?' কিশোর বলল। 'কোন ফাঁকে যে কেটে পড়ল খেয়ালই করলাম না। রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ শেষ। নিশ্চয় আবার সোয়াম্প ক্রীকে ফিরে যাবে। র‍্যাটলস্নেকের বংশ বাঁচানোর চেষ্টা করবে এবার।'
'আজব এক লোক!'
অন্য দু-জনও একমত হলো রবিনের সঙ্গে।

***

জলদস্যুর মোহর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

মুদ্রাগুলো একপাশে ঠেলে সরিয়ে হাতের ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা টেবিলে রেখে দিয়ে কিশোর বলল, 'পুরানো, তবে অত পুরানো নয়। অ্যানটিক মূল্য তেমন হবে না। রূপার বর্তমান বাজার দরটাই মিলবে কেবল, লাভটাভ হবে না।'

'উঁ, কি বলছ?' বই থেকে মুখ তুলে বলল রবিন, 'মেকসিকোর ইতিহাস যে এত মজার, জানতাম না। সরকারকে প্রচুর নাচিয়েছে মেকসিকান ডাকাতরা। ডাকাত হলেও রোমানটিক ছিল ওরা খুব…'

হাত নেড়ে রবিনকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'জানি।' টেবিলে রাখা মুদ্রাগুলো দেখাল, 'এগুলোর অ্যানটিক মূল্য পাওয়া যাবে না।'

কোথা থেকে এসেছে ওগুলো, জানে রবিন। পুরানো মাল কিনতে গিয়ে এক বৃদ্ধার কাছ থেকে কিনে এনেছেন রাশেদ পাশা। তাঁর মনে হয়েছিল, অনেক পুরানো মোহর, রূপার বর্তমান বাজার দরে কিনে ফেলাটা খুব লাভজনক হবে। সে-জন্যেই পরীক্ষা করে দেখতে বসেছে কিশোর।

'তো কি করবে এখন? ফেরত দেবে?'

'না, ফেরত কি আর নেবে নাকি। অসুবিধে নেই। রূপার আসল দামটা তো আর মার যাবে না। তবে লাভ করার চেষ্টা ছাড়ব না। আজ থেকেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করব। অ্যানটিক দামে কেউ কিনতে ইনটারেস্টেড হতেও পারে। মোহর সংগ্রহকারীদের অভাব নেই…'

ফোন বাজল। তুলে নিল কিশোর। 'হালো। তিন গোয়েন্দা।'

'কিশোর পাশা?' জিজ্ঞেস করল একটা ভারী কণ্ঠ।

'বলছি।'

'কিশোর, আমি, ইয়ান ফ্লেচার।'

'ও, ক্যাপ্টেন! তা কি খবর, স্যার, বলুন?'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। মনে হচ্ছে কোন কেস পাওয়া যাবে।

'এইমাত্র সিটি হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছে, রাস্তা থেকে অজ্ঞান একজন লোককে তুলে আনা হয়েছে অ্যামবুলেন্সে করে।'

অবাক হলো কিশোর। 'এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?'

হাসলেন চীফ। 'বিড়বিড় করে লোকটা কয়েকবার ডিটেকটিভ ভিকটর সাইমনের নাম বলেছে। তাঁর বাড়িতে ফোন করেছি। উনি বাড়ি নেই। ভাবলাম, তোমাদের সঙ্গে খাতির-টাতির তো খুব ভাল তাঁর। কিছু জানতেও পারো।'

'নাম কি লোকটার?'

'জানি না। মিস্টার সাইমন হয়তো জানতে পারেন।'

'আমি আর রবিন যদি হাসপাতালে যাই, অসুবিধে আছে, স্যার?'
'বাড়িতে থাকো। যাওয়ার পথে আমি তুলে নেব তোমাদের।'
কিছুক্ষণ পর স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেট থেকে ওদের তুলে নিলেন চীফ। বললেন, 'হুঁশ ফিরে পেয়ে লোকটা হয়তো বলবে আমি অমুক জায়গার অমুক। তখন তার আত্মীয়দের খবর দিতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু হুঁশ না ফিরলেই মুশকিল।'
'হয়েছিল কি, স্যার?' জানতে চাইল কিশোর। 'বেহুঁশ হলো কি করে?'
'ডাক্তারের মনে হয়েছে, পিটিয়ে বেহুঁশ করে তাকে রাস্তায় ফেলে যাওয়া হয়েছে। ছিনতাইকারীর কাজ হতে পারে।'
হাসপাতালে পৌঁছে লিফটে করে পাঁচতলায় উঠে এল ওরা। করিডরে একজন নার্সের সঙ্গে দেখা। সে ওদেরকে নিয়ে এল ছোট একটা ঘরে। সেখানে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক তরুণ ডাক্তার।
বিছানায় শোয়া বেহুঁশ লোকটার সুদর্শন চেহারা, কালো চুল, বয়স তিরিশ-একত্রিশ হবে। চোখ বোজা। মাথায় ব্যান্ডেজ।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন চীফ, 'একে দেখেছ কখনও?'
রবিন আর কিশোর দুজনেই মাথা নেড়ে বলল, 'না।'
ডাক্তার বললেন, 'লোকটা মনে হয় স্প্যানিশ।'
'বিদেশীই লাগছে,' চীফ বললেন। 'স্প্যানিশ যে কি করে বুঝলেন?'
'প্রলাপ বকেছে। দু-চারটা কথা যা বলেছে তাতেই বুঝেছি। কখনও ইংরেজিতে বলেছে, কড়া স্প্যানিশ টান; কখনও পুরোপুরিই স্প্যানিশে বলেছে।'
'কি বলেছে?'
'বুঝতে পারিনি। তবে ভিকটর সাইমন নামে একজনের নাম বলেছে।'
'ভিকটর সাইমন!' অবাক হলো কিশোর। 'তিনি একজন ডিটেকটিভ। তাঁর নাম বলল কেন? পকেটে এমন কিছু পাওয়া গেছে যাতে বোঝা যায় লোকটা কে?'
'পকেট একদম খালি,' ডাক্তার বললেন। 'অনেক মেরেছে। পিটিয়ে বেহুঁশ করে পকেটে যা পেয়েছে সব নিয়ে গেছে।'
'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন চীফ। 'এখানে বোধহয় আর কিছু করার নেই আমাদের। যেখানে পাওয়া গেছে একে, সেখানে লোক লাগিয়ে দেব খোঁজার জন্যে। দেখা যাক কিছু মেলে কিনা।'
'ভিকটর সাইমনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা দরকার,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি বলো? তাঁর নাম যখন বলেছে, হয়তো তিনি কিছু জানতে পারেন।'
যাওয়ার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে ওরা, এই সময় নড়ে উঠল লোকটা। খসখসে স্বরে বিড়বিড় করল, 'দি কার্স অভ দা ক্যারিবিস!'
থমকে দাঁড়াল রবিন, 'কি বলল!'
'এ কথা আরও একবার বলেছে,' জানালেন ডাক্তার। 'আনার পর পরই।'
আর কিছু বলে কিনা শোনার জন্যে কান পেতে রইল দুই গোয়েন্দা, কিন্তু বলল না লোকটা। অস্থির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকল কেবল।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে।

গাড়িতে করে কিশোরদেরকে ইয়ার্ডে পৌঁছে দেয়ার সময় চীফ বললেন, 'পারলে মিস্টার সাইমনের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো তোমরা। কিছু জানলে আমাকে জানিয়ো।'

ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তিনি।

গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে কিশোর বলল, 'দি কার্স অভ দা ক্যারিবিস! মনে হচ্ছে সাধারণ ছিনতাইয়ের ঘটনা নয় এটা। লোকটাকে পেটানোর পেছনে অন্য কোন কারণ আছে।'

ওঅর্কশপে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে, এই সময় গাড়ির ইঞ্জিনের বিকট ভটভট শোনা গেল।

মাথা নেড়ে রবিন বলল, 'ওই আসছে, মুসা আমান!'

দুই

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঅর্কশপে ঢুকল মুসা।

হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কি ব্যাপার?'

'দারুণ খবর আছে!'

'সে তো বুঝতেই পারছি। নিঃসন্তান কোন আত্মীয় মারা গেছে তোমার, যার খাবারের দোকানটা তোমাকে দান করে দিয়ে গেছেন?'

'ওসব না, ওসব না!' জোরে জোরে হাত নেড়ে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল মুসা, 'গুপ্তধন খুঁজতে চাও?'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর আর রবিন। বোকা বানাচ্ছে কিনা বুঝতে চাইছে।

রবিন বলল, 'মানে!'

'গুপ্তধন, গুপ্তধন, বুঝতে পারছ না? খুঁজতে চাও? মাটিতে পোঁতা আছে।'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়ির পেছনের একটা খাদে।'

কিছুদিন আগে পুরানো বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে নতুন বাড়ি কিনেছে মুসারা। পাহাড়ের ধারে একটা পুরানো খামারবাড়ি কিনে সেটাকে সংস্কার করিয়ে নিয়েছেন মুসার বাবা।

পকেট থেকে একটা মোহর বের করল মুসা। সামনের টেবিলে খটাং করে ফেলে দিয়ে বলল, 'বিশ্বাস না হলে দেখো। এইটা পেয়েছি। আমার ধারণা আরও অনেক আছে ওখানে।'

মোহরটা তুলে নিল কিশোর। 'ওখানে খুঁড়তে গেছিলে কেন?'

'টবের জন্যে মাটি আনতে।'

ভাল করে দেখার জন্যে কিশোরের দিকে ঘাড় বাড়িয়ে দিল রবিন।

পুরানো, বিবর্ণ একটা মুদ্রা। রূপার তৈরি। এক পিঠে হাতে খোদাই করা একটা পাইন গাছের ছবি। তার নিচে লেখা:

In Masathusetts.

অন্য পিঠটা উল্টে দেখল কিশোর। এ পিঠে লেখা:

New England A. N. Dom., the date 1681, and the numeral XII.

'ষোলো শো একাশি সাল!' বিস্মিত হলো রবিন। 'ও সময় এ দেশে মুদ্রা তৈরি হত বলে তো শুনিনি!'

বইয়ের পোকা রবিন জানে না, এমন তথ্য কম আছে। জ্ঞান দান করার ভঙ্গিতে হেসে বলল কিশোর, 'এর নাম পাইন ট্রী শিলিং। এক্স আই আই মানে টুয়েলভ সেন্টস। দুর্লভ মুদ্রা। বর্তমানে এর অ্যানটিক মূল্য অনেক।'

'নিশ্চয় আরও আছে গর্তটায়!' আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ল মুসা, 'যাবে তোমরা? তিনজনে মিলে খুঁড়ব।'

'যাব,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল কিশোর।

রবিনও মাথা ঝাঁকাল।

তখনই মুসার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে বেরোল দুজনে।

বেরিয়েই যে লোকটাকে ওঅর্কশপের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, কল্পনাও করেনি তাকে দেখতে পাবে। ওদের পুরানো শত্রু টেরিয়ার ডয়েল, ওরফে শুঁটকি টেরি। তিনজনেই থমকে দাঁড়াল।

চমকটা সবার আগে সামলে নিল টেরি। তার সেই গায়ে জ্বালা ধরানো হাসি হেসে বলল, 'আবার এলাম। ভাবলাম, অনেক দিন যাই না রকি বীচে, দেখা-সাক্ষাৎ নেই; দেখাটা করেই আসি। ভাল আছ তো তোমরা?'

তিক্ত স্বরে মুসা বলল, 'ভালই তো ছিলাম। তবে আর বোধহয় থাকা হবে না। বাতাসে এখন শুঁটকির গন্ধ ভাসবে। এই দুর্গন্ধ আমার ভাল্লাগে না!'

রাগ করল না টেরি। খিকখিক করে হাসল। 'তা এত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চললে? নতুন কোন কেস পেয়েছ নাকি?'

'সে-কথা তোমাকে বলতে যাব কেন?' কড়া জবাব দিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল মুসা। তার সঙ্গে এগোল রবিন আর কিশোর।

বাড়ির পেছনে মাঠ, মাঠের শেষ মাথায় বন আছে, পাহাড় আছে, আর আছে একটা মরা নদী। বেশির ভাগ জায়গায়ই পানি নেই। শুকনো খাদ আর গর্তই বেশি। নদীর ধারে ওদেরকে নিয়ে গেল মুসা। এক জায়গায় খাদের মধ্যে একটা কোদাল আর একটা শাবল পড়ে আছে। গ্যারেজ থেকে আরও দুটো কোদাল নিয়ে এল সে।

সারাটা বিকেল পরিশ্রম করেও আর একটা মোহরও পেল না ওরা।

ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের গোড়ায় বসে পড়ল কিশোর। খোঁড়া চালিয়ে গেল অন্য দুজন।

হঠাৎ কোদালের মাথায় কি যেন লেগে শব্দ হলো। চিৎকার দিয়ে উঠল রবিন।

'কি হলো?' সোজা হয়ে বসল কিশোর।

জবাব না দিয়ে কোদালে উঠে আসা মাটি হাতড়াতে শুরু করল রবিন।

শাবলে ভর দিয়ে তার দিকে ঝুঁকে তাকাল মুসা। 'পেয়েছ নাকি আরেকটা?'

মাটির মধ্যে থেকে কালচে মত একটা জিনিস বের করে আনল রবিন।

'দেখি তো?' হাত বাড়াল মুসা। গোধূলির আলোয় জিনিসটা দেখে রবিনের মতই চিৎকার করে বলল সে, 'মোহরই তো! বলেছিলাম না আছে। আমি শিওর, আরও আছে। ঠিক জায়গাটা পাচ্ছি না আমরা। আশেপাশে খুঁড়ছি।'

কিশোরও উঠে এসে মোহরটা দেখল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। আকাশের দিকে তাকাল। রাত হতে বাকি নেই। অন্ধকারে আর খোঁড়া যাবে না। মাথা নেড়ে বলল, 'কাল সকালে আবার আসতে হবে।'

'বাড়ি যাওয়ার দরকারটাই বা কি?' মুসা বলল, 'আজ আমাদের বাড়িতেই থেকে যাও। ভোরে উঠে খোঁড়া শুরু করব। রোদ চড়ে গেলে খুঁড়তে কষ্ট হবে।'

রাজি হয়ে গেল কিশোর আর রবিন।

রাতে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত মোহর নিয়েই বেশির ভাগ আলোচনা করল ওরা।

মুসার ধারণা, আরও অনেক মোহর আছে ওখানে মাটির নিচে। বস্তা বস্তা গুপ্তধন। উত্তেজনায় সে-রাতে ভাল ঘুম হলো না তার।

পরদিন কাকভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। চলে এল গর্তটার কাছে।

লাফাতে লাফাতে নিচে নামল মুসা। নেমেই থমকে গেল। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'খাইছে!'

'কি হয়েছে,' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেখো!' হাত তুলে দেখাল মুসা।

রবিন আর কিশোরও দেখল। আগের সন্ধ্যায় শাবল-কোদালগুলো ফেলে গিয়েছিল এখানে। যেখানে ফেলে গিয়েছিল, সেখানে নেই, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে খুঁড়ে তোলা মাটির ঢিপিতে।

'শিওর কেউ এসেছিল রাতের বেলা!' রবিন বলল। 'মাটি খুঁড়েছে!'

গুঙিয়ে উঠল মুসা, 'তারমানে নিয়ে গেল আমার গুপ্তধন!'

তিন

পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

মুসাই বলল আবার, 'কাল সন্ধ্যায় এখানে আমাদের মাটি খুঁড়তে দেখেছিল নিশ্চয় সে। চুপি চুপি কাছে এসে আমাদের গুপ্তধনের আলোচনাও শুনে যেতে পারে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'তা পারে। আর কাউকে বলোনি তো মুদ্রা পাওয়ার কথা?'

'না।'

খাদের এ মাথা-ওমাথা ঘুরতে লাগল মুসা।

'এমনও হতে পারে,' রবিন বলল, 'যে লোক কাল রাতে খুঁড়তে এসেছিল, মোহরগুলো সে-ই লুকিয়েছিল এখানে।'

মুখ বাঁকাল মুসা, 'হ্যাঁ, দুশো বছর আগে লুকিয়েছিল, ভূত হয়ে ফিরে এসে তুলে নিয়ে গেছে!'

'আমি বলছি চোরের কথা। মোহরগুলো কোনখান থেকে চুরি করে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল। সময়মত এসে তুলে নিয়ে গেছে। কোথায় আছে জানা ছিল বলেই এত তাড়াতাড়ি বের করে নিয়ে যেতে পেরেছে।'

মানতে পারল না কিশোর। 'তাহলে তিন ফুট গভীর আরেকটা গর্ত খুঁড়ল কেন? জানেই যদি, তো একটা খুঁড়েই নিয়ে যেতে পারত।'

মাথা চুলকাল মুসা। 'কি বলব বুঝতে পারছি না, হয়তো দুটো গর্তেই মোহর ছিল।' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'যখন ভাবলাম, গুপ্তধন পেয়ে বড়লোক হয়ে যাব, তখনই হাতছাড়া হয়ে গেল জিনিসগুলো, এমনই কপাল!'

'হতে পারে লোকটা কিছুই পায়নি,' কিশোর বলল। 'এখানে এত গর্ত দেখে কৌতূহল হয়েছিল, কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে সে-ও খুঁড়েছিল।'

কিছুটা উজ্জ্বল হলো মুসার মুখ। 'তুমি তাই ভাবছ? তাহলে তো আবার কাজ শুরু করা যায়।'

রবিন বলল, 'আজও যদি কিছু না পাই, রাতে এসে লুকিয়ে থেকে চোখ রাখব গর্তের ওপর। লোকটা খালিহাতে ফিরে গিয়ে থাকলে আবার আসতে পারে।'

হাসল মুসা। 'তাহলে এখনই বা আর কষ্ট করতে যাই কেন আমরা? লোকটা এসে খুঁড়ুক। কিছু পেলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নেব। অহেতুক কষ্ট করি কেন? জায়গাটার মালিক আমরা, এখানে যা পাওয়া যাবে, সব আমাদের; কেড়ে নিলে অন্যায় হবে না, কি বলো?'

রাজি হলো না কিশোর। 'এ সব কুবুদ্ধি করা উচিত না। কিছু থেকে থাকলে আমরাই বের করে নেব।'

'কি বের করে নেবে?' পেছনে খসখসে একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

পাঁই করে ঘুরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

হাসিমুখে খাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে টেরিয়ার। হাতে একটা এয়ারগান। নরম ঘাসে ছাওয়া ঢাল বেয়ে পা টিপে টিপে কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে, বুঝতেই পারেনি গোয়েন্দারা।

'কি বের করে নেবে?' আবার প্রশ্ন করল টেরিয়ার। 'অনেক গর্ত দেখা যাচ্ছে! মাটি খুঁড়েছ নাকি? গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছ?'

'তোমার এখানে কি!' ঝাঁজাল গলায় ধমকে উঠল মুসা।

'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম।' হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বলল শুঁটকি, 'খবর পেয়েছি, এদিকে নাকি আজকাল প্রচুর খরগোশ আর কাঠবেড়ালি পাওয়া যাচ্ছে। তাই এলাম। যেতে যেতে খাদের মধ্যে কথা শুনে কৌতূহল হলো। এসে দেখি তোমরা।'

'দেখা তো হয়েছে,' হাত নেড়ে মুসা বলল, 'এবার যাও। শুকনো মাছের গন্ধ ভাল লাগছে না!'

রাগ নেই টেরিয়ারের মুখে। মুখের হাসিটা মলিন হলো না বিন্দুমাত্র। বলল, 'যাচ্ছি। মুসা, তোমাদের নতুন বাড়িটা খুব ভাল জায়গায় কিনেছ।'

'এ কথা সবাই বলে। তোমার মুখ থেকে আর প্রশংসাটা না শুনলেও চলবে। তুমি এবার যাও। আমাদের কাজ আছে।'

'কি কাজ? মাটি খুঁড়বে?'

'খুঁড়ব,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। টেরি সন্দেহ করেছে ওরা গুপ্তধন খুঁজছে। বেশি রাগারাগি করলে সন্দেহ আরও বাড়বে। আড়াল থেকে চোখ রাখতে পারে। 'অনেকগুলো টব কিনেছেন মুসার আম্মা। মাটি দরকার।'

মুচকি হাসল টেরি। গর্তের পাড়ে খুঁড়ে তোলা মাটির স্তূপ দেখিয়ে বলল, 'এত মাটি? কয় হাজার টব কিনেছেন? নেবেন কি করে, ট্রাক দিয়ে?'

থাবড়া মেরে শুঁটকির বিশাল নাকটা বসিয়ে দেয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছেটা রোধ করল কিশোর। রাগ চেপে বলল, 'যে ভাবেই নিই, তাতে তোমার কি?'

'না, আমার কিছু না। তবে সাহায্য চাইলে একটা পিকআপ ধার দিতে পারি…'

আর সহ্য করতে পারল না মুসা। খেঁকিয়ে উঠল, 'কেন, এ শহরে পিকআপের আকাল পড়েছে নাকি যে শুঁটকি পরিবহনের সাহায্য নিতে হবে? যাও, যাও, কাজ করতে দাও!'

জবাবে পিত্তি জ্বালানো হাসি হেসে, এয়ারগানটা কাঁধে ফেলে পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেল টেরি।

'ব্যাটার ভঙ্গি দেখো!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রবিন। 'খরগোশ তো না, যেন হাতি শিকার করতে চলেছে!'

'কিন্তু এখন আর খুঁড়তে পারব না,' কিশোর বলল। 'ও সন্দেহ করেছে। নজর রাখবেই। টবের জন্যে মাটি জোগাড় করার কথা একটুও বিশ্বাস করেনি।'

'ওর আর দোষ কি!' তিক্তকণ্ঠে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল মুসা। 'এত মাটি দেখলে কে-ই বা করবে? কি করবে, বাড়ি ফিরে যাবে?'

'আর কি করব?'

অগত্যা ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হলো ওরা। পরে যখন বুঝবে শুঁটকি চলে গেছে, তখন আবার খুঁড়তে যাবে।

ওদের দেখেই মুসার আম্মা বললেন, 'এসেছ। না এলে আমিই ডাকতে যেতাম। কিশোর, বাড়ি যাও। তোমার চাচী ফোন করেছিলেন। তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন।'

'কেন কিছু বলেছে?'

'না। কেবল বলেছেন, ব্যাপারটা জরুরী। তোমাকে যেন এখুনি পাঠিয়ে দিই।'

চার

মুসা বাড়িতেই রইল। শিকার সেরে টেরি কখন ফিরে যায়, খেয়াল রাখবে।
রবিন চলল কিশোরের সঙ্গে। তাকে ইয়ার্ডে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি যাবে।
ইয়ার্ডে এসে ওকেও সঙ্গে আসতে বলল কিশোর। পারিবারিক কোন ঘটনা নয়, তাহলে জানা থাকত। নিশ্চয় অন্য কিছু।
অস্থির হয়ে বারান্দায় পায়চারি করছেন মেরিচাচী। ওদের দেখে প্রায় দৌড়ে এলেন। 'এতক্ষণে এলি!'
'দেরি তো করিনি,' জবাব দিল কিশোর। 'তোমার ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছি। কি হয়েছে?'
'চলে গেছে লোকটা,' উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন চাচী। 'তোদের দেখেই পালাল। মোড়ের দিকে গেছে। পেছন দিক দিয়ে ঢোকা উচিত ছিল তোদের।'
'কি করে জানব পেছন দিক দিয়ে আসতে হবে? কে পালাল? কার কথা বলছ? চাচা কোথায়?'
'আজব একটা লোক। এ বাড়ির ওপর নজর রাখছিল। বোরিস আর রোভারকে নিয়ে মাল আনতে গেছে তোর চাচা। লোকটার চেয়ে থাকার ভঙ্গি মোটেও ভাল লাগল না। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই তোকে আসতে বলেছি।'
শিস দিয়ে উঠল রবিন। কিশোরের হাত ধরে টানল, 'চলো, মোড়ের কাছে গিয়ে দেখি। পেলে জিজ্ঞেস করব, কেন নজর রাখছিল? আন্টি, লোকটা দেখতে কেমন?'
'লম্বা, ছাই রঙের স্যুট পরা, হালকা গোঁফ আছে।'
মুহূর্ত দেরি করল না আর কিশোররা। প্রায় ছুটে বেরোল রাস্তায়। মোড়ের কাছে অনেক খুঁজেও ওরকম চেহারার কোন লোককে দেখল না। চলেই গেছে লোকটা।
আবার ইয়ার্ডে ফিরে এল ওরা। ওপরতলার জানালায় বসে পর্দার ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রাখল। লোকটা আবার আসে কিনা দেখতে লাগল।
দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেল। এল না লোকটা।
রান্নাঘরে যাওয়ার জন্যে উঠতে যাবে কিশোর, এই সময় পেছনের বাগানে একটা হট্টগোল শোনা গেল। মানুষ আর কুকুরের চিৎকার হতে লাগল সমানে। লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল দুজনে।
রান্নাঘর থেকে মেরিচাচীও বাগানে বেরিয়ে এলেন।
কিশোররা পৌঁছে দেখল, ভীষণ ঝগড়া বাধিয়েছে দুটো কুকুর। মাটিতে গড়াগড়ি করে কামড়াকামড়ি করছে। ওগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে রাগারাগি আর তর্কাতর্কি করছে অপরিচিত দুজন লোক, কুকুরগুলোর মালিক হবে।
'তোমার কুত্তাটার দোষ! ওটাই শুরু করেছে!' গর্জে উঠল একজন।

'না, তোমারটার! ওটা কামড়াতে না এলে আমারটা কিছু বলত না!'

'থামাবেন এখন, না ঝগড়াই করবেন?' ধমক দিয়ে বললেন মেরিচাচী। 'আপনারাও তো জানোয়ারগুলোর মতই শুরু করেছেন!'

মেরিচাচীর দিকে তাকিয়ে কি ভাবল লোকগুলো কে জানে, তবে তর্ক করল না আর। কুকুরদুটোকে থামানোর জন্যে এগিয়ে গেল। কিন্তু টানাহেঁচড়া করেও সরাতে পারল না কোনটাকে।

বাগানে ফুলগাছে পানি দেয়ার বালতি করে পানি এনে ওগুলোর গায়ে ঢেলে দিল কিশোর।

এইবার সরল কুকুর দুটো। গা থেকে পানি ঝেড়ে ফেলে আবার পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। তাড়াতাড়ি গলার বেল্ট ধরে ফেলল ওদের দুই মনিব। যেতে দিল না আর।

'যান, বেরোন এখন বাগান থেকে!' কড়া গলায় বললেন মেরিচাচী। 'সামলাতে না পারলে কুত্তা পালেন কেন? অন্যের বাড়িতে ঢুকে বাগান নষ্ট করে, এটা কেমন কথা?'

মেরিচাচীর কাছে মাপ চেয়ে কুকুর দুটোকে নিয়ে পেছনের ছোট গেটের দিকে রওনা হলো লোকগুলো। আবার শুরু করল তর্কাতর্কি। এ বলছে তার কুকুরটার দোষ, ও বলছে তার। নিজেরটার দোষ দিতে রাজি নয় কেউই।

'হুঁহ্, নিজেদেরই সামলাতে পারে না, কুত্তা সামলাবে!' ঝাঁজাল গলায় বললেন মেরিচাচী। কিশোরদের দিকে তাকালেন। 'হাতমুখ ধুয়ে আয়। খাবার দিচ্ছি।'

চাচীর আগেই রান্নাঘরের দরজায় পৌঁছে গেল কিশোর আর রবিন। হলঘরে চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হলো। বাড়িতে তো ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। কে ঢুকল ঘরে? চোরটোর না তো? দেখার জন্যে দৌড় দিল দুজনে।

সামনের দরজায় এক লহমার জন্যে একটা লোককে দেখতে পেল রবিন। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লাটা।

'চোর! চোর!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'কিশোর, জলদি এসো!' আগে আগে ছুটল সে।

সামনের বারান্দায় বেরিয়ে বাগানের রাস্তা দিয়ে লোকটাকে দৌড়ে যেতে দেখল। লাফিয়ে বারান্দা থেকে নেমে তাড়া করল ওকে।

পেছনে এল কিশোর।

রবিন কাছে যাওয়ার অনেক আগেই বাগান পেরোল লোকটা, পাতাবাহারের বেড়া পেরোল, চলে গেল গ্যারেজের ওপাশে।

ওই জায়গায় যখন পৌঁছল ওরা, অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা।

রাস্তাসহ আশপাশের সমস্ত জায়গায় গরুখোঁজা চালাল ওরা। কিন্তু লোকটার ছায়াও দেখল না আর।

ফেরার পথে রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ভালমত দেখেছ ওর চেহারা?'

'মুখ দেখিনি। তবে মনে হলো দাড়ি আছে।'

'চলো, দেখি, কি চুরি করল?'

উৎকণ্ঠিত হয়ে বারান্দায় অপেক্ষা করছেন মেরিচাচী। ওদের দেখেই বলে

উঠলেন, 'ধরতে পারলি না?'
মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিছু চুরি করেছে, দেখেছ?'
'ভেতরে যাইনি। দেখিনি এখনও। চল।'
হলঘরে ঢুকল ওরা। যে জিনিস যেখানে যেমন ছিল, তেমনই আছে। কেবল মেরিচাচীর হাতব্যাগটা টেবিলে পড়ে আছে, খোলা। ভেতরের জিনিসপত্র সব টেবিলে ঢেলে ফেলা হয়েছে। কয়েকটা পাঁচ ডলারের নোট ছিল, সেগুলোও পড়ে আছে। একটাও খোয়া যায়নি। আশ্চর্য! তাহলে কি নিতে এসেছিল লোকটা?

পাঁচ

টেবিলে খাবার দিলেন চাচী।
খেতে খেতে আলোচনা চলল।
কিশোর বলল, 'আমার বিশ্বাস, দুই কুকুরের মালিক আর স্যুট পরা লোকটা একই দলের। ইচ্ছে করে কুকুর এনে ঝগড়া বাধিয়েছে, যাতে আমরা সেদিকে চলে যাই, এই সুযোগে স্যুট পরা লোকটা ঘরে ঢুকে তার জিনিস বের করে নিয়ে যেতে পারে।'
'কিন্তু কি নিতে এসেছিল সে?'
'টাকাপয়সা, জিনিসপত্র কিছুই যখন নেয়নি, একটা সন্দেহ হচ্ছে—হয়তো ওই মোহরগুলো নিতে এসেছিল সে। নিশ্চয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেছে।'
মুখের কাছে গিয়ে থেমে গেল রবিনের স্যান্ডউইচ ধরা হাতটা। 'মোহর?'
'তা ছাড়া আর কি? অনেক জিনিসই ছিল, নিলে নিতে পারত, নিল না কেন? চাচীর ব্যাগ খুলে টাকা পেয়েও ফেলে গেল। নিশ্চয় কোন কারণে কয়েকটা নোটের চেয়ে রূপার মোহর ওদের কাছে বেশি দামী।'
কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই টেলিফোন বাজল। ধরার জন্যে উঠে গেলেন মেরিচাচী। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে 'হ্যালো' বলে ওপাশের কথা শুনলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আছে।' কিশোরের দিকে তাকালেন, 'তোর ফোন।'
ফোন ধরে কিশোর নিজের নাম বলতে ওপাশ থেকে বলল একটা পুরুষ কণ্ঠ, 'সিটি হসপিটালের সুপারিনটেনডেন্ট বলছি। কাল যে লোকটাকে দেখতে এসেছিলে, তার জ্ঞান ফিরেছে। কাল বলেছিলাম, তার অবস্থার উন্নতি হলে তোমাদের জানাব, তাই...'
জানানোর জন্যে অনুরোধ করে এসেছিল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'উন্নতি হয়েছে?'
'না, কেবল জ্ঞান ফিরেছে। কথা বলতে পারছে। কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে এক্ষুণি চলে এসো।'
'দশ মিনিট লাগবে, স্যার। থ্যাংক ইউ।'
ঠিক দশ মিনিটের মাথায় লোকটার কেবিনের দরজার কাছে পৌঁছে গেল দুই

গোয়েন্দা।

কিন্তু ওদেরকে হতাশ করল সে। নিজের পরিচয় জানাতে পারল না। নাম জিজ্ঞেস করাতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কি ঘটেছে, কোন কথা জানাতে পারল না।

'অ্যামনেশিয়া,' ফিসফিস করে বলল কাছে দাঁড়ানো নার্স। 'স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে বেচারার।'

শূন্য দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। দুর্বল ভঙ্গিতে কড়া স্প্যানিশ টান মেশানো ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা? কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না?'

'না, দেখেননি,' জবাব দিল কিশোর। 'ঘোরের মধ্যে গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের নাম বলছিলেন, তাই দেখা করতে এসেছি। আমরাও গোয়েন্দা, মাঝে মাঝে তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করি। তিনি এখন রকি বীচে নেই, তাই আমাদেরই আসতে হলো। কালও এসেছিলাম। আপনি বেহুঁশ ছিলেন। কথা বলতে পারিনি।'

'গোয়েন্দা! ভিকটর সাইমন!' বিড়বিড় করল লোকটা। মাথা নাড়ল, 'না, চিনতে পারছি না। সরি!'

'পথে হামলা চালানো হয়েছিল আপনার ওপর। কোথায় যাচ্ছিলেন তখন, মনে আছে?'

'না। কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'আপনার নাম কি?'

আবার মাথা নাড়ল লোকটা। 'জানি না। কিছুই মনে করতে পারছি না।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে নার্স বলল, 'এখন কথা বলে কোন লাভ নেই। কিছু বলতে পারবে না ও। ডাক্তার বলে গেছেন, রোগটার নাম অ্যামনেশিয়া।'

নার্স বেরিয়ে গেল।

বিছানার আরও কাছে সরে এসে লোকটার চোখে চোখে তাকাল কিশোর। বলল, 'সূত্র দিচ্ছি, দেখুন কিছু মনে করতে পারেন কিনা। কাল আরও একটা কথা কয়েকবার বলেছেন আপনি—কার্স অভ দি ক্যারিবিস। মনে পড়ছে? মানে কি এর বলতে পারেন?'

আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল লোকটার চোখের তারায়। ভয় ফুটল চেহারায়।

কিশোর ভাবল, কাজ হয়েছে। কথাটা বোধহয় আঘাত করেছে লোকটার স্মৃতিতে।

'দা কার্স অভ দি ক্যারিবিস?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল লোকটা। আবার ভাবলেশহীন হয়ে গেল চেহারা। ভয় চলে গেল চোখ থেকে। 'শুনিনি কখনও।'

ওকে আর প্রশ্ন করে লাভ নেই, বুঝতে পারল কিশোর।

বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তায় এসে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'স্মৃতি হারানোর অভিনয় করছে না তো?'

'কার্স অভ দি ক্যারিবিস কথাটা ধাক্কা দিয়েছে ওকে, এটা ঠিক,' কিশোর বলল। 'হয় রোগটা সিরিয়াস হয়নি—সেরে যাবে শীঘ্রি, নয়তো কারও ভয়ে মুখ বন্ধ

করে রেখেছে সে।'

'আমারও মনে হলো ভয় পেয়েছে।'

'ইয়ান ফ্লেচারকে জানানো দরকার।'

রকি বীচ থানায় এসে চীফকে সব বলল ওরা।

ভ্রূকুটি করলেন তিনি। 'অভিনয় হতে পারে। তবে অ্যামনেশিয়ার ব্যাপারে ডাক্তাররা শিওর। বলা যায় না কিছু। মাথার রোগ তো, ডাক্তাররাও ফাঁকিতে পড়ে যেতে পারে। লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে। ব্যবস্থা করছি।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'আরও একটা কারণে লোক পাঠানো দরকার। হামলা হতে পারে ওর ওপর। যারা ওকে পিটিয়ে আধমরা করেছে, তারা আবার আসতে পারে।'

'তা বটে।'

চীফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। বাড়ি রওনা হলো।

ছয়

ইয়ার্ডে পৌঁছেই খবর পেল, ভিকটর সাইমন ফোন করেছিলেন। বলেছেন, কিশোর ফিরলেই যেন ফোন করে।

করল কিশোর।

তখুনি তাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন তিনি।

আবার বেরোল ওরা।

বাড়িতে চোর ঢুকে হাতে টাকা পেয়েও নেয়নি শুনে ভ্রূকুটি করলেন সাইমন, 'কিছুই নেয়নি?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। চাচীর ব্যাগে যত টাকা ছিল, সব ফেলে গেছে। তবে আমার ধারণা, কতগুলো রূপার মোহর নিতে এসেছিল। পায়নি বলে নিতে পারেনি। ওঅর্কশপে রেখেছি আমি ওগুলো। চোর সেটা জানত না।'

'সঙ্গে আছে একআধটা?'

'পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে এসে যদি কেউ দেখতে চায়,' বের করে দিয়ে বলল কিশোর, 'সে-জন্যে নমুনা সঙ্গে রেখেছি।'

দেখলেন সাইমন। আনমনে বিড়বিড় করলেন, 'রূপার মোহরে আগ্রহ!' উঠে গিয়ে ড্রয়ারের তালা খুলে কয়েকটা মুদ্রা বের করে এনে দিলেন কিশোরের হাতে, 'দেখো তো, কিছু বুঝতে পারো কিনা?'

ভাল করে দেখে মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, কিছু বুঝতে পারলাম না!'

হাসলেন ডিটেকটিভ। 'বেশ, সূত্র দিচ্ছি। এগুলো জাল। বাজারে ছাড়া হয়েছে। এবং রূপার তৈরি।'

চকিতে বুঝে ফেলল কিশোর। হাঁ করে তাকিয়ে রইল সাইমনের দিকে।

'আপনি বলতে চাইছেন, রূপার মোহর চুরি করে নিয়ে গিয়ে মুদ্রা বানাচ্ছে? আমাদেরগুলো সে-জন্যেই নিতে এসেছিল?'

মাথা ঝাঁকালেন সাইমন, 'এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই।'

রবিন বলল, 'তার মানে জাল মুদ্রায় ছেয়ে যাচ্ছে বাজার?'

'এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, আসল কথায় আসি, যে জন্যে ডেকেছি। বাড়ি এসে কিমের কাছে শুনলাম, কয়েকবার নাকি ফোন করেছিলেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। আমাকে খুঁজেছেন। কোন এক লোক নাকি হাসপাতালে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। আমাকে না পেয়ে তোমাদের নিয়ে গেছেন চীফ। তোমরা সব জানো।'

সব কথা খুলে বলল কিশোর আর রবিন। কথা বলতে গিয়ে বার বার লোকটা লোকটা করতে ভাল লাগে না, তাই একটা নাম দিয়ে ফেলল রবিন 'মিস্টার স্প্যানিশ'।

বেহুঁশ অবস্থায় লোকটা তাঁর নাম করেছে, শুনে ভুরু কোঁচকালেন ডিটেকটিভ। কার্স অভ দি ক্যাবিবিসের ব্যাপারে কিছু বলতে পারলেন না।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

ফেরার পথে মুসাদের বাড়ির খাদে পাওয়া মোহরের কথা ভেবে বলল কিশোর, 'পুরানো মুদ্রার ব্যাপারে যতটা পারা যায় জেনে নেয়া উচিত আমাদের। প্রথম কবে মুদ্রা তৈরি হয়েছিল জানো নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'খ্রীষ্টের জন্মের সাতশো পঞ্চাশ বছর আগে, এশিয়া মাইনরে। চীনারাও ধাতব মুদ্রার ব্যবহার শুরু করেছিল বহু শত বছর আগে। সে-কালেও মুদ্রা জাল হওয়ার ভয় ছিল। তাই আসল কিনা সেটা পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বের করে ফেলেছিল তারা। কেউ কেউ এতটাই দক্ষ হয়ে গিয়েছিল, শুধু দুই আঙুলে ধরেই বলে দিতে পারত আসল না নকল।'

কিশোর বলে উঠল, 'ভাল কথা মনে করেছ। রকি বীচেও একজন চীনা আছে, পুরানো মুদ্রা জমানো যার শখ।'

'হু চিনের কথা বলছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সময় করে তার কাছে একবার যাওয়া দরকার। মোহরের ব্যাপারে অনেক কিছু বলতে পারবে বুড়ো।'

ইয়ার্ডে ফিরতেই দেখল মাল নিয়ে হাজির হয়েছেন রাশেদ পাশা। তাঁর সঙ্গে বোরিস আর রোভারও ব্যস্ত। কিশোরকেও হাত লাগাতে হলো। রবিন গেল বাড়িতে একটা জরুরী কাজ সেরে আসতে। সুতরাং মুসাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে আবার বেরোতে বেরোতে অনেক দেরি হয়ে গেল।

ফার্মহাউসে যখন পৌঁছল ওরা, অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। মুসা কোথায় জিজ্ঞেস করতে তার আম্মা বললেন, 'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সারাক্ষণ গিয়ে বসে থাকছে নদীর পাড়ে। কি আছে ওখানে আল্লাহই জানে! বিকেল বেলা এসে একটা তাঁবু নিয়ে গেছে। রাতেও নাকি থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করাতে বলল, বাড়ির এত কাছে বন আর পাহাড় থাকতে ক্যাম্প করার সুযোগ ছাড়বে কেন?'

কিশোর আর রবিনের দিকে তাকালেন। 'আসল ব্যাপারটা কি, বলো তো?'

এখুনি গুপ্তধনের কথা বলতে চায় না কিশোর। এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বলল, 'গিয়ে দেখি।'

বেকায়দা প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে রবিনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সে। খাদের দিকে রওনা হলো।

মাঠ পেরিয়ে যেতে হয়। বাতি নেই এদিকটায়। তবে চাঁদ আছে। কিছুদূর এগোতে গাছের জটলার কিনারে ধূসর রঙের তাঁবুটা চোখে পড়ল ওদের।

'তাঁবুতে বাতি নেই কেন?' হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর। 'এত জলদিই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?'

'কি জানি! হয়তো মাটি খুঁড়ছে।'

'তাহলে শব্দ নেই কেন? সারাদিন পাহারা দিয়েছে ওখানে, নিশ্চয় কিছু ঘটেছে।'

'ঘটতে পারে। শুঁটকির ভয়ে গিয়ে বসে থাকতে পারে।' হাসল রবিন। 'শব্দ কোরো না। চমকে দেব।'

নরম ঘাস মাড়িয়ে নিঃশব্দে এগোল দুজনে। খাদের কাছে আসতে ঠং করে একটা শব্দ হলো। পাথরে কোদালের কোপ লেগেছে যেন।

সতর্ক হয়ে গেল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'এই অন্ধকারে মাটি খুঁড়ছে মুসা? বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'কিন্তু খোঁড়ার শব্দই! শোনো!'

থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল দুজনে। দৃষ্টি যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে তাকাল খাদের দিকে। একটা ছায়ামূর্তিকে দেখল নুয়ে পড়ছে, সোজা হচ্ছে, আবার নুয়ে পড়ছে।

'মুসাই, তাই না?' রবিন বলল। 'কারও চোখে পড়ার ভয়ে অন্ধকারেই খুঁজছে।'

'মনে হয়।' চিৎকার করে ডাকল কিশোর, 'অ্যাই, মুসা!'

দ্রুত এগোল দুজনে। সামনে এক জায়গায় মাটি সামান্য ফুলে আছে। এ পাশ থেকে খাদটা দেখা যায় না। দৌড়ে জায়গাটা পেরিয়ে এল ওরা। খাদের মধ্যে আর কাউকে দেখতে পেল না।

'জবাব দিল না কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয় শোনেনি।'

খাদের পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। নিচে কেউ নেই। নতুন খোঁড়া একটা গর্তের পাশে একটা কোদাল পড়ে আছে।

'মুসা!' চিৎকার করে ডাকল আবার কিশোর।

জবাব নেই।

কয়েক গজ দূরের তাঁবুটার দিকে তাকাল ওরা। কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে নিয়ে সেদিকে এগোল কিশোর। তাঁবুতে ঢুকল। হেসে বলল, 'মুসা, ঘাপটি মেরে থাকার ভান করে লাভ নেই। বেরোও। এইমাত্র তোমাকে মাটি খুঁড়তে দেখেছি...'

মাটিতে পড়ে থাকা একটা দেহের ওপর আলো পড়ল।

লাফিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর।
পড়ে থাকা দেহটা মুসার। বেহুঁশ হয়ে আছে সে।

সাত

'রবিন, জলদি পানি নিয়ে এসো!'

তাঁবুর কোণে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে একটা ছোট বালতিও রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে দৌড় দিল রবিন। পাহাড়ের নিচে পানি আছে।

মুসার মাথার কাছে বসল কিশোর।

পানি নিয়ে ফিরে এল রবিন। দুজনে মিলে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা শুরু করল। মুসার চোখে-মুখে পানি দিতেই চোখ মেলল সে। বিড়বিড় করতে করতে উঠে বসল।

'আমি কোথায়?' মাথার পেছনে হাত লাগতে গুঙিয়ে উঠল। 'উফ্, ব্যথা!'

'কি করে হলো?' জানতে চাইল কিশোর। 'খাদের মধ্যে একজনকে মাটি খুঁড়তে দেখলাম। আমরা ভেবেছি তুমি। এখন বুঝতে পারছি অন্য কেউ।'

'কে জানি বাড়ি মেরেছে মাথায়! দেখো, গোলআলুর মত ফুলে গেছে!'

'কে মারল?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন। তার মাথায়ও গোলআলু বানিয়ে দিতাম। সারাদিন মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমরাও আসো না। ভাবলাম, একটু জিরিয়ে নিই। তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। খুট করে শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার হয়ে গেছে। তাঁবুতে কেউ ঢুকছে বুঝতে পারলাম। মনে করলাম তোমরা এসেছ। উঠে বসে ডাকলাম তোমাদের। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়।'

'হুঁ,' রবিন বলল, 'ওকেই মাটি খুঁড়তে দেখেছি। নিশ্চয় বেশি দূরে যায়নি এখনও। দাঁড়াও, দেখে আসি।'

'সাবধানে যাবে,' কিশোর বলল। 'দেখো, তুমিও মুসার মত বেহুঁশ হয়ো না।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে খাদের পাশ কাটিয়ে বেড়ার দিকে এগোল রবিন। চাঁদের আলোয় চারপাশটা দেখল। নির্জন। নড়াচড়া নেই কোথাও। রহস্যময় লোকটা এত দ্রুত উধাও হলো কি করে ভেবে অবাক লাগল।

হতাশ হয়ে তাঁবুতে ফিরে এল সে। 'নাহ্, কিচ্ছু দেখলাম না! চলো, খাদের মধ্যে কি আছে দেখি।'

খাদের একেবারে পাড় ঘেঁষে খোঁড়া হয়েছে নতুন একটা গর্ত।

'কেউ সম্ভবত কোন জিনিস এনে লুকিয়েছিল এখানে,' কিশোর বলল, 'তুলে নিতে এসেছিল। পেল কিনা বুঝতে পারছি না।'

'জিনিসগুলো কি? মোহর?' রবিনের প্রশ্ন।

'হতে পারে।'

'পেয়ে থাকলে তো নিয়েই গেছে, আর আসবে না। কিন্তু যে ভাবে পালাতে হলো তাকে, তাতে মনে হয় না সব নিতে পেরেছে। তাহলে আবার আসবে। সুতরাং আজ রাতে পাহারা দেয়া উচিত আমাদের।'

অন্য দুজনও একমত হলো।

'একজন একজন করে দেব,' কিশোর বলল। ঘড়ি দেখল। 'এগারোটা বাজে। একটা পর্যন্ত দেব আমি। তারপর তোমাদের কাউকে তুলে দেব। তাঁবুতে যাও। ঘুমাওগে।'

'আমাকেই ডেকো,' রবিন বলল। 'মুসা মাথায় বাড়ি খেয়েছে, একটা লম্বা ঘুম দরকার। আমি তিনটা পর্যন্ত দেব। তারপর দরকার হলে ডাকব ওকে।'

পাহারায় বসল কিশোর।

একটা বেজে গেল, কিছুই ঘটল না। রবিনকে ডেকে দিল সে।

তিনটার পরেও আরও কিছুক্ষণ বসে রইল রবিন। কেউ এল না। মুসাকে ডেকে দিয়ে ঘুমাতে গেল সে।

সকালে সূর্য ওঠার পর তাঁবুতে ফিরে এল মুসা। বিড়বিড় করতে লাগল, 'অহেতুক সময় নষ্ট করলাম। যা নেয়ার নিয়ে গেছে ব্যাটা। আসবে কেন? গেল আমার গুপ্তধন!'

মুসাদের বাড়িতে নাস্তা করতে যাওয়ার আগে তদন্ত করার জন্যে খাদে নামল ওরা। গর্তের ধারের আলগা মাটিতে তাজা জুতোর ছাপ দেখতে পেল, যেটা ওদের কারও নয়। এমনকি আগের বার গর্তের ধারে যে জুতোর ছাপ দেখেছিল, তার সঙ্গেও মেলে না। এগুলো অন্য রকমের, তার মানে অন্য কেউ খুঁড়তে এসেছিল! নাকি অন্য জুতো পায়ে দিয়ে এসেছিল? না, তা হতে পারে না, সাইজও আলাদা। একজনের পা ছোট, একজনের বড়। দুদিন দুজন এসেছিল। একই দলের লোক হতে পারে।

খাদের ওপরে উঠে ধুলোয় ঢাকা পায়ে চলা পথ ধরে বেড়ার দিকে এগিয়েছে ছাপগুলো। কয়েকশো গজ পর্যন্ত সেগুলোকে অনুসরণ করে এল ওরা। মেইন রোডের কাছে এসে শেষ হয়েছে। রাস্তার ধারে গাড়ির চাকার দাগ।

'এখানে গাড়ি রেখে গিয়েছিল লোকটা,' কিশোর বলল। 'মুসাকে বেহুঁশ করে খাদে নেমেছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে খাদ থেকে উঠে দৌড়ে এসে গাড়িতে করে পালিয়েছে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে বলল, 'মিস্টার ফ্লেচারকে জানানো দরকার। কাগজে পায়ের ছাপের নকল এঁকে নিয়ে যাব।'

'এক কাজ করো,' রবিন বলল, 'তুমি একাই যাও। আমি আর মুসা থাকি, আরও খোঁড়াখুঁড়ি করি।'

মাথা দোলাল কিশোর, 'ঠিক আছে, থাকো। শহরে গেলে হু চিনের সঙ্গেও দেখা করে আসব। মুসা, তোমার মোহরগুলো দাও তো। প্রয়োজন মনে করলে বুড়োকে দেখাব।'

পকেট থেকে বের করে দিয়ে সাবধান করে দিল মুসা, 'কোথায় পেয়েছ বোলো না কিন্তু। খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে সারা শহরের লোক শাবল-কোদাল নিয়ে ছুটে আসবে এখানে।'

'জানানোর কাজটা শুঁটকিও করে দিতে পারে।'

'পারে,' রবিন বলল, 'তবে মনে হয় এখনও কাউকে জানায়নি। লোক আসা আরম্ভ হয়ে যেত তাহলে এতক্ষণে। তা ছাড়া সে কি করে জানবে আমরা এখানে গুপ্তধন খুঁজছি?'

'লুকিয়ে থেকে, আড়াল থেকে আমাদের আলোচনা শুনে।'

নাস্তার পর শহরে রওনা হয়ে গেল কিশোর। থানায় এসে চীফের সঙ্গে দেখা করল। জুতোর ছাপের নকল দিয়ে কিছু বের করা গেল না, রেকর্ড ফাইলে পাওয়া গেল না কিছু।

হেসে জিজ্ঞেস করলেন চীফ, 'কোন কেস?'

'হতে পারে। এখনও জানি না।'

থানা থেকে বেরিয়ে হু চিনের দোকানে এল কিশোর। বৃদ্ধ চীনা একজন ভদ্রলোক। হেসে স্বাগত জানালেন কিশোরকে। বললেন, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? খুশি হলাম। বোসো।'

'মিস্টার চিন, আপনি একজন মুদ্রা বিশেষজ্ঞ, তাই পুরানো মুদ্রার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি আপনার সঙ্গে।'

ভদ্রতা করে বললেন চিন, 'আমি আর তেমন কি জানি। মুদ্রার ব্যাপারে জানার কোন শেষ নেই। খুব কম জানি আমি, খুবই কম। তবে তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব। বলো কি জানতে চাও?'

পকেট থেকে মোহর দুটো বের করে দিল কিশোর। 'দেখুন তো, এগুলো আসল নাকি?'

হাতের তালুতে নিয়ে মোহর দুটো দেখতে লাগলেন চিন। আরও ভাল করে দেখার জন্যে নিয়ে গেলেন জানালার কাছে বেশি আলোতে।

'হ্যাঁ,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'দুষ্প্রাপ্য জিনিস। পাইন ট্রী শিলিংটা আমেরিকান। দ্বিতীয়টা না দেখে বলতে পারব না।'

ড্রয়ার থেকে একটা ক্যাটালগ বের করে পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন তিনি।

'এই যে পাওয়া গেছে, ছবি। হগ আইল্যান্ডে তৈরি হয়েছিল, ষোলোশো বিশ সালে। এর নাম হগ কয়েন।'

'হগ আইল্যান্ডটা কোথায়?'

'এখনকার বারমুডা। পুরানো নাম ছিল হগ আইল্যান্ড। এক সময় বুনো শুয়োরের ছড়াছড়ি ছিল ওখানে, সে-জন্যেই এই নাম। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, মোহরগুলো কোথায় পেয়েছ?'

'রকি বীচের কাছে এক মাঠে,' দায়সারা জবাব দিল কিশোর। 'আমি শিওর না, তবে আরও থাকতে পারে ওখানে। এমনও হতে পারে অন্য কোনখান থেকে চুরি করে এনে ওখানে পুঁতে রাখা হয়েছে।'

'চুরি হয়ে থাকলে,' মোহরগুলো দেখতে দেখতে বললেন চিন, 'কোন নিউমিজম্যাটিস্টের কাছ থেকে হয়েছে।'

'মুদ্রা সংগ্রাহকের কথা বলছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন চিন। 'তা ছাড়া আর কারও কাছে এত দুষ্প্রাপ্য মোহর

থাকার কথা নয়। দামী জিনিস।'

'আপনি তো মুদ্রা সংগ্রহ করেন, তাই না?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন চিন। 'করি, তবে শুধু চীনা মোহর। রকি বীচে সব ধরনের মুদ্রা সংগ্রহ করে মাত্র দুজন—জে অ্যানসন আর রস ডুগান। ওদের কাছে যাও, ওরা সাহায্য করতে পারবে তোমাকে।'

'যাব।'

মোহরগুলো কিশোরকে ফিরিয়ে দিয়ে চিন বললেন, 'এগুলো আবিষ্কারের পেছনে নিশ্চয় কোন কাহিনী আছে?' মিটিমিটি হাসছে তাঁর চোখ।

'খুব শীঘ্রি সব জানাব আপনাকে, মিস্টার চিন,' হেসে বলল কিশোর। 'আপাতত একটা ব্যাপারে সাবধান করছি; দেখবেন, কেউ না আপনার মোহরগুলো চুরি করে নিয়ে যায়। রকি বীচে মোহর চোরের উৎপাত শুরু হয়েছে।'

আট

'আমার মোহর নিরাপদেই আছে, থ্যাংক ইউ,' জে অ্যানসন বললেন।

চিনের কাছ থেকে বেরিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কিশোর। টকটকে লাল মুখ, হাসিখুশি মানুষ। ব্যবসা করতেন। কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন এখন। কিশোরের মোহর দুটো দেখে সাংঘাতিক আকৃষ্ট হলেন, তখুনি কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন।

'সরি, মিস্টার অ্যানসন, বিক্রি করতে আনিনি। আমার ধারণা, কারও ব্যক্তিগত সংগহ থেকে এগুলো চুরি হয়েছে।'

'ও, এগুলোর মালিককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছ? গুড। আমার সংগ্রহ থেকে চুরি হয়নি। কাল অবশ্য অপরিচিত একটা লোক এসেছিল, দেখানোর জন্যে অনুরোধ করেছে। চেহারাটা কেমন আজব। কালো চশমা পরে ছিল সারাক্ষণ।'

'কেন দেখতে চায় জিজ্ঞেস করেননি?'

'করেছি। বলল, মোহর সংগ্রহের নেশা আছে। পছন্দ হলে কিনবে। আমি তাকে বললাম, কোনটাই বেচব না। পেলে বরং কিনব।'

'দেখিয়েছেন?'

'না।'

'নাম কি বলল?'

'বেরিং।'

অ্যানসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। রস ডুগানের বাড়ি চলল।

ডক্টর রস ডুগান একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। বয়েসের ভারে সামান্য কুঁজো হয়ে গেছেন। চুল সব সাদা। ভারী লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে পিটপিট করে তাকালেন কিশোরের দিকে। বললেন, 'হঠাৎ করেই দেখি পুরানো মুদ্রার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল লোকে। কালও একজন এসেছিল আমার মুদ্রাগুলো দেখার

জন্যে।'

'তাই নাকি?' অবাক হওয়ার ভান করল কিশোর। 'কিনতে চাইল, তাই না?'

'চাইল। কিন্তু সে যে জিনিস চায়, সেটা আমার কাছে নেই। লোকটার নাম বেরিং। তা তুমিও কি কিনতে চাও নাকি?'

'না না, আমার অত টাকা কোথায়। দুটো দুষ্প্রাপ্য মোহর আমার হাতে এসে পড়েছে। মনে হয় কারও সংগ্রহ থেকে চুরি গেছে এগুলো। আপনার কোন মোহর চুরি যায়নি তো?'

হাসলেন প্রফেসর। 'না। দশ মিনিট আগেও দেখে এলাম। সব ঠিক আছে।'

মোহরের ব্যাপারে জানতে চাইল কিশোর।

প্রফেসর বললেন, 'মোহর নিয়ে গবেষণা করতে গেলে শুধু মোহরই নয়, অনেক কিছু জানা যায়—ইতিহাস, ভূগোল, নানা দেশের নানা জাতের মানুষের সামাজিকতা, আচার-আচরণ। প্রাচীন অনেক শাসক ছিল যারা তাদের শাসনকালের ইতিহাস মুদ্রায় ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। এ জন্যে একজন রোম সম্রাটকে দশ হাজার বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা বানানোর প্রয়োজন পড়েছিল।'

হেসে ফেলল কিশোর। 'নিজেকে নিশ্চয় খুব ভালবাসত সম্রাট।'

আরও কিছু কথার পর প্রফেসর বললেন, 'আমার সংগ্রহ অত দামী নয়। কোন চোর এগুলোতে আগ্রহী হবে না। তবে চুরি গেলে তোমাকে জানাব।'

'ইদানীং কম দামী মোহরের দিকেও নজর পড়েছে চোরের।'

বাড়ি ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে নিল কিশোর। তারপর চলল মুসাদের ফার্মহাউসে।

খাদের পাশে তাঁবুর ছায়ায় বসে আছে মুসা আর রবিন। দুপুরে বাড়ি গিয়ে খেয়ে এসেছে।

যা যা জেনেছে, বন্ধুদের বলল কিশোর।

রবিন বলল, 'কিনতে যাওয়ার ছুতোয় অ্যানসন আর ডুগানের কাছে দামী কিছু আছে কিনা দেখতে যায়নি তো?'

'যেতে পারে,' কিশোর বলল। 'লোকটার নাম বেরিং। তাকে খুঁজে বের করতে হবে এখন আমাদের। মোহরের ব্যাপারে আগ্রহী কেন জানতে হবে।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'একটা ব্যাপারে এখন শিওর—আমাদের মোহরগুলো রকি বীচের কারও সংগ্রহ থেকে চুরি যায়নি। আছেই মোটে তিনজন। তাদের মোহর ঠিক আছে।'

কিশোর যাওয়ার পর থেকে খুঁড়েছে রবিন আর মুসা। আর মোহর পায়নি। আরেকটা খবর জানাল, গাছের আড়ালে একটা লোককে উঁকি মারতে দেখেছে বলে মনে হয়েছিল রবিনের। দেখতে গিয়ে আর লোকটাকে পায়নি। তার সন্দেহ, শুঁটকি টেরি হবে। আড়াল থেকে নজর রাখছিল।

'কিশোর, গাড়ি নিয়ে কাল সন্ধ্যায় সে-ই আসেনি তো মাটি খুঁড়তে?' মুসার প্রশ্ন।

'কি জানি,' হাত ওল্টাল কিশোর, 'মনে হয় না। একা এসে তোমাকে পিটিয়ে বেহুঁশ করে অন্ধকারে মাটি খুঁড়বে···নাহ্, শুঁটকিকে দিয়ে সম্ভব নয়। ওর এত সাহস

নেই। ও পারে কেবল বাগড়া দিতে।'

মোহর দুটো মুসাকে ফিরিয়ে দিল সে। বলল, 'কালো চশমা পরা ওই বুড়োটাকে খুঁজে বের করতে পারলে হয়তো অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।'

'কি করে বের করবে ওকে?'

'জানি না। দেখা যাক।'

মাটি খোঁড়া চালিয়ে গেল ওরা। আর বেরোচ্ছে না মোহর। বিকেল শেষ হয়ে এল। মুসা ঘোষণা করল, তার খিদে পেয়েছে। আর একটা কোপ দেয়ারও শক্তি নেই।

সুতরাং মাটি কোপানো বাদ রেখে বাড়ি রওনা হলো ওরা। খাওয়া সেরে ফিরে আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে গেল।

তাঁবুর পাশে বসে কথা বলতে লাগল। ঠিক করল, সে-রাতেও পাহারা দেবে পালা করে। আগে কে দেবে সেটা নিয়ে আলোচনা করছে, এই সময় খপ করে কিশোরের হাত চেপে ধরল রবিন। হাত তুলে দেখাল, 'ওই দেখো! কে যেন আসছে!'

কিশোর আর মুসাও দেখল, নেচে নেচে এগিয়ে আসছে একটা আলো। মাঠের ওপর দিয়ে টর্চ হাতে আসছে কেউ।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'এদিকেই তো আসছে!'

'শুঁটকি না তো?' রবিন বলল।

কিছুটা অবাক হয়েই তাকিয়ে আছে কিশোর। 'দেখা যাক, আসুক আগে!'

নয়

খুব অবাক হলো ওরা। এ সময় এখানে তাঁকে আশা করেনি। কল্পনাও করেনি আসবেন।

গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন!

ওদের অবাক করে দিতে পেরে মজা পাচ্ছেন ডিটেকটিভ। আসার কারণ জানালেন, 'ইয়ার্ডে ফোন করেছিলাম। মিসেস পাশা বললেন, রবিনকে নিয়ে কিশোর গেছে মুসাদের বাড়িতে। দুদিন ধরেই নাকি রাতে থাকছ। মুসাদের বাড়িতে ফোন করলাম। মিসেস আমান বললেন, ঘরে থাকো না তোমরা। ক্যাম্প করে রাতদিন পড়ে থাকছ বনের মধ্যে। কৌতূহল হলো। নিশ্চয় কিছু করছ। দেখার ইচ্ছে হলো। তাই নিজেই চলে এলাম সারপ্রাইজ দিতে।' মিটিমিটি হাসছেন তিনি। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করছ এখানে?'

'মোহর খুঁজছি, স্যার,' বলল মুসা।

'মোহর!'

'হ্যাঁ। গুপ্তধন।' সংক্ষেপে সব কথা জানাল মুসা। পকেট থেকে মোহর দুটো বের করে দেখাল সাইমনকে।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করলেন ডিটেকটিভ। 'জাল মুদ্রা··· মোহর···'

কিশোর বলল, 'আমার মনে হয়, শুধু কৌতূহল মেটাতে এখানে আসেননি আপনি, স্যার। আরও কোন কারণ আছে। ঠিক না?'

মাথা ঝাঁকালেন সাইমন। 'হ্যাঁ। হাসপাতালে গিয়েছিলাম মিস্টার স্প্যানিশের সঙ্গে দেখা করতে। চিনতে পারল না আমাকে। আমিও চিনলাম না। আগে দেখিনি।'

চুপ করে আছে কিশোর। সাইমনের কথা শেষ হয়নি এখনও। আরও কিছু বলবেন।

'শোনো,' বললেন তিনি, 'লোকটার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে তোমাদের। কি ভাবে রাখবে সেটা তোমরা জানো। আমি একটা জরুরী কেসের কাজে লস অ্যাঞ্জেলেস যাব। মোহর রহস্য।'

'মুদ্রা!'

'হ্যাঁ। ট্রেজারির একজন অফিসার এসে ধরল, কেসটা নিতে বাধ্য করে ছাড়ল আমাকে। সঙ্গে একজন বিদেশী। ওই ভদ্রলোক বলল, তার সরকার একটা ব্যাপারে অসুবিধেয় পড়ে গেছে। বছর দুই আগে কয়েক হাজার সোনার মোহর আমেরিকায় পাঠায় তার সরকার। টাকা ঋণ নিয়েছিল, মোহর দিয়ে শোধ করতে চেয়েছে।'

কিশোর বলল, 'আমি তো জানতাম সোনার ইঁট দিয়েই সচরাচর লেনদেন করা হয়।'

'সাধারণত তাই করা হয়,' সাইমন বললেন। 'কিন্তু রাজনৈতিক গোলমাল দেখা দেয় সে-দেশে হঠাৎ করে, তাই কর্তৃপক্ষ ভাবলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোনাগুলো সরিয়ে দেয়া দরকার, নইলে লুট হয়ে যেতে পারে। তাই যে ভাবে যে অবস্থায় ছিল, সে-ভাবেই দেশ থেকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। অল্প কিছু ইঁট ছিল, বেশির ভাগই মোহর। জাহাজে করে আমেরিকায় পাঠানো হলো ওগুলো।

'পথে ঝড়ের কবলে পড়ল জাহাজটা। ডুবল না, কিন্তু জখম হলো খুব। ধুঁকতে ধুঁকতে কোনমতে এসে পৌঁছল স্যান ডিয়েগো বন্দরে। মেরামত না করে আর চালানো যাবে না। ক্যাপ্টেন ঠিক করলেন, পরদিন সোনাগুলো বন্দরের কোন ব্যাংকের ভল্টে রেখে দেবেন। জাহাজ মেরামত হলে নিয়ে যাবেন জায়গামত। কিন্তু পরদিন দেখা গেল, সমস্ত সোনা গায়েব।'

'সব?' রবিনের প্রশ্ন।

'সব। এমনই গায়েব হলো, আজ পর্যন্ত ওসব সোনার ইঁট কিংবা মোহরের একটাও আর চোখে পড়েনি কারও। কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি।'

'গলিয়ে আমেরিকান মুদ্রায় রূপান্তরিত করে ফেলা হয়ে থাকতে পারে,' কিশোর বলল।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন সাইমন। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, 'মনে হয় না। সোনার মোহর সহজেই চোখে পড়ে। সাধারণ মুদ্রার মত বাজারে ব্যবহার করা যাবে না। তবে ভাল একটা আইডিয়া দিয়েছ। গলিয়ে

ফেলে অন্য কিছু করা যেতে পারে। সে-পথেই খুঁজব এবার।

'কাল ভোরেই লস অ্যাঞ্জেলেস চলে যাচ্ছি। কখন ফিরব জানি না। মিস্টার স্প্যানিশের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব তোমাদের ওপর রইল।'

'আপনার কি মনে হয় মোহর গায়েবের সঙ্গে লোকটার কোন যোগাযোগ আছে?'

'জানি না। থাকতেও পারে, আবার অন্য কোন কারণেও আমার খোঁজ করতে এসে থাকতে পারে সে। তার স্মৃতিশক্তি ঠিক না হলে আর জানতে পারব না।'

কথা শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সাইমন।

অনেক রাত পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল কিশোররা। রাতে পালা করে পাহারা দিল। কিন্তু কিছু ঘটল না। কেউ এল না মাটি খুঁড়তে।

সকাল বেলা কিশোর বলল, সে আর রবিন যাবে হাসপাতালে মিস্টার স্প্যানিশের সঙ্গে দেখা করতে।

মুসা বলল, কোনমতেই সে ক্যাম্প ছেড়ে নড়বে না। গুপ্তধন থেকে থাকলে সেটাতে হাত দিতে দেবে না কাউকে।

হাসপাতালে নার্স জানাল, অনেক উন্নতি হয়েছে মিস্টার স্প্যানিশের। 'এখনও স্মৃতি ফিরে আসেনি বটে, তবে শরীর ঠিক হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া যায়।'

বিছানায় বসে আছে লোকটা। দুই গোয়েন্দাকে চিনতে পারল। ওদের দেখে হাসল। বলল, 'আবার এসেছ, অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আমি কে সেটা জানতে আমাকে সাহায্য করবে তোমরা।'

'করব, মিস্টার স্প্যানিশ,' রবিন বলল।

অবাক হলো লোকটা। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'মিস্টার স্প্যানিশ! আমার নাম মিস্টার স্প্যানিশ?'

হেসে উঠল কিশোর। 'আপনার নাম জানি না তো, নাম না থাকলে ডাকব কি করে? তাই একটা বানিয়ে নিয়েছি। মনে হয় আপনি স্পেনেরই লোক, কথায় সে-দেশের টান। আপনার বাড়ি কোথায় তা-ও মনে করতে পারছেন না, তাই না?'

হাসি চলে গেল লোকটার চোখ থেকে। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'জানি না। হয়তো কোনদিনই আর জানতে পারব না, যদি রোগ ভাল না হয়। কোথা থেকে এসেছি, কি আমার পরিচয়, চিরকাল একটা রহস্য হয়েই থাকবে!'

'আগের বার যখন দেখা করতে এসেছিলাম,' রবিন বলল, 'একটা কথা মনে হয় বুঝতে পেরেছিলেন। আবার বলছি, দেখুন তো, মানে বুঝতে পারেন কিনা? কার্স অভ দা ক্যারিবিস অর্থ কি?'

ভঙ্গি দেখে মনে হলো স্মৃতির পাতা হাতড়ে বেড়াচ্ছে মিস্টার স্প্যানিশ। বিড়বিড় করল, 'কার্স অভ দি ক্যারিবিস!...নাহ্, কিছু মনে করতে পারছি না।'

এইবার আর অভিনয় করছে বলে মনে হলো না কিশোরের।

নার্স এসে বলল, ওদের ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়েছে।

'এক মিনিট,' নার্সকে অনুরোধ করল কিশোর। মিস্টার স্প্যানিশকে জিজ্ঞেস করল, 'হাসপাতাল থেকে আপনাকে ছেড়ে দিলে কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল লোকটা। 'কি জানি! কোন জায়গা তো চিনি না...'

'কিছু মনে না করলে আপাতত আমাদের বাড়িতে উঠতে পারেন। আপনার পরিচয় জানার চেষ্টা করব আমরা। আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ পাওয়া গেলে তাদের খবর দেব। কি বলেন?'

মিস্টার স্প্যানিশ জবাব দেয়ার আগেই নার্স বলল, 'এটাই সবচেয়ে ভাল হবে। তোমরাই নিয়ে যাও। নইলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবার কোথায় গিয়ে কি বিপদে পড়বে, ঠিক নেই।'

দুপুরের পর হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা হবে। তখন এসে নিয়ে যাবে, কথা দিয়ে, রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর।

বারান্দায় বেরিয়ে রবিন বলল, 'নজর রাখার চমৎকার একটা উপায় বের করেছ। আন্টি এখন গোলমাল না করলেই হয়।'

'মেরিচাচী? চাচীকে রাজি করাতে অসুবিধে হবে না।'

দশ

সুতরাং দুপুরের পর এসে মিস্টার স্প্যানিশকে ইয়ার্ডে নিয়ে গেল কিশোর আর রবিন।

লোকটার নোংরা পোশাক দেখেই নাক কুঁচকালেন মেরিচাচী। কিশোরকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠালেন নতুন কাপড় কিনে আনতে।

রবিনকে সঙ্গে নিয়ে তার গাড়িতে করে বাজারে গেল কিশোর। কাপড় নিয়ে ফিরে আসার পর এমন একটা জিনিস বের করে দিলেন মেরিচাচী, রীতিমত চমকে দিলেন।

একটা সোনার মোহর! এক পিঠে একজন মহিলার মুখ খোদাই করা।

'ময়লা কাপড়গুলো ধুতে নিয়ে গিয়েছিলাম,' চাচী বললেন। 'প্যান্টের একটা গোপন পকেটে পেয়েছি এটা।'

জিনিসটা তখুনি নিয়ে গিয়ে মিস্টার স্প্যানিশকে দেখাল কিশোর।

চিনতে পারল না লোকটা।

'হু চিনের কাছে যাব,' রবিনকে বলল কিশোর। 'চলো।'

'এখনই?'

'এখনই। আর কোন কাজ আছে?'

মাথা নাড়ল রবিন। নেই।

জানালার কাছে আলোতে নিয়ে গিয়ে গভীর ভাবে মোহরটা পরীক্ষা করে দেখলেন হু চিন। চিনতে না পেরে অবাক হলেন। ড্রয়ার খুলে রেফারেন্স বই বের করে পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কিন্তু কোন মোহরের ছবিই এটার সঙ্গে মিলল না।

'আজব ব্যাপার!' বিড়বিড় করতে লাগলেন বৃদ্ধ। 'অদ্ভুত ব্যাপার! কোন রেকর্ডই নেই এটার!'

দুই আঙুলে আলতো করে তুলে ধরে ছেড়ে দিলেন টেবিলের ওপর। ঘাড় কাত করে শব্দ শুনে আপনমনে বললেন, 'খাঁটি সোনা। কিন্তু সতেরোশো পঁচিশ সালের এই স্প্যানিশ মোহরের কোন রেকর্ড নেই কেন আমার বইতে?' মুখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকালেন। 'এক কাজ করো। জে অ্যানসনের কাছে চলে যাও। তিনি হয়তো কিছু বলতে পারবেন। কিছু জানতে পারলে দয়া করে আমাকে জানিয়ে যেয়ো। কৌতূহলী হয়ে রইলাম।'

কিন্তু জে অ্যানসনও কিছু বলতে পারলেন না।

শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রফেসর রস ডুগানের কাছে মোহরটা নিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

দেখে উত্তেজিত হলেন প্রফেসর। কিন্তু তিনিও চিনতে পারলেন না। কোন তথ্য দিতে পারলেন না মোহরটার ব্যাপারে।

'মোহরটা যদি আসল হয়ে থাকে,' বললেন তিনি, 'তাহলে বলতে হবে খুবই দুষ্প্রাপ্য জিনিস। আর যতই দুষ্প্রাপ্য হয়, ততই দাম বাড়তে থাকে। এই একটা মোহরের দাম কয়েক হাজার ডলার হলেও অবাক হব না।'

দাম নিয়ে মাথাব্যথা নেই কিশোরের, তবে সে-কথা বলল না প্রফেসরকে। তার আগ্রহ, মিস্টার স্প্যানিশের সঙ্গে এই মোহরের কি সম্পর্ক, সেটা জানা। খোদাই করা মহিলাটি কে, জানতে পারলেও হয়তো সেই সূত্র ধরে এগোনো যেত।

প্রফেসরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'কোন ধরনের চিহ্ন নয়তো এটা? ছাড়পত্র জাতীয় কিছু? হয়তো এটা আদৌ মোহর নয়, টোকেন, কোন গোপন সংস্থার সদস্যদের আইডেন্টিফিকেশন ডিস্ক। সদস্য হওয়ার প্রমাণ।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। 'ঠিক বলেছ। হতে পারে।'

'তাহলে ধরে নেয়া যায় মিস্টার স্প্যানিশ সেই সংস্থার সদস্য...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

'সংস্থাটার নাম কি? কারা এর সদস্য?'

'মিস্টার স্প্যানিশ বলতে পারত। কিন্তু সে তো কিছু মনেই করতে পারে না!'

এগারো

সেদিন আর মুসাদের বাড়ি যেতে পারল না ওরা। ইয়ার্ডে আসার পর মেরিচাচী আর রাশেদ চাচা দুজনেই আটকে দিলেন কিশোরকে। কাজ চাপিয়ে দিলেন।

বাড়ি যেতে ভাল লাগল না রবিনের। গিয়ে কোন কাজ নেই, একা একা বসে থাকতে হবে। তার চেয়ে কিশোরকে সাহায্য করলে সময়ও কাটবে, সঙ্গও পাওয়া

যাবে। রয়ে গেল সে।

মিস্টার স্প্যানিশের মানসিক অবস্থার কোন উন্নতি হলো না। তার পকেটে পাওয়া সোনার মোহরের কথাও কিছু বলতে পারল না সে। কার্স অভ দা ক্যারিবিস-এর ব্যাপারে নতুন কোন রেখাপাত করতে পারল না। তবে মেরিচাচীর দায়িত্বে খেয়ে-পরে আরামেই রইল। রাশেদ পাশার সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগল তার।

পরদিন সকালে মুসাদের বাড়িতে এল কিশোর আর রবিন। দেখে খাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার আমান। কিশোর আর রবিনকে দেখে বলে উঠলেন, 'কাণ্ড দেখো। আমি ওকে বলেছিলাম খানিকটা মাটি নিয়ে গিয়ে টবগুলো ভরতে। আর ও কি করেছে দেখো।' ছেলের দিকে ফিরে বললেন, 'উদ্দেশ্যটা কি তোর, বল তো? সুড়ঙ্গ খুঁড়ছিস নাকি?'

মুসা জবাব দিল, 'কি করছি এখন বলা যাবে না তোমাকে।'

'বার বার একই কথা। কেন বলা যাবে না?'

হেসে ফেলল কিশোর।

তাকে বললেন মি. আমান, 'তুমি জানো মনে হচ্ছে? বলতে লজ্জা পাচ্ছে নাকি ও? একটা কাজে গিয়েছিলাম, তিনদিন বাড়ি আসতে পারিনি। বাড়ি ফিরে শুনলাম, গর্ত খুঁড়তে এসে নাকি ভূতে ধরেছে ওকে। দিনরাত কেবল খুঁড়েই চলেছে। বাড়িও যায় না। তাঁবু খাটিয়ে এখানেই থাকে। প্রথম প্রথম খাওয়ার জন্যে বাড়ি গেছে, এখন আর তা-ও যায় না। টিনের খাবার নিয়ে এসেছে। করছেটা কি? জবাব দিচ্ছ না কেন তোমরা?'

'জেনে কি করবে?' জানতে চাইল মুসা।

'আরি, গর্ত করে করে তুই আমার জায়গার বারোটা বাজিয়ে দিবি, আমি জানতেও চাইব না?'

রেগে গেল মুসা, 'তাহলে শোনো, গুপ্তধন খুঁজছি আমরা!'

'গুপ্তধন!' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন মি. আমান। এক এক করে তাকালেন কিশোর আর রবিনের মুখের দিকে। মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে গুপ্তধন আছে কে বলল তোকে?'

'কেউ বলেনি। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে দুটো মোহর পেয়েছি। মনে হলো, আরও থাকতে পারে। সে-জন্যেই খুঁড়ছি।'

পকেট থেকে মোহর দুটো বের করে বাবার হাতে দিল মুসা।

মুদ্রা দুটো দেখতে দেখতে মুখের ভাব বদলে গেল মি. আমানের। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত! সত্যি এখানে মাটি খুঁড়ে পেয়েছিস?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' মুসার হয়ে জবাব দিল রবিন, 'একটা ও পেয়েছে, আরেকটা আমি।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন মি. আমান। 'এতক্ষণে মনে হচ্ছে এ বাড়ির কোন না কোনখানে গুপ্তধন থাকতেও পারে!'

'মানে?' অবাক হলো মুসা। বাবা কি বলছেন বুঝতে পারল না।

মিস্টার আমান জানালেন, ফার্মটা কেনার পর বাড়ি মেরামত করার সময়

দেয়াল ভেঙে ফেলার পর ভাঙা জিনিসের মধ্যে একটা ছোট টিনের বাক্স পেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, দেয়ালের মধ্যে লুকানো ছিল ওটা, দেয়াল ভাঙার পর বেরিয়েছে।

'বাক্সে একটা পুরানো কাগজ পেয়েছি,' বললেন তিনি। 'তাতে বলা আছে, এ বাড়ির কোন এক জায়গায় গুপ্তধন লুকানো আছে। অবাক লাগলেও তখন বিশ্বাস করিনি। এখন মনে হচ্ছে, থাকতেও পারে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা।

মুসা জিজ্ঞেস করল বাবাকে, 'কাগজে লেখা আছে, মাঠের ধারে এই খাদের মধ্যে মাটিতে পোঁতা আছে গুপ্তধন?'

'মাঠের কথা বলেছে, তবে কোন মাঠ বলেনি। নির্দেশ আছে—ওক গাছ থেকে দশ কদম পশ্চিমে, চার কদম দক্ষিণে সাদা পাথরের দিকে এগোতে, তারপর আবার সাত কদম পুবে ছোট নদীর ধারে।

'সেই মত কিছু জায়গায় খুঁড়েও দেখেছি আমি। নদীর মুখের কাছে। অনেক সাদা পাথর আছে ওখানে। ওগুলোর কোনটাকেই নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ভেবেছি।'

সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে পড়ল মুসা। গুপ্তধন যে আছেই তাদের সীমানার মধ্যে, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ রইল না তার।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন?' কিশোর আর রবিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল সে। 'চলো, খুঁড়ি! গুপ্তধন পাওয়া যাবেই!'

ছেলেদের উত্তেজনা মি. আমানের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। বললেন, 'দাঁড়া, কাগজটা নিয়ে আসিগে।'

ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে চলে গেলেন তিনি।

বারো

কাগজ নিয়ে ফিরে এলেন মি. আমান।

ওটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। এত পুরানো হয়েছে কাগজটা, ভাঁজের জায়গাগুলো ছিঁড়ে গেছে বেশির ভাগ। কালি মুছে গিয়ে এমন অবস্থা, পড়াই যায় না প্রায়।

'অতিরিক্ত পুরানো,' কিশোর বলল। 'একশো বছরের কম না।'

'হ্যাঁ,' একমত হলেন মি. আমান, 'তবে কতটা দামী সেটাই আসল কথা।'

'যে মোহর দুটো পেয়েছি, সেগুলোর কথাই এটাতে বলা হয়ে থাকলে কাগজটা আরও বেশি পুরানো,' মুসা বলল।

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'তোমাদের বাড়িটার বয়েস একশোর বেশি হয়নি। কি বলেন, আঙ্কেল?'

'হ্যাঁ।'

মুসা বলল, 'কাগজটা অন্য কোনখান থেকে এনে এখানে রাখা হতে পারে। বাড়ির সঙ্গে কাগজের বয়েসের মিল থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই।'

'বয়েস নিয়ে তর্ক করা অর্থহীন,' মি. আমান বললেন। 'এসো, ওক গাছটা খুঁজে বের করি।'

নদীর পাড়ে এখানে একটা ওক গাছই আছে। সেটার গোড়ায় চলে এল ওরা।

'এটা থেকে দশ গজ পশ্চিমে,' কাগজ দেখে বললেন মি. আমান।

কদম মেপে এগোল মুসা।

বাবা বললেন, 'সাদা পাথর থেকে চার কদম দক্ষিণে।'

এটা মেলানো সহজ হলো না। কারণ কাছাকাছি পাথর বলতে যেটা আছে সেটা চার কদম নয়, আরও খানিকটা তফাতে।

দেরি করতে কিংবা ভাবনা-চিন্তা করতে রাজি নয় মুসা। অধৈর্য স্বরে বলল, 'চার কদম দূরেই ছিল। হয়তো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পাথর আসলে ওটাই।'

'বেশ, তা-ই নাহয় ধরলাম,' মি. আমান বললেন। 'এবার নদীর সমান্তরালে দশ কদম পুবে এগোতে হবে।'

সাত কদম এগিয়ে থামল মুসা। বাবার দিকে তাকাল।

মি. আমান বললেন, 'ঠিক ওক গাছটা বেছে নিয়ে থাকলে ওই জায়গাটাতেই গুপ্তধন থাকার কথা।'

কথা বলে সময় নষ্ট করল না মুসা। কোদাল তুলে নিয়ে কোপাতে শুরু করল। মি. আমানও শাবল তুলে নিলেন। কিশোর আর রবিনও দাঁড়িয়ে রইল না। যদিও কিশোরের মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকল—ঠিক জায়গায় খুঁড়ছে তো? নাকি অহেতুক সময় আর শক্তি খরচ করছে? পাথরটা সঠিক জায়গায় না থাকায় সে নিশ্চিত হতে পারছে না।

চারটে কোদালের কোপে চতুর্দিকে মাটি উড়তে লাগল।

আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা, 'থামো! এক মিনিট!' মাটিতে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। 'কি জানি আছে এখানে!'

অনেক টানটানি করে জিনিসটা বের করল সে। মনে করেছিল, মরচে পড়া বাক্সটাক্স হবে। কিন্তু বেরোল একটা চ্যাপ্টা পাথর। দেখতে অনেকটা বাক্সের মতই। মাটির নিচে ওটার ওপরের অংশ দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না।

'ধুর!' গুঙিয়ে উঠে পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'মনে হচ্ছে ঠিক জায়গায় খুঁড়ছি না আমরা।'

'এত তাড়াতাড়ি বোঝা যাবে না,' মি. আমান বললেন।

কিন্তু কড়া রোদের মধ্যে ঘণ্টাখানেক খোঁড়ার পরই কাহিল হয়ে পড়ল সকলে। কিশোর অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। সবার শেষে থামলেন মি. আমান। কোপানো থামিয়ে বললেন, 'পাথরের নির্দেশকটা ঠিক হয়নি। কাগজে যেটার কথা বলেছে, ওটা এই পাথর নয়।'

রবিন বলল, 'অনেক বছর আগের কথা। এতদিনে কত পরিবর্তনই হতে পারে প্রকৃতিতে। নদীটার গতিপথ বদলে গিয়ে থাকতে পারে, সরে আসতে পারে আসল জায়গা থেকে।'

শাবলের হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন মি. আমান। চারপাশে তাকাতে লাগলেন। আনমনে বললেন, 'কাগজে যে ঠিক কথা লিখেছে, তা-ই বা শিওর হব কি করে? দেয়াল করার সময় কেউ মজা করে টিনের বাক্সে গুপ্তধনের কথা লিখে লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে। মানুষের স্বভাব বড় বিচিত্র, কি যে করে আর না করে বলা মুশকিল!'

কেউ মজা করেছে—এটা কিছুতে মেনে নিতে পারল না মুসা। মেনে নিয়ে বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে চাইল না। এত কষ্টের পর হতাশ হয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরে যেতে হবে? উফ্, ভাবা যায় না!

তবে তার বাবা হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তোরা চালিয়ে যা। গুপ্তধন থাকলেও আমার আর থাকার উপায় নেই। কাজে যেতে হবে। কিছু পাওয়া গেলে আমাকে জানাস।'

মি. আমান চলে গেলেন।

কিশোর আর এখানে খুঁড়তে রাজি হলো না। অকারণ পরিশ্রমে আগ্রহ নেই তার।

'তাহলে কি করবে?' মুসার প্রশ্ন।

'আসল গাছ আর পাথরটা খুঁজব। নির্দেশের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে গেলে তবেই খুঁড়ব। অনেক হয়েছে, মিছেমিছি আর ঘাম ঝরাচ্ছি না আমি।'

উল্টোদিকের মাঠটায় চলে এল ওরা। নদীটা বেঁকে গেছে এটার ধার দিয়েও। ওক গাছ আর পাথর খুঁজল। পেল না।

রবিন বলল, 'এই ফার্মের কথাই বলেছে কাগজটায়, তাই বা কি করে বুঝব? কোথাও তো লেখা নেই। অন্য কোন ফার্ম থেকে এ বাড়িতে এনে রাখা হয়েছে, এটাই মনে হয় ঠিক।'

'তাহলে আমি যেখানে প্রথম খুঁড়েছি, সেখানে রাতের বেলা অন্য লোকেও খুঁজতে এল কেন?' যুক্তি দেখাল মুসা, 'তারমানে সে কিছু জানে। আমাকে বাড়ি মেরে বেহুঁশই বা করল কেন? কারণ সে গুপ্তধন হাতছাড়া হওয়ার ভয় পাচ্ছিল।'

'আমার এখনও বিশ্বাস,' কিশোর বলল, 'গুপ্তধন খুঁজতে আসেনি ওই লোক। সে এসেছিল লুকিয়ে রেখে যাওয়া চুরির মাল তুলে নিয়ে যেতে।'

'কোনখান থেকে চুরি করেছে বলে তোমার ধারণা?'

'যে কোনখান থেকে করতে পারে।' রবিনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'তোমার নোটবুকটা দাও তো?'

বের করে দিয়ে জানতে চাইল রবিন, 'কি করবে?'

'রকি বীচের ম্যাপ দেখব,' রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

নোটবুকে এক পৃষ্ঠার একটা ম্যাপ সাঁটানো আছে। বইয়ের পাতার চেয়ে কাগজটা অনেক বড় বলে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। ভাঁজ খুলে দেখতে লাগল কিশোর।

'এমনও হতে পারে,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'যে লোক মিস্টার স্প্যানিশকে পিটিয়ে বেহুঁশ করেছে, সে তার কাছ থেকে কোন জিনিস কেড়ে নিয়ে গেছে—কাগজের টাকা, সোনার মোহর, কিংবা দামী অলঙ্কার জাতীয় কিছু।'

‘বেশ, নিল,’ মাথা কাত করল মুসা, ‘তাতে কি?’

‘নিয়ে যাওয়ার পর লুকানোর প্রয়োজন পড়লে সাধারণত কোনখানে চুরির মাল লুকায় চোর?’

‘যেখানে সে থাকে, সেই বাড়িতে,’ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা, ‘কিংবা তার কোন দোস্তের কাছে।’

‘ঠিক। আরও এক জায়গায় লুকাতে পারে, যেখানে মানুষের আনাগোনা কম।’

রবিনের কাছ থেকে পেন্সিল চেয়ে নিয়ে ম্যাপে দাগ দিতে লাগল কিশোর। বলল, ‘এইখানে পাওয়া গেছে মিস্টার স্প্যানিশকে। এখান থেকে মুসাদের এলাকার ভেতর দিয়ে কেবল এই একটা জায়গায় যেতে পারবে সে।’ পেন্সিলের মাথা জায়গাটার ওপর রাখল সে। ‘কিংবা এই জায়গাটা থেকে মুসাদের বাড়ির ওপর দিয়ে ওখানে গেছে, যেখানে পেটানো হয়েছে তাকে।’

যে জায়গায় পেন্সিল রেখেছে কিশোর, সেটার নাম অটিংটন।

‘তোমার ধারণা,’ রবিন বলল, ‘অটিংটনে থাকে চোর?’

‘থাকতে পারে। আর এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় চোরাই মাল লুকানোর জন্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা মনে করতে পারে মুসাদের এলাকাটাকে। এখানে মানুষের যাতায়াত প্রায় নেই। নিরাপদ জায়গা।’

কিশোরের ধারণাটা রবিনের মনেও শেকড় গাড়তে আরম্ভ করল। বলল, ‘মনে হচ্ছে তোমার অনুমানই ঠিক। কোনদিকে লুকাতে পারে, বলো তো?’

‘পশ্চিম দিক। কারণ এ বাড়ির ওপর দিয়ে অটিংটনে যেতে হলে ওদিকটাই সোজা হবে।’

‘বসে আছি কেন তাহলে?’ উঠে দাঁড়াল মুসা। ‘চলো।’

তেরো

পশ্চিম সীমানার কাছে চলে এল ওরা। বেড়ার ভেতরে-বাইরে চোরাই মাল লুকানোর জন্যে উপযুক্ত জায়গা কোনটা হতে পারে, খুঁজতে লাগল।

কিন্তু তেমন কোন জায়গা মুসার চোখে পড়ল না। প্রশ্ন তুলল, ‘সোজাসুজি গেলে এদিক দিয়ে যাবে, কিন্তু যদি না যায়? ঘুরপথে অন্য কোনখান দিয়ে যায়?’

‘তাড়াহুড়ো থাকে যে লোকের,’ কিশোর জবাব দিল, ‘সে সাধারণত ঘুরপথে গিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইবে না। বিশেষ করে পথে যখন তোমাদের ফার্মটার মত নির্জন একটা বুনো জায়গা থাকে, যেখানে মাল লুকানোর চমৎকার সব জায়গা রয়েছে।’

বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে চক্কর দিতে লাগল ওরা। শ'খানেক গজ সরে আসার পর ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা বড় একটা পাথর চোখে পড়ল মুসার। চেঁচিয়ে উঠল, ‘কিশোর, এই পাথরটার কথা বলেনি তো গুপ্তধনের কাগজে!’

রবিন বলল, 'তেমন সাদা নয় পাথরটা।'
'আগে সাদাই ছিল। রোদ-বৃষ্টিতে ময়লা হয়ে গেছে।'
'বড়ও তেমন নয়। তা ছাড়া কাছাকাছি ওক গাছ কোথায়?'
'ওই যে!'
গাছটা কোনদিকে, কত দূরে, সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাল না মুসা। ঝট করে তার চোখে পড়েছে পাথরটা, ধারণা হয়েছে এর কাছে কিছু আছে, ব্যস এই যথেষ্ট। এটাকে ঠিক কাকতালীয় ব্যাপার বলা যায় না। মানুষের অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ হলে অনেক সময় যা খোঁজে সে পেয়ে যায়। মুসার বেলায়ও তাই হয়েছে।
পাথরটার কাছে এসে খুঁজতে শুরু করল সে। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। বলে উঠল, 'খাইছে! এই, দেখে যাও!'
পাথরের ধারে একটা জায়গার মাটি কিছুটা দেবে আছে। চিৎকার করে বলল, 'আমি শিওর, এখানেই আছে গুপ্তধন!' শাবল আনতে দৌড় দিল সে।
জায়গাটা দেখতে লাগল কিশোর আর রবিন। দেবে যাওয়া জায়গার কিছু ঘাস মরে, শুকিয়ে আছে।
কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে খোঁড়ার পর আবার মাটি চাপা দিয়ে দেয়া হয়েছে। বেশি দিন আগের ঘটনা নয়।'
'হুঁ,' রবিন বলল, 'মাটি খুঁড়ে আবার সেই মাটি দিয়ে ভরে দিলে এ রকম দেবে যায়।'
'তবে যা-ই বলো, এখানে গুপ্তধন আছে বলে মনে হয় না। থাকলে চোরাই মাল থাকতে পারে।'
'দেখাই যাক না কি আছে?'
কয়েক মিনিটের মধ্যেই শাবল নিয়ে ফিরে এল মুসা। খুঁড়তে শুরু করল। বকবক করতে লাগল, 'আহ্, নিজেদের এলাকায় গুপ্তধন পাওয়ার মজাই আলাদা! কত টাকার জিনিস হবে, কিশোর, লাখ লাখ ডলারের, তাই না? তাজ্জব করে দেয়া যাবে সবাইকে।'
'পেয়েই নাও না আগে,' হেসে বলল রবিন।
'পাব তো জানা কথাই,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল মুসা। কোপের পর কোপ বসাতে লাগল।
হঠাৎ মনে হলো ভারসাম্য হারাচ্ছে সে। পতন থেকে নিজেকে সামলানোর জন্যে বিচিত্র নাচ জুড়ে দিল যেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। তার পায়ের নিচের মাটি বসে গেল। মড়মড় করে ভাঙল কিছু। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।
গর্তের কাছে দৌড়ে এল কিশোর আর রবিন।
'মুসা!' নিচের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল রবিন। 'ঠিক আছ তুমি?'
খসখসে কাশির শব্দ শোনা গেল নিচ থেকে। কাঁপা কণ্ঠে চিৎকার করে বলল মুসা, 'আমাকে তোলো! একা একা উঠতে পারব না!'
তিন ফুট চওড়া হবে গর্তটা। ভয় পেয়ে গেল কিশোর, ওদের ভারে না আরও ধসে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। ভালমত দেখে বুঝল, পড়বে না। দেয়ালের মাটি খুব

শক্ত। প্রচুর পাথর গেঁথে রয়েছে। ভাঙা কাঠের টুকরোর জন্যে নিচে মুসাকে চোখে পড়ছে না।

'মনে হয় ঘাড়টা গেছে ভেঙে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'জলদি একটা দড়ি ফেলো, তোলো আমাকে, দম আটকে আসছে!'

ওপর থেকে মাত্র কয়েক ফুট নিচে রয়েছে সে। শুয়ে পড়ে নিচের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। নাগাল পেল না।

দড়ি আনতে তাঁবুতে ছুটল রবিন।

গর্তের মুখের কাছে শুয়ে মুসাকে অভয় দিতে লাগল কিশোর। কয়েক মিনিট ধৈর্য ধরতে বলল।

'কিসের গর্ত এটা, বলো তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'কুয়ার মতই লাগছে। কিন্তু অত গভীরও না, পানিও নেই। তাহলে কি?'

'তোমার মাথার ওপরে ওগুলো ভাঙা তক্তা, তাই না?'

'মনে হয় কোন ধরনের মাচার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। মাটি আর ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল, তাই দেখতে পাইনি। আমার ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়েছে।'

'নিচে কিছু আছে নাকি? সোনাদানা কিছু?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। খুব অন্ধকার। তবে পড়ার সময় শব্দ শুনেছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়েছে কিছু।'

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। কুয়া, দেয়ালে গোল করে সারি দিয়ে পাথর বসানো, কাঠের মাচা—কোথাও একটা গল্প পড়েছিল, জলদস্যুরা কুয়ার মধ্যে বিভিন্ন উচ্চতায় মাচা বানিয়ে তাতে বিভিন্ন ধরনের দামী বস্তু ভাগাভাগি করে রাখত। তার ওপর মাটি ছড়িয়ে ঢেকে দিত।

এ ভাবে রাখার কারণ, গুপ্তধন শিকারীকে ফাঁকি দেয়া। সবচেয়ে ওপরের স্তরে রাখা হত কম দামী জিনিস। গুপ্তধন শিকারী সেগুলো পেয়েই ভাবত সব পেয়ে গেছে। নিয়ে চলে যেত। নিচে যে আরও দামী অনেক কিছু আছে, কল্পনাই করত না।

দড়ি নিয়ে ফিরে এল রবিন। নামিয়ে দিল নিচে। দড়ির ওপরের মাথা সে আর কিশোর মিলে ধরে রাখল।

অনেক কায়দা-কসরৎ, ফোঁসফাঁসের পর কুয়া থেকে তুলে আনা হলো মুসাকে। বেজায় ভারী। একজনকে তুলতেই ঘাম ছুটে গেছে দুজনের।

'উফ, অল্পের জন্যে বেঁচেছি! আরেকটু হলেই আজ জ্যান্ত কবর হয়ে যেত! কুয়ায় নামছি না আর আমি!'

'মানে!' টিটকারি দিয়ে বলল রবিন, 'গুপ্তধন না নিয়েই বাড়ি ফিরে যাবে?'

'যাব! আমি আর এ সবে নেই!' দুহাত নেড়ে বলল মুসা। তবে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

কুয়ায় মাচা পেতে গুপ্তধন রাখার গল্প বলল কিশোর।

অবাক হলো রবিন।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'তুমি বলছ জলদস্যুরা লুকিয়ে রেখে গেছে এই

মোহর?’

বগলের নিচে পিঠ পেঁচিয়ে দড়ি বাঁধতে শুরু করল কিশোর। ‘আমি নিচে যাচ্ছি। কি আছে দেখব।’

‘ভীষণ অন্ধকার,’ মুসা বলল, ‘কিচ্ছু দেখতে পাবে না।’

হেসে বলল কিশোর, ‘ছোট একটা টর্চ আছে পকেটে। গুপ্তধন খুঁজতে এসেছি। টর্চ ছাড়া আসব ভাবলে কি করে? এসো, দড়িটা ধরো, আমি নামব।’

দড়ির এক প্রান্ত ধরে রাখল মুসা আর রবিন।

গর্তের কিনারে বসে পা ঝুলিয়ে আলগোছে শরীরটা ছেড়ে দিল কিশোর। ওপর থেকে দড়ি ধরে আস্তে আস্তে তাকে নামিয়ে দিতে লাগল অন্য দুজন।

ভাঙা মাচাটা পার হয়ে এল সে। নিচে নেমে টর্চ জ্বেলে দেখতে শুরু করল।

পাথরে তৈরি শক্ত দেয়াল এখানে। মনে হয় এককালে কুয়াই ছিল এটা, দিনে দিনে শুকিয়ে এখনকার অবস্থা হয়েছে। মাচাটা হয়তো পরে তৈরি করেছে কেউ, যে জলদস্যুদের এ ভাবে গুপ্তধন লুকানোর কাহিনী জানে।

‘কিছু পেলে?’ জানতে চাইল রবিন।

‘না,’ জবাব দিল কিশোর। ‘তবে মনে হচ্ছে কারণ ছাড়া এই কুয়া বানানো হয়নি।’

মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা তক্তা আর আলগা মাটি সরাতে লাগল সে। কিন্তু কিছু বেরোল না।

ওপরে অস্থির হয়ে উঠছে মুসা। ভয় পাচ্ছে কিশোরের জন্যে। ভাবছে কোন ক্ষতি না হয়ে যায়। চিৎকার করে বলল, ‘অ্যাই কিশোর, আরেকটা মাচার ওপর দাঁড়িয়ে নেই তো তুমি? ওটাও যদি ভাঙে, তাহলে আর তুলতে পারব না তোমাকে। মারা পড়বে। দরকার নেই গুপ্তধন, উঠে এসো...’

কথা শেষ হলো না তার। নিচ থেকে শোনা গেল কিশোরের চিৎকার, ‘জলদি টেনে তোলো আমাকে! জলদি!’

চোদ্দ

রবিন আর মূসা ভাবল নিচে পড়ে যাচ্ছে কিশোর, মরিয়া হয়ে দড়ি টেনে তুলতে শুরু করল ওরা। কুয়ার মুখের কাছে আসার পর ওকে গর্ত থেকে উঠে আসতে সাহায্য করল।

কিশোরের হাতে একটা চামড়ার থলে।

‘খাইছে! গুপ্তধন!’ উত্তেজিত হয়ে বলল মুসা।

থলেটা বেশ বড় আর ভারি। চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা মুখ।

বাঁধন খুলে ভেতরে তাকাল রবিন।

‘কি আছে? কি...?’ তোতলাতে শুরু করল মুসা।

ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একমুঠো মোহর বের করে আনল রবিন।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

টান দিয়ে থলেটা কাছে টেনে নিয়ে খোলা মুখটা উপুড় করে ধরল। হড়হড় করে ঝরে পড়ল একগাদা মোহর—কিছু সোনার, বাকি সব রূপার।

'গুপ্তধন! গুপ্তধন!' চেঁচামেচি শুরু করল মুসা। 'রবিন, কি দেখছ এত মনোযোগ দিয়ে?'

হাতের মোহরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। মাটিতে ঢেলে দেয়া স্তূপের দিকে তাকাল। 'অবাক কাণ্ড! লেখা, ছবি, কিছুই নেই এগুলোতে! মনে হচ্ছে যেন গলিয়ে কিংবা অন্য কোন ভাবে মুছে ফেলা হয়েছে!'

কিশোরও দেখল। ঠিকই বলেছে রবিন। সোনা আর রূপার গোল গোল ধাতব চাকতি কেবল এগুলো। সমতল পিঠ। মুদ্রার গায়ে যা যা লেখা থাকে, তার কিছুই নেই।

বিমূঢ় ভাব এখনও কাটেনি মুসার। বলল, 'এ কাজ করল কেন?'

'এগুলো যে চুরি করা হয়েছে যাতে কেউ ধরতে না পারে,' জবাব দিল রবিন।

'কিন্তু এতে তো এগুলোর অ্যানটিক মূল্য কমে গেল।'

'নিশ্চয় অ্যানটিক মূল্য নিয়ে মাথাব্যথা নেই যে চুরি করেছে তার। ধাতব মূল্য থাকলেই যথেষ্ট।'

'আপাতত মুছে রেখেছে মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'পরে এতে ছাপ দিয়ে নেবে। জাল মুদ্রা বানাবে।'

'দুশো বছর আগে এই কাণ্ড করেছিল কোন চোর!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'না, ইদানীং করেছে কেউ। থলেটা নতুন।'

থলেটার দিকে তাকিয়ে আরও হাঁ হয়ে গেল মুসার মুখ। বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

'আমি ভেবেছিলাম গুপ্তধনগুলো আমাদের হবে, কিন্তু চোরাই মাল হলে…' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'তাহলে কুয়ার ব্যাপারটা কি? এক থলে মুদ্রা লুকানোর জন্যে নিশ্চয় এতবড় একটা কুয়া তড়িঘড়ি খুঁড়ে বসেনি তোমার চোর?'

'কুয়াটা খোঁড়া হয়েছে অনেক বছর আগে,' কিশোর বলল, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো গুপ্তধন ছিল এখানে, সেগুলোও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই গুপ্তধনই এগুলো,' পড়ে থাকা মোহরগুলোর দিকে আঙুল তুলল সে। 'লেখাটেখাগুলো সব তুলে সমান করে নতুন ব্যাগে ভরে আবার এখানে রেখে দিয়েছে।'

'তাহলে শুধু একটা ব্যাগই নয়,' আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ, 'আরও অনেক আছে কুয়ার নিচে। মাচার ব্যাপারটাও ভুললে চলবে না। আমি যেটাতে পড়েছি, যেটাতে তুমি নেমেছ, সেটা হয়তো ওপরেরটা। নিচে আরও আছে। থলের মোহরগুলো যদি চোরাই মালও হয়, আসল গুপ্তধন আছে নিচের মাচায়।'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। রবিন বলল, এবার সে নিচে নামবে। কুয়ার নিচটা কেমন দেখতে চায়। দড়ির একমাথা তুলে নিয়ে কিশোরের মত বগলের নিচে পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর একটা শাবল তুলে নিয়ে গিয়ে বসল

গর্তের কিনারে।

কিশোর আর মুসা মিলে দড়ি ধরে তাকে নামিয়ে দিল।

নিচে নেমে প্রথমে আলগা মাটি একপাশে সরাল রবিন। তারপর শাবল দিয়ে কোপ বসাল, নিচে মাটি আছে না মাচা, দেখার জন্যে। কিছুক্ষণ পর টেনে তোলার নির্দেশ দিল। ওপরে উঠে মাথা নেড়ে বলল, 'না, মাচা নেই। নিরেট মাটি আর পাথর। এখানে একটা মাচাই ছিল, আর একটা থলে। আর কিছু পাওয়া যাবে না।'

'তারমানে এগুলো আমাদের গুপ্তধন নয়,' আবার হতাশ হয়ে পড়ল মুসা। 'চলো, বাড়ি গিয়ে বাবাকে দেখাই।'

'তুমি বাড়ি চলে যাও,' কিশোর বলল। 'আমি আরও খানিকটা তদন্ত করে নিই। ম্যাপে যে ভাবে দাগ দিয়েছি, এই লাইন ধরে এগিয়ে দেখতে চাই চোরের ব্যাপারে আর কোন সূত্র মেলে কিনা।'

রবিন বলল, 'আমিও যাব।'

থলে নিয়ে বাড়ি রওনা হয়ে গেল মুসা।

কিশোর আর রবিন এগিয়ে চলল ম্যাপ দেখে দেখে। মুসাদের সীমানা থেকে বেরিয়ে এল। পথে আরও কয়েকটা ফার্ম হাউস পড়ল। তবে মুসাদের মত এত বড় নয় একটাও, এত জায়গাও নেই কোনটার। পাশ কাটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ওরা ছোট্ট শহর অটিংটনে।

'চলো, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে দেখি কেউ কিছু জানে কিনা,' কিশোর বলল।

'কি জিজ্ঞেস করবে?'

'তা বলতে পারি না। কথা বলব। হয়তো কিছু বেরোতে পারে।'

তথ্যের জন্যে সারা শহর চষে বেড়াল ওরা। কিন্তু কিছু জানতে পারল না। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল।

'চলো, কিছু খেয়ে নিয়ে আবার মুসাদের বাড়িতে ফেরত যাই,' প্রস্তাব করল রবিন।

কিশোর বলল, 'দাঁড়াও, আগে বাড়িতে একটা ফোন করি। কোন খবর আছে কিনা দেখি।'

মেরিচাচী বললেন, 'এখুনি চলে আয়!'

'কি হয়েছে, চাচী?'

'মিস্টার অ্যানসন ফোন করেছিলেন। তোকে চেয়েছেন। তাঁর মোহর নাকি সব চুরি হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, আবার ফোন করলে বোলো রওনা হয়ে গেছি।'

রবিনকে সব জানাল কিশোর।

প্রথমে ইয়ার্ডে না গিয়ে জে অ্যানসনের বাড়িতে চলে এল ওরা। দেখল, চীফ ইয়ান ফ্লেচার পৌঁছে গেছেন। কথা বলছেন তাঁর সঙ্গে।

আফসোস করে বলছেন অ্যানসেন, 'সারা জীবন ধরে জমিয়েছিলাম! সব নিয়ে গেল! আর ফেরত পাব না!'

'না, পাবেন,' সান্ত্বনা দিয়ে বললেন চীফ, 'আমরা ওগুলো খুঁজে বের করবই।'

কি ভাবে চুরি হয়েছে দুই গোয়েন্দাকে জানানো হলো। আগের রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মোহরগুলো নাড়াচাড়া করেছেন অ্যানসেন। তারপর লাইব্রেরির একটা আলমারিতে তালা দিয়ে রেখেছিলেন। সকাল বেলা দেখেন তালা ভাঙা, জিনিসগুলো নেই। লাইব্রেরির জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল চোর।

'সূত্র বলতে জানালার বাইরে কেবল কয়েকটা পায়ের ছাপ পেয়েছি,' চীফ বললেন। 'তবে যে ভাবেই হোক, ধরবই চোরটাকে।'

'আমি ছাপগুলো দেখব,' কিশোর বলল। 'আপনাদের রেকর্ড ফাইলের কোনটার সঙ্গে মেলে?'

মেলে না, জানালেন চীফ। জানালাটার কাছে কিশোর আর রবিনকে নিয়ে গেলেন। একটা ফুলের বেডের পাশে দেখা গেল দুটো ছাপ।

'এখানকার নরম মাটি না মাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে,' চীফ বললেন। 'ভাল করেছে। এই ছাপ দুটোই হয়তো ওকে জেলের ঘানি টানাবে।'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে দেখতে লাগল কিশোর। আচমকা সোজা হয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ টেনে বের করল।

'কি ওটা?' জানতে চাইলেন চীফ।

'কয়েক দিন আগে মুসাদের বাড়িতে আঁকা পায়ের ছাপের নকশা। মনে নেই, অফিসে আপনাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম?'

'ও হ্যাঁ, মনে আছে।'

কিশোরের কাগজে আঁকা দুই ধরনের নকশা। প্রথম দিন যেটা পেয়েছিল, সেটা নয়, পরের বার যেটা পেয়েছে তার সঙ্গে ছাপ দুটো হুবহু মিলে গেল। তারমানে পরের বার মুসাদের জায়গায় মাটি খুঁড়তে চোরই ঢুকেছিল। আশেপাশে গর্ত দেখে নিরাপদ নয় ভেবে লুকিয়ে রেখে যাওয়া মাল তুলে নিয়ে গেছে।

ওরা যে অটিংটনে চোরের সন্ধানে গিয়েছিল, সেখান থেকে এসেছে এখন, চীফকে জানাল কিশোর।

চীফ বললেন, অটিংটনে লোক পাঠাবেন। ওখানে কেউ পুরানো মুদ্রা বেচাকেনা করছে কিনা, জানার ব্যবস্থা করবেন।

রবিন বলল, 'প্রফেসর ডুগানের কি খবর? মিস্টার অ্যানসনের মোহরগুলো চুরি করার পর নিশ্চয় তাঁরগুলোর ওপর নজর পড়বে চোরের।'

'খবর নেব।'

'প্রফেসরের বাড়ির ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করলেও মন্দ হয় না। হয়তো চোরটাকে হাতেনাতে মালসহ পাকড়াও করতে পারবেন।'

'একেবারে মনের কথা বলেছ। আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি।'

ইয়ার্ডে ফেরার পথে রবিন বলল, 'এক কাজ করলে পারি, আজ রাতে আমরাও নজর রাখতে পারি প্রফেসরের বাড়ির ওপর।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'তা পারি। তবে চোরটা এলে হয়।'

'আসতেও পারে। কাল রাতে অ্যানসনের মাল সাফ করেছে, আজ প্রফেসরেরটা করার কথা ভাববে।'

ইয়ার্ডে ফিরে মুসাকে ফোন করল কিশোর। অ্যানসনের বাড়িতে চুরির খবর

জানাল। তারপর জিজ্ঞেস করল থলের মোহর দেখে মিস্টার আমান কি মন্তব্য করেছেন।

মুসা জানাল, বাড়ি গিয়ে বাবাকে পায়নি। আগেই বেরিয়ে চলে গেছেন।

রাতে অ্যানসনের বাড়িতে নজর রাখার কথা বলল কিশোর।

মুসা বলল, সে পাহারা দেবে নদীর খাদ, যেখানে গুপ্তধন খুঁজছে। কুয়ার ওপরও চোখ রাখবে।

রাতের বেলা সকাল সকাল খেয়ে প্রফেসরের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল কিশোর আর রবিন। একটা দেয়াল পাওয়া গেল, যার কাছে সামান্য ঝোপঝাড় আছে। এর মধ্যে লুকিয়ে বসা যাবে। জায়গাটা বেশ নির্জন, সুতরাং কারও চোখে পড়ারও ভয় তেমন নেই।

বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে।

অনেকক্ষণ কিছু ঘটল না। তারপর কনুই দিয়ে রবিনের গায়ে গুঁতো মারল কিশোর। 'দেখো, কে আসছে!'

'আরি, দাড়িওলা! কালো চশমাও আছে! এই লোকই বেরিং নয় তো?'

'হতে পারে।'

কোন দিকে তাকাচ্ছে না লোকটা। সোজা এগিয়ে যাচ্ছে প্রফেসরের বাড়ির দিকে। ভেতরে ঢুকে, চত্বর পেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজা খুলে দিলেন প্রফেসর।

ভেতরে চলে গেল আগন্তুক।

কয়েক মিনিট পরই আবার খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল লোকটা। প্রফেসরকে দেখা গেল না, এগিয়ে দিতে আসেননি।

পেছনে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বারান্দা পেরোল লোকটা। ধীরেসুস্থে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল।

'প্রফেসরের কাছে নিশ্চয় আবার মোহর দেখতে গিয়েছিল,' অনুমান করল কিশোর।

'কিন্তু আমাদের সন্দেহ তো ঠিক হলো না,' হতাশই মনে হলো রবিনকে। 'চুরিও হলো না, ডাকাতিও না। এত নির্জন এলাকাটা, এত চুপচাপ, অসহ্য লাগছে এখন। মনে হচ্ছে কিছু ঘটলেই ভাল হত।'

'বেরিঙের এই শান্ত আচরণ আমার ভাল লাগছে না। কোথায় যেন কি একটা খটকা রয়েছে।'

রাস্তার মোড় পেরিয়ে হারিয়ে গেল দাড়িওয়ালা লোকটা।

'আর বসে থেকে কি করব?' অধৈর্য হয়ে বলল রবিন।

যেন তার প্রশ্নের জবাবেই আচমকা খানখান হয়ে গেল নীরবতা, তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল পুলিশের হুইসেল।

পনেরো

প্রফেসরের বাড়ির পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে পেছনে ছুটে যেতে দেখল একটা ছায়ামূর্তিকে রবিন।

'এসো, জলদি!' বলে লাফিয়ে উঠে সেদিকে দৌড় দিল সে।

দুজন লোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এল ওদের।

একজন বলছে, 'হুইসেল বাজাতেই আমার হাতে কামড়ে দিল!'

কিশোর বুঝল, ওরা পুলিশ। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

তিন গোয়েন্দাকে চে   দুই অফিসার। একজনের নাম ডেভিড, আরেকজন হিরাম। ডেভিড বলল, 'বাড়ির পেছন দিকে চোখ রেখেছিলাম আমি। দেখি, একটা লোক চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকে পেছনের দরজা খোলার চেষ্টা করছে। হিরামকে ডাকার জন্যে হুইসেল বাজালাম। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা কুত্তা বেরিয়ে এসে আমার হাতে কামড়ে দিল!'

'লোকটাকে ধরার চেষ্টা করা উচিত!' গোঁ গোঁ করে বলল হিরাম।

'ও বেড়া ডিঙানোর সময় চেষ্টা করেছিলাম, অল্পের জন্যে ফসকাল,' ভোঁতা গলায় বলল ডেভিড। 'তুমি যাও, আমি থাকি। একজনের এখানে থাকা উচিত। চীফ বলে দিয়েছেন, সবাই যেন একসঙ্গে বাড়ির কাছ থেকে না সরি।'

কুকুরের কথায় ওদের বাড়িতে চোর ঢোকার কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। দুজন লোক কুকুর নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছিল, অন্য একজন সামনে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। এ ক্ষেত্রেও সেই চালাকি নয় তো?

দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল সে। দরজায় থাবা দিল।

খুলে দিলেন প্রফেসর। পরনে ড্রেসিং গাউন আর পাজামা। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি, হচ্ছেটা কি! ঘুমাতে দেবে না নাকি আজ? হুইসেল, চেঁচামেচি, কুত্তার ঘেউ ঘেউ...'

তাঁর কথায় গুরুত্ব না দিয়ে জরুরী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার মোহরগুলো ঠিক আছে, প্রফেসর?'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগলেন ডুগান।

'ঠিক থাকবে না কেন? ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিজের হাতে তালা দিয়েছি আমি। লিভিং-রুমের আলমারিতে আছে। এসো, নিজের চোখেই দেখে যাও।'

লিভিং-রুমে ঢুকেই থমকে গেলেন তিনি। চিৎকার করে উঠলেন, 'হায় হায়, সব নিয়ে গেছে!'

তালা ভেঙে আলমারির দরজা খোলা হয়েছে। মোহরগুলো নেই।

ডেভিড আর হিরামও ঘরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'আমাদের নাকের ডগা থেকে নিয়ে গেল!' বিশ্বাস করতে পারছে না ডেভিড। 'পেছনের দরজার ওপর কড়া নজর রেখেছিলাম আমি। হিরাম রেখেছিল সামনের

দিকটায়।' সহকর্মীরদিকে তাকাল সে, 'হিরাম, নিশ্চয় তোমার চোখ ফাঁকি দিয়েছে কেউ।'

'অসম্ভব! দাড়িওয়ালা একটা বুড়ো বাদে আর কেউ ঢোকেনি সামনে দিয়ে। লোকটা গিয়ে প্রফেসর সাহেবকে ডেকে দরজা খোলাল। একটু পর বেরিয়ে চলে গেল।'

'ওকে আমরা দেখেছি,' রবিন বলল।

'ওর নাম বেরিং,' প্রফেসর বললেন। 'আবার এসেছিল মোহরগুলো দেখতে। বলে দিলাম, এখন পারব না, ঘুমোতে যাচ্ছি; অন্য সময় যেন আসে।'

'সামনের দরজায় তালা আছে নাকি দেখা যাক,' কিশোর বলল। 'আমরা যখন পেছন দিকে ব্যস্ত, তখন সামনে দিয়ে ঢুকে থাকতে পারে চোর।'

গোলমালটা সামনের দরজাতেই দেখা গেল। ছিটকানি ভাঙা।

মোহর হারিয়ে মুষড়ে পড়লেন প্রফেসর ডুগান। তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করল ছেলেরা।

ডেভিড বলল, 'চিন্তা করবেন না। দাড়িয়ালা লোকটা চোর হয়ে থাকলে ওকে আমরা খুঁজে বের করবই।'

এখানে আর কিছু করার নেই। ইয়ার্ডে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'আমাদের বাড়িতে যারা ঢুকেছিল ওরা, আর প্রফেসরের বাড়ির চোর একই দলের লোক। একই পদ্ধতিতে চুরি করেছে: বাড়ির পেছনে গিয়ে একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে সবার দৃষ্টি সেদিকে নিয়ে গেছে, এই সুযোগে আসল কাজ সেরে গেছে চোর।'

রবিনও তার সঙ্গে একমত হলো।

'এখন আমাদের কাজ হলো দাড়িওয়ালা লোকটাকে খুঁজে বের করা। কি ভাবে করা যায়, বলো তো?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রবিন। 'আচ্ছা, ভূত-থেকে-ভূতের সাহায্য নিলে কেমন হয়?'

তুড়ি বাজাল কিশোর। 'ঠিক বলেছ। তাই করব। বাড়ি ফিরে গিয়েই চালু করে দেব ভূত-থেকে-ভূতে।'

পরদিন সকালে নাস্তার পরই ফোন করল একটা ছেলে। রকি বীচের পাশের গ্রাম রেড হিলের এক ব্যাংকে ওরকম চেহারার একটা লোককে নাকি যাতায়াত করতে দেখেছে সে।

ছেলেটাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর। একবার গিয়ে ব্যাংকটায় খোঁজ নিলে মন্দ হয় না। আরও কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

রবিনকে নিয়ে রওনা হলো সে।

রেড হিল জায়গাটা ছোট হলেও দুটো ব্যাংক আছে এখানে। মেইন রোডে একটার মুখোমুখি আরেকটা।

রাস্তার পাশে গাড়ি রাখল রবিন। গাড়ি থেকে নেমে একটা ব্যাংকের দিকে চলে গেল কিশোর।

কয়েক মিনিট পর হঠাৎ অন্য ব্যাংকটার দিকে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল রবিন।

দাড়িওয়ালা একজন লোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে। চলে যাচ্ছে বাড়ির কোণের দিকে। সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটছে।

আরে, বেরিং না! একটানে দরজা খুলে লাফিয়ে নামল রবিন। দৌড় দিল কোণের দিকে। বাড়ির পাশ দিয়ে একটা গলি চলে গেছে। লোকটাকে দেখতে পেল না আর। কোন দিকে গেছে, তা-ও ঠাহর করতে পারল না।

গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন মাঝবয়েসী লোক। বুড়োর চেহারার বর্ণনা দিয়ে তাকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করল রবিন। মাথা নাড়ল লোকটা। দেখেনি।

বিস্মিত হয়ে গেল রবিন। এত তাড়াতাড়ি কোথায় গায়েব হয়ে গেল বুড়ো? 'বেরিংই তো, নাকি?' নিজেকে প্রশ্ন করল সে। 'যাই, ব্যাংকের ভেতরে গিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখি!'

সামনে দিয়ে এসে ভেতরে ঢুকল সে। কাউন্টারের সামনে কেউ নেই।

ডেস্কের ওপাশে বসা ব্যাংকের এক কর্মচারীকে দেখে এগিয়ে গেল রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'কয়েক মিনিট আগে একজন বুড়ো লোক এসেছিল এখানে, তার নাম জানেন?'

মাথা নাড়ল ক্লার্ক, । কিছু টাকা বদলাতে এসেছিল।'

'মুদ্রা?'

অবাক হলো ক্লার্ক। 'তুমি জানলে কি করে? হ্যাঁ, অনেকগুলো মুদ্রা নিয়ে এসেছিল। বদলে নোট নিয়ে গেল।'

'নিশ্চয় বলেছে ছেলেমেয়েদের জমানো পয়সা ওগুলো? ভাঙতি পয়সা বদলে নোট চায়?'

'তুমি তো অনেক কিছুই জানো দেখি! ব্যাপার কি? কোন গোলমাল?'

'আন্দাজে বললাম। সাধারণত বাচ্চারাই কয়েন জমায় তো। বড়রা এসে বদলে নোট নিয়ে গিয়ে দেয়। ওগুলো জাল হলে চিনতে পারতেন?'

'অবশ্যই। আমাকে ঠকানো অত সহজ না।'

একটা কাপড়ের ব্যাগ খুলে টেবিলে কয়েকটা মুদ্রা ঢালল ক্লার্ক। বুড়ো আঙুল ঘষে কিনার পরীক্ষা করল, টেবিলে আছাড় দিয়ে কি রকম শব্দ হয় শুনল। বলল, 'একদম ঠিক আছে। কি হয়েছে বলো তো? জাল মনে হলো কেন তোমার?'

'এমনি!'

অবাক হলো রবিন। জাল না হলে বদলাতে এল কেন?

ষোলো

ক্লার্ককে অবাক করে রেখে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল রবিন। অন্য ব্যাংকটার দিকে এগোল, এই সময় বেরিয়ে এল কিশোর।

কি ঘটেছে, তাকে বলল রবিন।

কিশোর বলল, 'লোকটার পিছু নেয়া উচিত ছিল।'

'নিয়েছিলাম তো। বাড়ির পাশে গিয়েই হারিয়ে গেল কোথায় যে, বুঝতে পারলাম না। বেরিং যদি পুরানো মুদ্রা চুরি করে থাকে, জালিয়াতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকে, তাহলে ভাল মুদ্রা জমা দিতে গেল কেন ব্যাংকে? জাল জিনিস বদলে আসল জিনিস আনতে গেলেও একটা অর্থ হত।'

'একটা ব্যাপার হতে পারে, হয়তো জাল মুদ্রাগুলো সব সিকি অথবা আধ ডলারের। ব্যাংকে জমা দিতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই চলে যায় কোন বড় স্টোরে। ছোটখাটো কমদামী জিনিস এই যেমন চিউয়িং গাম, খবরের কাগজ, এ সব কিনে পয়সা ভাঙায়, খারাপ পয়সা দিয়ে ভাল খুচরো পয়সা নেয়। সে সব জমিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যাংক থেকে বদলে নোট নিয়ে আসে।'

হ্যাঁ, এইটাই একমাত্র জবাব হতে পারে। রেড হিলের কোন দোকানে জাল মুদ্রা দিয়েছে কিনা, খোঁজ নিতে চলল দুজনে। বড় একটা স্টোরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, ঘন্টাখানেকের মধ্যে কোন দাড়িওয়ালা বুড়ো লোক কিছু কিনতে এসেছিল কিনা।

সেলসম্যান বলল, 'আধঘন্টা আগে এসেছিল একজন। এক প্যাকেট খাম কিনেছে।'

'দাম চুকানোর জন্যে কোয়ার্টার দিয়েছে, না হাফ?'

'তা তো মনে নেই। কেন?'

'ড্রয়ার খুলে দেখবেন, জাল কোন মুদ্রা আছে কিনা?'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল সেলসম্যান। টান দিয়ে ড্রয়ার খুলে কতগুলো মুদ্রা বের করল। দেখেটেখে বলল, 'কই, না তো? সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে।'

কাউন্টার থেকে কাউন্টারে ঘুরে বেড়াতে লাগল দুজনে। কিন্তু একটা জাল মুদ্রাও বের করতে পারল না। প্রায় বোকা হয়েই বেরিয়ে এল স্টোর থেকে। তবে কি কিশোরের ধারণা ঠিক নয়?

একটা জুতো মেরামতের দোকান, একটা খবরের কাগজের স্টল, একটা আইসক্রীমের দোকানে খোঁজ নিল ওরা। সবাই জানাল, ওরকম একজন বুড়ো খদ্দের এসেছিল। দাম চুকিয়েছে হয় সিকি দিয়ে, নয়তো হাফ ডলার দিয়ে। মুদ্রাগুলো চেক করা হলো। সব আসল। কোনটাকে জাল মনে হলো না।

আরও বোকা হয়ে একটা কাফেতে ঢুকল দুজনে। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে। স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ভুলটা কোথায় হয়েছে, এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করল।

রবিন বলল, 'জিনিসগুলো বোধহয় প্রয়োজন ছিল বেরিঙের। তাই ভাল পয়সা দিয়েই কিনেছে।'

'তা-ও হতে পারে। আশপাশের অন্য শহরে গিয়ে দোকানে দোকানে খোঁজ নেব আমরা,' কিশোর বলল। 'কোথাও না কোথাও ঘাপলা বেরোবেই।'

স্যাণ্ডউইচ খেয়ে বিল দিতে গেল সে। কিছু খুচরো ফেরত দিল কাউন্টারে বসা অ্যাটেনডেন্ট। একটা সিকির ওপর দৃষ্টি আটকে গেল কিশোরের। পকেট থেকে আরেকটা সিকি বের করে পাশাপাশি রাখল। আছাড় দিয়ে আওয়াজ শুনল দুটোর।

উত্তেজিত হয়ে উঠল। রবিনের গায়ে গুঁতো দিয়ে বলল, 'দেখো তো, কোন অমিল বের করতে পারো কিনা?'

ভাল করে দেখে রবিন বলল, 'ফিনিশিঙে সামান্য হেরফের আছে। অতি সামান্য। ভাল করে না দেখলে বোঝা যায় না।'

তুড়ি বাজাল কিশোর, 'বুঝে ফেলেছি!'

'কি?'

'ব্যাংককেও ঠকিয়ে এসেছে মহাধড়িবাজ বুড়োটা! ভাল কোন মেশিন দিয়ে খুব নিখুঁত করে কয়েনের ফিনিশিং দেয়। ছাপ দেয়ার মেশিনও খুব আধুনিক। আসল মুদ্রা গলিয়ে ওজন ঠিক রেখে বানায়। তাতে আওয়াজও একই রকম থাকে। সাংঘাতিক দক্ষ লোক না হলে আসল-নকলের পার্থক্য বুঝবে না।'

সিকিটা কাউন্টারে নিয়ে গেল কিশোর। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো, আসল কিনা?'

মুদ্রাটা পরীক্ষা করল অ্যাটেনডেন্ট। কুঁচকে গেল ভুরু, 'করেছে কি শয়তানেরা! এক্কেবারে আসলের মত দেখতে! ঠকা খেয়েছি! কে যে ধরিয়ে দিয়ে গেল, কে জানে!'

কিশোরকে জাল মুদ্রা দেয়ার জন্যে ক্ষমা চাইল সে।

'একটু আগে কোন বুড়ো ঢুকেছিল এখানে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'দাড়ি আছে। চোখে কালো চশমা।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল অ্যাটেনডেন্ট। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেছিল! সকালে। নাস্তা খেয়েছে। সে দিয়েছে বলছ? মনে পড়ছে এখন—একটা সিকি, আর একটা আধুলি দিয়েছিল!'

ড্রয়ার টেনে কতগুলো হাফ ডলার বের করল লোকটা। তার মধ্যে একটা মুদ্রা নকল। রাগে ফুঁসে উঠল সে, 'বুড়ো শয়তানটাকে ধরতে পারলে হয়…'

'এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমরা,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল কিশোর। 'জাল মুদ্রা দুটো দিয়ে দিন আমাদের, প্লীজ। এর বদলে ভাল পয়সা দিচ্ছি।'

'লাগবে না। নাও, এমনিই দিলাম। বুড়োকে ধরতে পারলে খবর দেবে একটা, তাহলেই হবে।'

কাফে থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

রেড হিল ছোট জায়গা। এখানে বেরিঙের খোঁজ বের করা কঠিন হবে না। কিশোর বলল, 'চলো, ব্যাংক থেকে শুরু করি।'

'চলো।'

'একসঙ্গে না গিয়ে আলাদা হয়ে খুঁজলে তাড়াতাড়ি করতে পারব। কি বলো?'

রবিনও একমত হলো। দুদিকে সরে গেল দুজনে।

বিশ মিনিট ধরে নানা জায়গায় নানা ভাবে খোঁজ চালাল ওরা। কিন্তু বুড়ো কোন দিকে গেছে, বলতে পারল না কেউ।

খুঁজতে খুঁজতে দুদিক থেকে এসে আবার দেখা হয়ে গেল পরস্পরের সঙ্গে।

রাস্তার পাশে বসে খেলছে একটা ছোট্ট মেয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করল

কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, দেখেছি। খানিক আগে ব্যাংক থেকে বেরিয়েছে।'

'কোন দিকে গেছে, দেখেছ?'

'ওই যে ওদিকের ওই বাড়িটাতে ঢুকেছে।'

ছোট, জরাজীর্ণ একটা বাড়ি দেখাল মেয়েটা। তাতে লোক বাস করে বলে মনে হয় না। বাগানে বড় বড় আগাছা জন্মে আছে, কতদিন পরিষ্কার করা হয়নি কে জানে।

মেয়েটাকে ধন্যবাদ দিয়ে সেদিকে এগোল দুজনে। আঙিনায় ঢুকল। সামনের দরজায় টোকা দিল।

খানিক পর পায়ের শব্দ শোনা গেল।

দরজা খুলে দিল তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরের মোটা এক লোক। ভুরু কুঁচকে প্রায় গর্জে উঠল, 'কি চাই?'

লোকটার শার্টের বোতামগুলো সব খোলা। বুক বেরিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। উল্কি দিয়ে আঁকা একটা মোহরের ছবি। তাতে মহিলার মুখ। মুখটা ওর চেনা। মোহরের গায়েই দেখেছে।

রবিনও তাকিয়ে আছে লোকটার বুকের দিকে। কত রকমের মানুষ যে আছে দুনিয়ায়, কত রকম তাদের রুচি। নইলে বুকে মোহর আঁকে কেন!

'বললে না কি চাও?' আবার গর্জে উঠল লোকটা।

দুজনকে একদৃষ্টিতে তার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কি জানি কেন ঘাবড়ে গেল লোকটা। বদলে গেল মুখের ভাব। চকিতে পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল।

সতেরো

দরজায় ভেতর থেকে তালা লাগানোর পর হলঘর ধরে ছুটে যাওয়ার পদশব্দ কানে এল ওদের।

'আমি পেছনে যাচ্ছি!' বলেই লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে বাড়ির পেছন দিকে দৌড় দিল রবিন।

সামনের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল কিশোর।

পেছনে এসে কাউকে দেখতে পেল না রবিন। দরজাও বন্ধ। ঠেলে, ধাক্কিয়ে ওটা খোলার চেষ্টা করল। পারল না।

হঠাৎ কানে এল ধুপ করে একটা শব্দ। তারপর ছড়ছড়, ঝুপঝাপ। মাটিতে লাফিয়ে পড়ে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে যাচ্ছে কেউ। নিশ্চয় জানালা দিয়ে বেরিয়েছে। বেড়ার দিকে ছুটে যাচ্ছে।

উল্কি আঁকা লোকটাকে পলকের জন্যে চোখে পড়ল তার। সামনের দিক

থেকে কিশোরও ছুটে এল। দুজনে মিলে তাড়া করল লোকটাকে।

ভারী শরীর নিয়ে বেড়া ডিঙাতে গিয়ে পড়ে গেল সে। চেপে ধরল কিশোর আর রবিন। জুডোর প্যাঁচ আর কারাতের মাঝারি ওজনের কোপ সহ্য করতে পারল না লোকটা, কাবু হয়ে গেল। তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পেছন থেকে তার হাত মুচড়ে ধরে রাখল রবিন।

চিৎকার করে বলতে লাগল লোকটা, 'ছাড়ো আমাকে, ছেড়ে দাও! আমি কিছু করিনি!'

'তাহলে দৌড় দিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!'

'কিসের ভয়?'

ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলল লোকটা। কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য হলো না। লোকটা যে কিছু লুকাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধমক দিয়ে বলল কিশোর, 'চলুন, পুলিশের কাছে নিয়ে যাব।'

'না না, দোহাই তোমাদের! আমাকে ছেড়ে দাও! জেলখাটাকে আমার ভীষণ ভয়!'

'কি নাম আপনার?'

'হব গুন। আমি একজন নাবিক। মানে, আগে ছিলাম।'

'বুকে ওই উল্কি এঁকেছেন কেন? কি মানে এর?' কিশোরের সন্দেহ জোরদার হয়েছে, বুকে আঁকা কয়েনের সঙ্গে লোকটার ভয় পাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে।

চুপ করে রইল লোকটা। দ্বিধা করতে লাগল।

'জবাব দিন,' জোরে ধমক দিল কিশোর।

'কি জবাব দেব?'

'বুকে কয়েন আঁকা কেন?'

'ভুল করেছি, মারাত্মক ভুল! না আঁকলেই ভাল হতো!' গোঁ গোঁ করে বলল গুন। 'মেকসিকোতে আঁকিয়েছি এটা। ভেরা ক্রুজে এক বুড়োর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় বলল, সে নাকি জলদস্যু ছিল। তখন ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে খাতির হলো। কথায় কথায় বলল, উল্কি দিয়ে ভাল ছবি আঁকতে পারে। আমি চাইলে সুন্দর এক মহিলার মুখ এঁকে দেবে। গায়ে উল্কি আঁকার শখ ছিল আমার, সুযোগ পেয়ে আর দেরি করলাম না, বোকার মত রাজি হয়ে গেলাম। তারপর থেকেই আমার কপালে শনি লেগেছে। ভাল কিছু আর হয় না। অভিশপ্ত এই মুখ!'

'খারাপ কি কি ঘটল?'

'কি ঘটেনি তাই বলো! উল্কি আঁকা শেষ হওয়ার পর পরই আমার টাকাপয়সা সব চুরি হয়ে গেল। একটা রুটি কিনে খাওয়ার পয়সা রইল না। ডাকাতটা বলল, টাকা দিতে পারে আমাকে, তবে তার একটা কাজ করে দিতে হবে। একটা গুহায় ঢুকে একটা লুকানো বাক্স বের করে আনতে হবে। রাজি হয়ে গেলাম! পরে বুঝেছি, কোন উদ্দেশ্য নিয়েই আমার বুকে উল্কি এঁকেছিল ডাকাতটা। আমার বুকে উল্কি আঁকার পর বেশ খুশি খুশি মনে হয়েছিল ওকে। আর টাকাপয়সাও সে-ই চুরি

করেছিল, অসুবিধেয় ফেলে আমাকে গুহায় ঢুকতে বাধ্য করার জন্যে। গুহাটা দেখেই পিলে চমকে গেল। মনে হলো, ভেতরে ওত পেতে আছে সাক্ষাৎ যমদূত। ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম। বাপরে বাপ, ভেতরে কেবল সাপের আড্ডা। যেদিকেই যাই, ফোঁস করে ওঠে। বাক্স না নিয়েই বেরিয়ে এলাম। কোনমতেই ঢুকলাম না আর। ভয় দেখাতে লাগল আমাকে ডাকাতটা। এক সুযোগে পালালাম। বন্দরে গিয়ে একবার জাহাজে উঠতে পারলে হয়, আর ধরতে পারবে না আমাকে সে। কিন্তু গিয়ে দেখি জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। ওই শহরে থাকার আর সাহস হলো না। আবার পালালাম। তারপর থেকেই কপালে কেবল খারাপ আর খারাপ। নাবিকের কাজ ছাড়া আর কিছু জানি না, তাই কোন চাকরি করতে পারলাম না। খাওয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে চুরি শুরু করলাম। এখন যদি পুলিশের কাছে নিয়ে যাও, জেলে ঢুকিয়ে দেবে ওরা আমাকে। বন্দি থাকার বড় ভয় আমার। বিশ্বাস করো, আমি অতটা খারাপ লোক নই।'

'নাম কি ছিল ডাকাতটার? চেহারা কেমন?'

'নামটা অদ্ভুত, লঙ জন সিলভার। ট্রেজার আইল্যাণ্ড বইয়ের খোঁড়া ডাকাতের মতই চেহারা।'

'কোথায় আছে এখন সে?'

'বলতে পারব না।'

হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল কিশোর, 'কার্স অভ দি ক্যারিবিস কথাটা কখনও শুনেছেন?'

বিস্ময় ফুটল গুনের চোখে। 'শুনেছি। সিলভারের মুখে।'

'এ ব্যাপারে আর কি জানেন?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আর কিছু না।'

পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। একই কথা ভাবছে দুজনে—এই লোক মিস্টার স্প্যানিশের স্মৃতি ফেরানোর ব্যাপারে কি কোন সাহায্য করতে পারবে?

কিশোর বলল, 'আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি, তবে আমাদের একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'কি কাজ?'

'আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমাদের বাড়িতে।'

'সত্যি বলছ পুলিশে দেবে না?' গুঙিয়ে উঠল গুন।

'কথা শুনলে দেব না। আমাদের এক পরিচিত লোক কার্স অভ দি ক্যারিবিসের ব্যাপারে আগ্রহী। তাকে গিয়ে আপনার উল্কি আঁকা আর গুহায় ঢোকার গল্প বলবেন। আপনার বুকে আঁকা অভিশপ্ত মুখটাও দেখাবেন। দেখতে চাই কি প্রতিক্রিয়া হয় ওর।'

ভয় এবং সন্দেহ কোনটাই গেল না গুনের। ছেলেদের বিশ্বাস করতে পারল না। তবে আর কোন উপায় নেই দেখে বাধ্য হয়েই ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হলো।

গাড়িতে ড্রাইভিং সীটে বসল রবিন।

পেছনের সীটে কিশোর। নিরাপত্তার খাতিরে গুনের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়েছে, যাতে পালাতে না পারে। সুযোগ পেলেই পালানোর অভ্যেস আছে লোকটার।

যে বাড়িতে ধরা পড়েছে, সেখানেই গুন থাকে কিনা, জিজ্ঞেস করল কিশোর।

লোকটা জানাল, থাকে না। তবে কোথায় থাকে, সে-কথাও বলল না।

'তাহলে বুড়ো থাকে নিশ্চয় ওবাড়িতে?'

'কোন বুড়ো?'

'বেরিং।'

'চিনি না।'

'তাহলে হয়তো নামটা ভুল। ঠিক আছে, দেখতে কেমন বলি। বুড়ো লোক, সামান্য কুঁজো, দাড়ি আছে, কালো চশমা পরে।'

'অমন কাউকে চিনি না। আমি যতক্ষণ বাড়িতে ছিলাম, ওরকম কাউকে ঢুকতে দেখিনি।'

ওই বাড়িতে কেন ঢুকেছে, কিছুতেই বলল না গুন। বাকি পথটা চুপ করে থেকে কাটাল।

আঠারো

মিস্টার স্প্যানিশ বাগানে বসে আছে।

বাগানের পথ ধরে গুনকে নিয়ে এগোনোর সময় লক্ষ রাখল কিশোর, একজন আরেকজনকে চিনতে পারে কিনা, চেনার লক্ষণ দেখায় কিনা।

কিন্তু তেমন কিছু দেখাল না একজনও। তারমানে চিনতে পারেনি।

গুনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'একে দেখেছেন আগে?'

'না,' সাফ জবাব দিল গুন।

'এই ভদ্রলোকও একজন নাবিক,' মিস্টার স্প্যানিশকে দেখিয়ে বানিয়ে বলে দিল কিশোর। 'কার্স অভ দি ক্যারিবিস সম্পর্কে জানে। স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে, তাই কিছু বলতে পারছে না আমাদের। আপনার কাহিনী শুরু করুন। এমনভাবে বলুন, যেন একেই শোনাচ্ছেন।'

কিশোরদেরকে যা বলেছে তা-ই আবার বলতে লাগল গুন।

শুনে সামান্যতম ভাব পরিবর্তন হলো না মিস্টার স্প্যানিশের। মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'সরি, কিছুই মনে করতে পারছি না। ভেরা ক্রুজ, উল্কি আঁকিয়ে জলদস্যু. কার্স—কোনটাই আমাকে কোনভাবে নাড়া দিতে পারছে না।'

চেয়ার থেকে উঠে বিষণ্ন ভঙ্গিতে ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

'কোন লাভ হলো না তোমাদের,' গুন বলল। 'আর তো কোন কাজ নেই। এবার আমাকে যেতে দাও।'

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে কোথায় পাওয়া

যাবে?'

গুন বলল, 'আমাকে আর দরকার নেই তোমাদের। আর কিছু বলারও নেই আমার। কথা দিয়েছ, ছেড়ে দেবে; দাও।'

আটকে রেখেও আর লাভ নেই। যেতে দিল ওকে কিশোর।

কিন্তু কপাল খারাপ গুনের। মিস্টার স্প্যানিশের ওপর নজর রাখার জন্যে সাদা পোশাকে একজন পুলিশ লাগিয়ে রেখেছেন ইয়ান ফ্লেচার। কিশোররা জানত না। ওরা গুনকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামছে দেখে অবাক হয়েছে। চুপ করে থেকেছে, কিছু বলেনি। দেখেছে, লোকটাকে নিয়ে ওরা কি করে। কিন্তু গুনকে বেরোতে দেখে এখন আর চুপ থাকল না। লাফ দিয়ে এসে কলার চেপে ধরল তার।

চেঁচামেচি শুনে ছুটে গেল কিশোর আর রবিন।

ওদের দেখে অফিসার বলল, 'এ ব্যাটাকে কয়েক মাস ধরে খুঁজছি আমরা। পাকা চোর। বহু জায়গায় চুরি করেছে।' গুনের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল সে। ছেলেদের জিজ্ঞেস করল, 'পেলে কোথায় একে?'

কোথায় পেয়েছে জানাল কিশোর।

'দেখি, পকেটে কি আছে?' গুনের পকেট সার্চ করতে শুরু করল অফিসার।

সাধারণ সব জিনিস বেরিয়ে আসতে লাগল লোকটার পকেট থেকে। তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন। কোন জিনিসই আগ্রহ জাগাল না ওদের।

এই সময় বেরোল কয়েকটা মুদ্রা।

সঙ্গে সঙ্গে অফিসারের দিকে হাত বাড়াল কিশোর, 'দেখি তো ওগুলো, প্লীজ!'

অবাক হলেও কোন প্রশ্ন না করে দেখতে দিল অফিসার।

একবার তাকিয়েই বুঝে গেল কিশোর, মুদ্রাগুলো নকল। রবিনও দেখল।

ভয় ফুটেছে গুনের চোখে। কথা বলছে না।

'কোথায় পেয়েছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'জানি না। কোন দোকান থেকে ভাঙতি দিয়েছে হয়তো।'

ওর কথা বিশ্বাস করল না কিশোর কিংবা রবিন।

'দাঁড়াও, থানায় আগে নিয়ে যাই,' কঠিন স্বরে বলল অফিসার, 'সুড়সুড় করে সব পেট থেকে বেরোতে আরম্ভ করবে। চলো।'

যেতে চাইল না গুন। টানতে টানতে নিয়ে গেল অফিসার।

'ছিঁচকে চোর না তাহলে,' রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'এমন ভঙ্গি করে ছিল আমাদের কাছে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ধাপ্পা দিয়েছে আমাদের।'

'আচ্ছা, বেরিঙের সঙ্গে যোগাযোগ নেই তো ওর?'

ঘরে এল দুজনে। চীফকে ফোন করল কিশোর। গুন, জাল মুদ্রা, রেড হিলের বাড়ির কথা সব জানাল। গুনকে যে বাড়িতে পাওয়া গেছে সেটার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করল।

চা-নাস্তার ট্রে নিয়ে হলঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, 'মিস্টার স্প্যানিশের কি হয়েছে রে?'

'কেন?'

'খানিক আগেও তো ভাল ছিল। চা দিতে গিয়ে দেখি, কেমন যেন উত্তেজিত একটা ভাব। তোরা কিছু বলেছিস নাকি?'

'স্মৃতি ফিরছে না তো!'

'তা তো বলতে পারব না।'

ঝনঝন করে কাপ-পিরিচ ভাঙার শব্দ হলো। মিস্টার স্প্যানিশের ঘরের দিক থেকে এসেছে।

ভুরু কুঁচকে গেল মেরিচাচীর, 'কি ভাঙল!'

দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর।

উনিশ

কাপ-পিরিচগুলো সব মেঝেতে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বিস্কুট, চা আর অন্যান্য খাবার মাখামাখি হয়ে গেছে। ওসবের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা ট্রে, যাতে ছিল জিনিসগুলো।

বোকা হয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মিস্টার স্প্যানিশ। কিশোরদের, বিশেষ করে মেরিচাচীকে দেখে লজ্জা পেল। বলল, 'নাড়া লেগে পড়ে গেল···খুব বিরক্ত করছি আপনাদের! আমি বরং চলেই যাই···রোগ হয়েছে আমার, আপনারা শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন? এটা অন্যায়···'

আর এ ভাবে অন্যের বাড়িতে থাকতে চাইল না মিস্টার স্প্যানিশ।

যতই বোঝান মেরিচাচী—না না, ও কিছু না, সামান্য কয়েকটা কাপ-পিরিচই তো ভেঙেছে, ওতে অত কুণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই, তা ছাড়া তাকেও বোঝা মনে করা হচ্ছে না; কিন্তু সে আর বুঝতে চায় না। শেষমেষ পকেট থেকে একমাত্র সোনার মোহরটা বের করে দিয়ে নিতে অনুরোধ করল, খাবার আর কাপ-পিরিচের দাম মেটানোর জন্যে।

মেরিচাচী নিলেন না।

কিশোর বলল, 'রেখে দিন ওটা। কোনদিন আপনার পরিচয় প্রমাণ করার জন্যে কাজে লাগতে পারে।'

এই ঘটনা থেকে দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হলো তার কাছে: এক, হব গুনের কাহিনী উত্তেজিত করেছে মিস্টার স্প্যানিশের মগজকে। দুই, কোন সাধারণ লোক নয় সে। ভিখিরি কিংবা ভবঘুরে শ্রেণীর নয়। স্মৃতি-ভ্রষ্ট অবস্থায়ও অন্যের বাড়িতে থাকতে মান-সম্মানে লাগে।

নতুন করে চা-নাস্তা আনতে চলে গেলেন মেরিচাচী।

মিস্টার স্প্যানিশকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করে বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন।

পরদিন সকালে ফিরে এলেন ভিকটর সাইমন। কিশোরকে ফোন করলেন।

রবিনকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেল সে। যে কাজে গিয়েছিলেন তিনি, তাতে কতটা সফল হয়েছেন জানতে চাইল।

'কিছুটা তো সফল হয়েছিই,' বললেন ডিটেকটিভ, 'অবশ্যই তোমাদের দৌলতে। মুদ্রা গলিয়ে ফেলার সম্ভাবনাটা মাথায় ছিল, সে-পথেই তদন্ত করেছি।'

'কি ভাবে?' জানতে চাইল কিশোর।

'তুমি বলেছিলে, মুদ্রা গলিয়ে রূপান্তরিত করা হয়ে থাকতে পারে। আমি গিয়ে তদন্ত করে জানতে পারলাম পশ্চিম উপকূলের একটা সোনার খনি পুবের কয়েকজন লোক গিয়ে কিনে নিয়েছিল। পরিত্যক্ত ওই খনি কেনাতে অবাক হয়েছিল স্থানীয় লোকজন। কিন্তু যারা কিনল, তারা কেনার পর পরই সোনার বার বিক্রি করতে শুরু করল সরকারের কাছে। জানাল, সোনা আছে খনির মধ্যে এমন একটা নতুন শিরা নাকি আবিষ্কার করেছে ওরা।'

'কিন্তু আসলে করেনি, তাই না?'

'না। কোত্থেকে করবে, বহু বছর আগেই ফুরিয়ে গেছে খনি। ঝেড়েপুঁছে সমস্ত সোনা তুলে নেয়ার পরই বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল খনিটাকে। ওটাকে একটা ভাঁওতাবাজির ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে লোকগুলো। পুবের কোন অঞ্চল থেকে সোনার বারগুলো এনেছিল ওরা, চালাকি করে বিক্রি করে দিয়েছে সরকারের কাছে। ভাল টাকা আদায় করে নিয়েছে।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'এ ভাবেই তাহলে বিদেশী সোনা হজমের ব্যবস্থা করেছিল চোরেরা।'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস, জাহাজ ভর্তি সোনা যেগুলো স্যান ডিয়েগোতে এসে গায়েব হয়ে গিয়েছিল, এগুলো সেই সোনা। গলিয়ে অন্য রকম চেহারা দেয়া হয়েছিল বারগুলোর, যাতে ধরা না পড়ে। খনিটাকে ব্যবহার করা হয়েছে সোনা গলানোর কারখানা হিসেবে।'

রবিন বলল, 'ওই দলটাই এখন রূপার মুদ্রা জাল করছে না তো? নতুন ধান্দাবাজি?'

'ওরা অনেক বড় দরের অপরাধী, এত ছোট কাজ করবে বলে মনে হয় না। মুদ্রা যারা জাল করছে, ওরা হয়তো সাধারণ একটা দল, ছিঁচকে চুরি থেকে ছোটখাট নানা রকম অপরাধ করে। তবে এমন হতে পারে, সোনা পাচারকারীদের কাউকে দলে নিয়েছে। ওকে ধরা গেলে বড় দলটারও খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।'

'আপনি গিয়ে খনিতে কাউকে পাননি, না?'

'না। অনেক দিন আগেই চলে গেছে ওরা।' নড়েচড়ে বসলেন সাইমন। বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের কথা বলো। মিস্টার স্প্যানিশের খবর কি?'

সাইমনের সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পর যা যা ঘটেছে, প্রায় সবই বলল কিশোর আর রবিন। রেড হিলে গিয়ে কি ভাবে হব গুনকে পাকড়াও করেছে, জানাল।

কথা শেষ করে বাড়ি রওনা হলো ওরা।

ইয়ার্ডে ফিরতে মেরিচাচী খবর দিলেন, মুসা ফোন করেছিল। কিশোররা কোথায় গেছে, জানতে চেয়েছিল। বলতে পারেননি তিনি। খুব নাকি উত্তেজিত

হয়ে আছে সে। চাচীকে বলতে বলেছে, কিশোর ফিরলেই যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

ফোন করল কিশোর।

'কোথায় গিয়েছিলে?' সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে আছে মুসা, কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল।

'কেন? কিছু ঘটেছে?' বলল কিশোর।

'জলদি চলে এসো!' মুসা বলল। 'অনেক বড় খবর আছে!'

'কি, বলো না?'

'এলেই দেখতে পাবে,' লাইন কেটে দিল মুসা।

বিশ

'কি বলল?' জানতে চাইল রবিন।

'এমন ভঙ্গি করল, যেন সোনার খনি আবিষ্কার করেছে,' রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। 'যেতে বলল এক্ষুণি। চলো, যাই।'

'খেয়ে যা,' চাচী বললেন। 'দুপুর তো হয়ে গেছে।'

সুতরাং বেরোতে আরও দেরি হলো দুজনের। দুটোর পর পৌছল মুসাদের ওখানে।

মুসা বাড়িতে একা। আর কেউ নেই। পেছনের বাগানে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে। তবে তার আগে বড় এক বাসন ডোনাট সাবাড় করে নিয়েছে। খালি বাসনটা পড়ে আছে চেয়ারের ওপর।

ওদের দেখেই বলে উঠল, 'এসেছ! চলো, দেখাব!' ঘরের দিকে রওনা দিল সে। রান্নাঘরে এসে টেবিলে রাখা একটা বাক্স দেখিয়ে বলল, 'খেতের মধ্যে এক জায়গায় দেখি নতুন করে খোঁড়া হয়েছে। সন্দেহ হলো। একটা শাবল নিয়ে আমিও কাজে লেগে গেলাম। ওখানেই পেয়েছি এটা।'

বাক্সটা খুলে দেখাল দুই বন্ধুকে।

ভেতরে একগাদা সোনার মোহর।

'গুপ্তধন! বুঝলে! নিশ্চয় জলদস্যুদের গুপ্তধন!' গুপ্তধনের গল্প নিয়ে বানানো একটা সিনেমা দেখেছিল মুসা। সেটাতে নায়ক যা করেছে, তেমনি ভাবে এক মুঠো মোহর তুলে নিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দিল। হা-হা করে হেসে উঠে নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলল, 'আমি এখন লক্ষপতি!'

মোহরগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল কিশোর আর রবিন। ওগুলোর নিচে বাক্সের তলা থেকে বেরোল কয়েকটা নম্বর দেয়া মলাটের টুকরো, ওগুলোতে মোহরের বর্ণনা লেখা রয়েছে।

একটা টুকরো উল্টে দেখল কিশোর। স্থির হয়ে গেল হাত। নিচে লেখা:

জে অ্যানসন।

অন্য টুকরোগুলোও উল্টে উল্টে দেখল। সব কটাতে একই নাম লেখা।

মুখ তুলে মুসাকে বলল কিশোর, 'সাংঘাতিক একটা আবিষ্কার যে করেছ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, জলদস্যুর গুপ্তধন নয় এগুলো। তোমাদের জায়গায় পাওয়া গেলেও তুমি রাখতে পারছ না।'

'মানে?'

'এগুলো জে অ্যানসনের মোহর। তাঁর বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছিল।'

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল মুসার। এতটা নিরাশ হতে হবে কল্পনাও করেনি। তবে সামলে নিতে সময় লাগল না। আবার উজ্জ্বল হলো চোখমুখ। হাত নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, লক্ষপতি নাহয় না-ই হলাম, একজনের চুরি যাওয়া মাল তো উদ্ধার করে দিলাম। তাই বা কম কিসে। এগুলো ফেরত পেলে খুব খুশি হবেন অ্যানসন। কখন দিতে যাবে?'

'এখনও যাওয়া যায়। তুমিও চলো।'

'না, বাড়ি ফেলে আমি যেতে পারব না। মা মানা করে দিয়েছে। তোমরা যাও। আমি বরং আবার গিয়ে শাবল তুলে নিই। গুপ্তধন বের না করে এবার ছাড়ব না। ভাল কথা, শুঁটকির সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?'

'না তো,' চোখের পাতা সরু করে ফেলল রবিন। 'কেন?'

'খানিক আগে এসেছিল। হাতে এয়ারগান। সেদিন নাকি অনেকগুলো কাঠবেড়ালি পেয়েছে। লোভে পড়ে আবার এসেছে আজকে।'

'এদিক দিয়ে যাবার কি দরকার? রাস্তা তো আরও আছে।'

'আমার মনে হয় কুমতলব আছে তার। দূর থেকে আমাকে রোজ রোজ খুঁড়তে দেখে তো, শিকারে বেরোনোর ভান করে দেখতে আসে কি করছি।'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'বাক্সটা কোনখানে পেয়েছ?'

হাসল মুসা। 'ম্যাপটা ফেলে গিয়েছিলে। চোর কোনখান দিয়ে যায়, দাগ দিয়ে রেখেছ। মনে হলো, দেখি তো চোরের যাতায়াতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা? কিছুদূর এগোতেই দেখি, যে কুয়াটায় পড়েছি তার পাঁচশো ফুট দূরে মাটি খুঁড়ে আবার বুজিয়ে দেয়া হয়েছে। শাবল দিয়ে কয়েকটা ঘা দিতেই বাক্সে বাড়ি লাগল ঠং করে।'

'একটা কাজের কাজই করেছ। আরও শিওর হলাম, রকি বীচ থেকে চুরি করে চোর সোজা পশ্চিমে অটিংটনের দিকে চলে যায় ওদের গোপন আস্তানায়, আর যায় তোমাদের জায়গার ওপর দিয়ে। যাওয়ার সময় চোরাই মাল এখানে লুকিয়ে রেখে যায়।'

বাক্স ভর্তি মোহর নিয়ে রকি বীচে ফিরে চলল কিশোর আর রবিন।

শখের জিনিস ফেরত পেয়ে আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো অ্যানসনের। ছেলেদের পুরস্কৃত করতে চাইলেন। কিন্তু নিল না ওরা। চাপাচাপি শুরু করলেন তিনি, নিতেই হবে। শেষে বাধ্য হয়ে বলল রবিন, 'আসলে জিনিসগুলো আমরা বের করিনি। খুঁজে পেয়েছে আমাদের বন্ধু মুসা আমান।'

অ্যানসন বললেন, 'তাহলে তাকে একটা চেক পাঠাব। তোমরা জানো না মোহরগুলো আমার কাছে কতটা দামী। টাকা দিয়ে এর দাম শোধ করা যাবে না।

কিন্তু একটা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে এগুলো মাটি চাপা দিয়ে রাখল, ভাবলে অদ্ভুত লাগে না?'

ওদের সন্দেহের কথা জানাল কিশোর।

ইয়ার্ডে ফেরার পথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল কিশোর আর রবিন।

রবিনের ধারণা, ওগুলো আপাতত লুকিয়ে রাখার জন্যে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে তুলে নিয়ে গিয়ে গলিয়ে ফেলত। বলল, 'আচ্ছা, পুরানো কুয়াটায় আর লুকাল না কেন ? ওটার খোঁজ আমরা জেনে গেছি বলে?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'তবে আমার ধারণা, কুয়ার খোঁজ যে আমরা পেয়ে গেছি, এটা জানে না সে। জানলে এই এলাকায় আর লুকাতে আসত না। বার বার এক জায়গায় লুকায় না তার কারণ এক জায়গার মাল আবিষ্কার হয়ে গেলেও যাতে বাকিগুলো ঠিক থাকে। এটাও চালাকি।'

'কিন্তু এ ভাবে লুকাতে যায় কেন? ঘরবাড়ি নেই?'

'ঘরে পুলিশের তল্লাশির ভয় আছে। আরও একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার, সহকর্মীদের সঙ্গেও বেঈমানী করছে সে। ঠকাচ্ছে ওদের। কিছুদিন লুকিয়ে রাখার পর সময় বুঝে তুলে নিয়ে যেত একলা মেরে দেয়ার জন্যে।'

'সঙ্গীরা মালগুলোর কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে ওগুলো হারিয়ে গেছে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওই লোকটা নিশ্চয় বেরিং।...আরে হ্যাঁ, উত্তেজনায় আসল কথাটাই ভুলে গেছিলাম। অ্যানসনের জিনিস যে পাওয়া গেছে, পুলিশকে জানানো দরকার।'

'তিনিই জানাবেন।'

'উত্তেজনায় ভুলে বসে থাকতে পারেন। না-ও জানাতে পারেন।'

একটা দোকানের সামনে গাড়ি রাখল রবিন।

ফোন করার জন্যে নেমে গেল কিশোর। রবিনও চলল তার সঙ্গে।

কিশোরের অনুমানই ঠিক, অ্যানসন জানাননি পুলিশকে।

চীফ বললেন, 'জানিয়ে ভাল করেছ। মুসাদের বাড়িতে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। গিয়ে ওকে সাহায্য করুক। বলা যায় না, ওখানেই কোনখানে ডুগানের মোহরগুলোও পাওয়া যেতে পারে।'

'মনে হয় না। থাকলে এতক্ষণে পেয়ে যেত মুসা।'

কিশোর যখন কথা বলছে, রবিন তখন তাকিয়ে আছে দোকানের জানালা দিয়ে একটা লোকের দিকে। তার সন্দেহ হয়েছে, লোকটার নজর ওদেরই ওপর। আস্তে করে কিশোরের কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, 'ওদিকে দেখো!'

তাকাল কিশোর। তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল। ছাই রঙের স্যুট পরা লম্বা একজন লোক। ঠোঁটে পাতলা গোঁফ। নিশ্চয় এই লোককেই সেদিন ইয়ার্ডের ওপর নজর রাখতে দেখেছিলেন মেরিচাচী।

উত্তেজিত হয়ে চীফকে বলল কিশোর, 'স্যার, একজনকে দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় আমাদেরই পিছু নিয়েছে।' দোকানের ঠিকানা দিয়ে বলল, 'আপনি এখুনি এখানে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমরা আর ওর সামনে যাচ্ছি না। বরং পেছনে লাগব। কোথায় যায় দেখব।'

'ঠিক আছে। চোখের আড়াল কোরো না। পেট্রোল কারকে মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি।'

একুশ

কাউন্টারের মেয়েটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। তাকে বলল সে, 'আমরা কোনদিকে গেছি, পুলিশ এলে বলবেন।'

রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে পেছনের দরজার দিকে রওনা হলে গেল কিশোর। লুকিয়ে রইল দুটো র‍্যাকের মাঝখানের ফাঁকে। চোখ রাখল সামনের দরজার ওপর।

পাঁচ মিনিট পর দোকানে ঢুকল লোকটা। এদিক ওদিক তাকাল। নিশ্চয় গোয়েন্দাদের খুঁজছে। অবাক হলো বলে মনে হলো। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভাবল বোধহয় জিজ্ঞেস করবে কিনা। করল না। একবার দ্বিধা করে পেছনের দরজার দিকে আসতে লাগল।

চট করে কয়েকটা বড় বাক্সের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন।

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। সে নিশ্চয় ভেবেছে এ পথে বেরিয়ে গেছে ছেলেরা।

রবিনকে তার পিছু নিতে বলল কিশোর।

আধ মিনিট সময় দিল সে। লোকটা যদি দরজার বাইরেই অপেক্ষা করে, এতক্ষণে রবিনকে দেখে ফেলেছে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই রবিনকে পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল কিশোর।

সিঁড়ি থেকে নেমে দৌড় দিল সে। সরাসরি না গিয়ে, রাস্তা ক্রস করে চলে এল অন্য পাড়ে। সরু একটা গলি পেরিয়ে চলে এল পরের ব্লকের রাস্তায়। সেটা পার হয়ে ডক এলাকার দিকে চলল। লোকটার পিছু নিয়ে রবিন যেদিকে মোড় নিয়েছে, তাতে এদিকেই আসতে হবে ওদেরকে। যদি লোকটা কোথাও থেমে না যায়।

কিন্তু এল না ওরা।

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে সেদিকে এগোল সে। একটা বাড়ির পাশে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রবিনকে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'এদিকে এসে কোথায় জানি হারিয়ে গেল!'

আশপাশে তাকিয়ে লুকানোর আর কোন জায়গা দেখল না ওরা, বাড়িটা ছাড়া। ওটার সদর দরজার দিকে তাকিয়েই অপেক্ষা করতে লাগল।

ওটাতেই ঢুকেছিল। খানিক পর বেরিয়ে এল লোকটা। কোনদিকে না তাকিয়ে

একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল।

পিছু নিল দুই গোয়েন্দা। দুই ধারে উঁচু উঁচু পুরানো আমলের বাড়ি। লোকটাকে দেখতে পেল না। আবার অদৃশ্য হয়েছে।

একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে লোকটা কোনদিকে গেছে বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর, হঠাৎ একটা দেয়ালের আড়াল থেকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কে যেন। প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে একটা দরজার ওপাশে নিয়ে এল। পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। খিকখিক করে হাসি শোনা গেল।

কঠিন থাবা চেপে ধরল কিশোরের কাঁধ। ঠেলে নিয়ে চলল ওকে সামনের দিকে। পাশে হুটোপুটি শুনে আন্দাজ করতে পারল রবিনকেও একই ভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বোধহয় একটা ঘরে এনেই দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওদের।

অন্ধকারে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'এসো, এসো, পাইরেট লঙ জন সিলভারের জাহাজে স্বাগতম!'

চমকে গেল কিশোর আর রবিন দুজনেই। সেই জলদস্যু! যার কথা বলেছে হব গুন?

সুইচ টেপার শব্দ হলো। আলো জ্বলে উঠল। কিশোর দেখল, তাকে যে ধরেছে সে বিশালদেহী। রোমশ শরীর। বড় বড় চুল। মুখ ভর্তি দাড়ি। নোংরা হলদে দাঁত বের করে হাসল সে। 'আমি লঙ জন সিলভার। ট্রেজার আইল্যান্ড পড়েছ নিশ্চয়? খোঁড়া ডাকাতের নাম অনুসারেই আমার নাম রেখেছিল বাবা। কারণ সে-ও ডাকাত ছিল। আমাদের আসলে ডাকাতেরই বংশ। কার রক্ত বইছে শরীরে, জানো? জলদস্যু ব্ল্যাকবিয়ার্ডের। নাম শুনেছ? তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন।'

ব্ল্যাকবিয়ার্ডের বংশধর! নিজের অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিল রবিনের। জলদস্যুদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল ব্ল্যাকবিয়ার্ড। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল এক সময়।

একধারে দাঁড়িয়ে আছে ছাই রঙের স্যুট পরা লোকটা, যার পিছু নিয়ে ওরা এখানে ঢুকেছে। গদগদ ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে সিলভারের দিকে। যেন গুরুর দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমাদের ধরে এনেছেন কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'কে বলল ধরে এনেছি?' খ্যাকখ্যাক করে হাসল সিলভার। 'তোমরা নিজে নিজেই এসেছ।' অন্য লোকটার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল সে, 'কোরজাক, কি বলেছিলাম? বলেছি না ওদের এখানে আনাটা কোন ব্যাপার না? গিয়ে দেখা দেবে কেবল, আর কিছু করতে হবে না, পিছে পিছে চলে আসবে...এখন হলো তো?'

মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল কোরজাক, খাঁটি গোলামের ভঙ্গিতে। দস্যু-সর্দারের যোগ্য সহচর।

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'আমরাই এসেছি। কিন্তু আমাদের আটকেছেন কেন?'

‘বুঝবে। বুঝতে পারবে সময় হলেই,’ রহস্যময় কণ্ঠে বলল সিলভার। টেবিলে রাখা একটা কৌটা নিয়ে এল। জিনিসটা অনেক পুরানো, গায়ের খোদাই-কর্ম দেখেই বোঝা যায়। মুখ খুলে কিশোরের নাকের কাছে ধরল।

মিষ্টি একটা গা গুলিয়ে ওঠা গন্ধ নাকে ঢুকল ওর। ঝট করে নাক সরিয়ে নিল।

রবিনের নাকের কাছেও কৌটাটা ধরল সিলভার। আবার টেবিলে রেখে দিল আগের জায়গায়।

অবাক হয়ে ভাবছে দুই গোয়েন্দা, এই গন্ধ শোঁকাল কেন ডাকাতটা?

‘কথা আছে তোমাদের সঙ্গে,’ হেসে বলল সিলভার। ‘তবে তার আগে তোমাদের মেজাজ ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করলাম, যাতে গোলমাল করতে না পারো। একবার যখন শুঁকিয়ে ফেলেছি, পালানোর চেষ্টা করে আর লাভ নেই। পারবে না।’

ঘাবড়ে গেল কিশোর। কৌটোটা শোঁকানোর সময় কিছু বোঝেনি বলে গালাগাল করতে লাগল নিজেকে। ভুল যা করার করে ফেলেছে। হঠাৎ করে যেন অবশ হয়ে যেতে লাগল শরীর, বোধ চলে যাচ্ছে মাংসপেশী থেকে। কোনমতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না আর। টলে পড়ে যেতে শুরু করল।

রবিনেরও একই অবস্থা।

ধরে ওদেরকে দুটো চেয়ারে বসিয়ে দিল সিলভার আর কোরজাক।

বাইশ

আজব এক ওষুধের শিকার হয়েছে কিশোর আর রবিন। এমন পরিস্থিতিতে জীবনে পড়েনি। মগজ কাজ করছে ঠিকমতই, কিন্তু হাত-পা নড়াতে পারছে না। পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে যেন। নেতিয়ে পড়ে আছে চেয়ারে।

‘কেন ধরে এনেছি জিজ্ঞেস করেছিলে না?’ সিলভার বলল, ‘তোমাদের গায়ে উল্কি আঁকার জন্যে। কেন আঁকব, নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে তোমাদের?’

চুপ করে রইল কিশোর।

সিলভার বলল, ‘আমার কানে এসেছে, মোহরের ব্যাপারে নাকি তোমরা আগ্রহী।’

দাড়িতে আঙুল চালাল সে।

‘একটা গল্প শোনো,’ সিলভারের চোখে মিটিমিটি হাসি, দুই গোয়েন্দার এই বেতাল অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছে যেন সে, ‘একবার মেকসিকোর এক ধনী পরিবারের প্রচুর মোহর চুরি গিয়েছিল। কথাটা শুনেছি এক নাবিকের মুখে, মারা যাচ্ছিল তখন সে। যারা চুরি করেছিল, সে তাদেরই একজন। চোরেরা ওগুলো লুকিয়ে রেখেছিল একটা গুহার মধ্যে। সেই গুহা পাহারা দেয় অনেক সাপ।’

থেমে গোয়েন্দাদের চোখের দিকে তাকাল সিলভার। ওরা তার গল্প শুনতে আগ্রহী কিনা দেখল।

'চোরদের সব কজনের ভাগ্যে অভিশাপ নেমে এল,' বলল সে। 'এক এক করে অপঘাতে মারা পড়ল সবাই। আমাকে যে বলেছে, তারও একই দশা হয়েছিল। তার কাছে তখন বেশ কিছু মোহর ছিল। সেগুলো দিয়েছিল আমাকে। নেয়ার পর থেকেই পস্তাচ্ছি। আমারও খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। অভিশপ্ত ওই মোহর!'

'অভিশাপটা কি?' জানতে চাইল কিশোর। স্বরটা নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগল। জড়ানো কণ্ঠ, ঠোঁট নড়াতে পারছে না ঠিকমত।

'দা কার্স অভ দি ক্যারিবিস!' কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল সিলভার, জোরে বলার সাহস নেই। 'আগে এ কথা জানলে মোহরগুলো কখনোই চুরি করত না ওরা। যে চুরি করবে তার ওপরই লাগবে মোহরের অভিশাপ। কথাটা আমি বিশ্বাস করি। আমার ওপরও লেগেছে। তবে এই অভিশাপ কাটানোরও উপায় আছে।'

শার্টের হাতা গুটিয়ে কনুইয়ের ওপর তুলে দিল সিলভার। গোয়েন্দাদের দেখাল বাহুতে উল্কি দিয়ে আঁকা অনেকগুলো পেঁচানো সাপের ছবি।

'গায়ে সাপের ছবি এঁকে গুহায় ঢুকলে নাকি ক্যারিবিসের অভিশাপ কাজ করবে না। নিশ্চিন্তে তখন মোহর বের করে নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু কথাটা ঠিক না। করে দেখেছি, কাজ হয়নি। খুঁজে পাইনি মোহরগুলো।'

লোকটার মাথার স্থিরতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিল দুই গোয়েন্দার।

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সোনার মোহর বের করে আনল সিলভার। 'এই দেখো, এটা অভিশপ্ত।'

অবাক হয়ে দেখল কিশোর আর রবিন, মিস্টার স্প্যানিশের মোহরটা আর এটা অবিকল এক।

'অভিশাপ কাটানোর নানা চেষ্টা করলাম,' সিলভার বলল, 'প্রথমে শুনলাম, সাপের ছবি আঁকতে হবে। তারপর শুনলাম, মোহরে যে মহিলার মুখ ছাপ দেয়া আছে, সেটার মত করে গায়ে উল্কি এঁকে গুহায় ঢুকলে অভিশাপ কেটে যাবে। আঁকলাম। কাজ হলো না। শেষে এক বুড়ি ওঝাকে গিয়ে ধরলাম। সে বলল, উল্কি আঁকলে কাজ ঠিকই হবে, তবে মোহর যার দরকার, যে নেবে, তার গায়ে না, অন্য কারও গায়ে এঁকে তাকে দিয়ে গুহা থেকে বের করে আনাতে হবে। তা-ও করে দেখলাম, তাতেও কাজ হলো না।'

'হব গুন!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'কি বললে?'

'না, কিছু না।'

কিশোরের কথা ঠিকমত বুঝতে পারেনি সিলভার, তাই আর এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করল না। বলল, 'আবার গেলাম ওঝার কাছে। সে বলল, যাকে-তাকে গুহায় ঢোকালে আনতে পারবে না। এমন লোক হতে হবে, মোহরের ব্যাপারে যে আগ্রহী হবে, অথচ মোহরের লোভ নেই, কোন রকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। খোঁজ নিতে আরম্ভ করলাম। কঠিন মনে হলো সে-রকম লোক পাওয়া। বিশ্বাস করবে, একজনকেও পেলাম না। কোন না কোন একটা খুঁত থাকেই। মোহরে আগ্রহ আছে

তো লোভ নেই, লোভ নেই তো কুসংস্কার আছে, আবার কুসংস্কার নেই তো মোহরের লোভ ষোলোআনা আছে। হাল না ছেড়ে খুঁজতে থাকলাম। শেষে পেয়ে গেলাম তোমাদের খবর। তোমাদের এক বন্ধু বলেছে কোরজাককে। খোঁজ দেয়ার জন্যে বেশ কিছু টাকাও আদায় করে নিয়েছে।'

'আমাদের বন্ধু টাকা খেয়ে আমাদের ক্ষতি করবে!' অবাক হলো রবিন। 'কে সে? নাম বলেছে?'

মাথা ঝাঁকাল সিলভার। 'হ্যাঁ, টেরিয়ার ডয়েল।'

রাগে বারুদের মত জ্বলে উঠল রবিন। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'শুঁটকি!'

ভুরু কোঁচকাল সিলভার, 'কি বললে?'

'না, কিছু না!'

'কথা বলছ, আবার জিজ্ঞেস করলেই বলছ কিছু না, ব্যাপারটা কি বলো তো?'

জবাব দিল না রবিন।

চুপ করে একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল সিলভার। কি বলেছে, জানার জন্যে চাপাচাপি করল না। কোরজাককে বলল, 'কালিটালি নিয়ে এসো। অহেতুক দেরি করার কোন মানে হয় না।' কিশোরদের দিকে ফিরে বলল, 'আমি খুব ভাল উল্কি আঁকতে পারি। গর্ব করে দেখাতে পারবে বন্ধুদের।'

গায়ে উল্কি এঁকে রাখাটা জঘন্য লাগে কিশোরের কাছে। উল্কির সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, এমন কালির কালি, আর এমন ভাবে আঁকা হয়, কোনদিন আর ওঠে না। হাত-পা নড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল সে। একচুল নড়াতে পারল না।

উল্কি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে এল কোরজাক।

প্রথমে কিশোরের দিকে এগিয়ে এল সিলভার। হেসে বলল, 'ভয় পেয়ো না, বেশি আঁকব না; দুই বাহুতে দুটো সাপ, আর বুকে একটা মেয়েমানুষের মুখ। তারপরেও অনেক জায়গা বাকি থাকবে। কখনও অন্য কিছু আঁকতে চাইলে এঁকে নিতে পারবে।'

কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করল কিশোরের। কোনদিন মানুষের সামনে আর খোলা গায়ে বেরোতে পারবে না!

ঠিক এই সময় দরজায় ধাক্কা দেয়ার শব্দ হলো।

চমকে গেল সিলভার। কোরজাককে বলল, 'দেখো তো কে এল! জানতাম, ক্যারিবিসের অভিশাপ কোনমতেই আমাকে শান্তিতে কাজ করতে দেবে না! এসেছে কেউ জ্বালাতে!'

দরজা খুলতে চলে গেল কোরজাক।

মিনিটখানেক পরই ফিরে এল, তবে একা না। তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসা হলো। উদ্যত পিস্তল হাতে সঙ্গে ঢুকেছে চারজন পুলিশ অফিসার। তাদের একজন তিন গোয়েন্দার পরিচিত, মরিস ডুবয়।

গোয়েন্দাদের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ডুবয়। তারপর সঙ্গীদের আদেশ দিল সিলভারকে ধরার জন্যে।

কোরজাকের হাতে হাতকড়া পরানো হলো।

সিলভারের দিকে হাতকড়া নিয়ে এগোতেই দুই হাত শূন্যে তুলে প্রায় নাচতে শুরু করল সে, 'না না, আমাকে ধ'রো না! মরবে বলে দিলাম! আমি যে সে লোক নই, লঙ জন সিলভার, ব্ল্যাকবিয়ার্ডের বংশধর! তিনি কে ছিলেন জানো? স্প্যানিশ মেইনের সবচেয়ে বড় জলদস্যু! আমাকে ধরলে অভিশাপ দেব...'

কিন্তু অভিশাপের ভয় করল না ডুবয়। হাতকড়া পরিয়ে দিতে দিতে মুচকি হেসে বলল, 'আপাতত দস্যুগিরি ছাড়তে হবে তোমাকে, সিলভার। আমরা তোমার জাহাজ দখল করে নিয়েছি।'

তেইশ

কিশোর আর রবিন উঠছে না, বসেই আছে চেয়ারে। সন্দেহ হলো ডুবয়ের।

জড়িত কণ্ঠে ওরা জানাল, উঠতে পারছে না। ধরাধরি করে ওদেরকে বাইরে নিয়ে আসা হলো। খোলা বাতাসে দ্রুত কেটে গেল ওষুধের ক্রিয়া। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

পুলিশের গাড়িতে করে দুজনকে ইয়ার্ডে পৌঁছে দেয়া হলো।

বাড়ি এসে মিস্টার সাইমনকে ফোন করল কিশোর। কিছুক্ষণ আগে যা যা ঘটেছে সব জানিয়ে বলল, 'সিলভার বলছে কোন গুহায় মোহর লুকানো আছে সে জানে। হব গুনকে যে গুহায় ঢুকিয়েছিল সেটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে সত্যি কিনা।'

'কি ধরনের মোহর বলেছে তোমাদের?'

'বলেনি। জিজ্ঞেস করারও সুযোগ পাইনি।'

'ঠিক আছে, ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করছি। আগেই সন্দেহ করেছিলাম সব কিছুর উৎস রয়েছে মেকসিকোতে। তাই একটা মোহর পাঠিয়ে কর্তৃপক্ষকে খোঁজ নিতে বলে দিয়েছি। যে কোন সময় খবর এসে যাবে। কিছু জানলে জানাব তোমাদের। রাখি।'

ঘন্টাখানেক পর নিজেই এসে হাজির হলেন তিনি। বললেন, 'সিলভার এখনও সব বলছে না। তবে মেকসিকো থেকে খবর এসেছে। ওরা বলছে, ক্যারাবায়ার ডিয়াজো পরিবার থেকে নাকি অনেক বছর আগে এক বস্তা মোহর চুরি হয়েছিল, আমি যেটা পাঠিয়েছি সেটার মত। আমারটার সঙ্গে মিস্টার স্প্যানিশের মোহরটারও মিল আছে। ধারণা করছি, এগুলো সব এক জায়গা থেকেই এসেছে।'

'ক্যারাবায়া?' রবিন বলল, 'আচ্ছা, কার্স অভ দা ক্যারাবায়াই উচ্চারণ বিকৃতির কারণে ক্যারিবিস হয়ে যায়নি তো?'

কিশোর ততক্ষণে র‍্যাকের কাছে চলে গেছে ম্যাপ বই আনার জন্যে। পাতা খুলে দেখতে দেখতে এক জায়গায় আঙুল রেখে বলে উঠল, 'এই যে ক্যারাবায়া!'

'তার মানে জট খুলতে আরম্ভ করেছে এই রহস্যের। মিস্টার স্প্যানিশ ডিয়াজো পরিবারের লোক নয় তো? চলো না; জিজ্ঞেস করি।'

'দাঁড়াও, আগে আরও খোঁজ-খবর করে নিই,' বাধা দিলেন সাইমন। স্টেট ডিপার্টমেন্টকে ফোন করে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে অনুরোধ করলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই খবর পাওয়া গেল। রিসিভার নামিয়ে রেখে হাসিমুখে ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'ডিয়াজো পরিবারের এখনকার কর্তার নাম অ্যাকোনা ডিয়াজো। বর্তমানে সে আমেরিকা সফরে রয়েছে।'

'মিস্টার স্প্যানিশ?' প্রায় চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'হতে পারে। সিনর অ্যাকোনার বয়েস পঁয়ত্রিশ। আমেরিকায় আসার সময় সঙ্গে একজন চাকর আর একটা ছোট জাতের কুকুর নিয়ে এসেছিল। চাকরের নাম রিভেরা, কুকুরটার নাম পিকো।'

'এবং এই সিনর অ্যাকোনা নিখোঁজ হয়েছে?'

'এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না স্টেট ডিপার্টমেন্ট। আমেরিকা সফরে এসেছে অ্যাকোনা, তাতে সময় বেশি লাগতেই পারে। পরিবারের লোকজনের সন্দেহ না হলে খোঁজ করবে না, আর ওরা না করলে ডিপার্টমেন্টও কিছু জানতে পারবে না।'

আবার মিস্টার স্প্যানিশকে জিজ্ঞেস করতে যাবার কথা বলল রবিন।

সাইমন বললেন, এ ভাবে জিজ্ঞেস করে লাভ হবে না। স্মৃতিশক্তি ফিরে না এলে কিছু বলতে পারবে না সে। তার কাছে মিস্টার স্প্যানিশ নামটাও যা, ডিয়াজোও তাই।

'অন্য উপায় বের করতে হবে,' বললেন তিনি। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। কিশোর, ও কি করছে?'

'বোধহয় ঘুমাচ্ছে। একটু আগে তো দেখলাম।'

'চট করে গিয়ে আবার দেখে এসো তো। ঘুমিয়ে থাকলে জাগিয়ো না।'

দেখে এল কিশোর। এখনও ঘুমাচ্ছে।

'গুড,' হাসলেন ডিটেকটিভ। 'সচেতন মন সাড়া না দিলেও অবচেতন মন অনেক সময় সাড়া দেয়। সেটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। স্মৃতিশক্তি নষ্ট হলেও স্মৃতি থেকে সব কথা পুরোপুরি মুছে যায় না কখনোই। ঠিক চাবিটা ব্যবহার করতে পারলে আবার জায়গামত ফিরে আসে সব। আমরা তাকে স্মৃতি ফেরাতে সাহায্য করব। চলো, কোন ঘরে আছে, দেখাও।'

যাওয়ার আগে তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলেন সাইমন। খুব সহজ পদ্ধতি। কিশোর আর রবিন দুজনের কেউই আশা করতে পারল না, এতে কাজ হবে।

নিঃশব্দে মিস্টার স্প্যানিশের ঘরে চলে এল তিনজনে। জানালার পর্দা টানা। বিছানার পাশে এসে তার কানের কাছে ঝুঁকে নিচু স্বরে বললেন সাইমন, 'বুয়েনাস ডায়াজ, সিনর ডিয়াজো!'

নড়ে উঠল মিস্টার স্প্যানিশ, কিন্তু চোখ মেলল না।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন সাইমন।

ছোট কুকুরের গলা নকল করে মৃদু স্বরে ডেকে উঠল কিশোর।

'আহ্, চেঁচাসনে, পিটো!' আস্তে ধমক দিলেন সাইমন। 'সাহেব জেগে যাবেন!'

রবিন ডাকল, 'রিভেরা, রিভেরা, শুনে যাও!'
ঘুমের মধ্যেই অস্থির হয়ে নড়তে লাগল মিস্টার স্প্যানিশ।
ইশারায় রবিন আর কিশোরকে বেরিয়ে যেতে বললেন সাইমন। ওরা বেরোতেই নিজেও বেরিয়ে চলে এলেন যেমন নিঃশব্দে ঢুকেছিলেন তেমনি করে।
দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।
ওখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আবার ডাকল রবিন, 'রিভেরা, রিভেরা!'
কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করল কিশোর।
'চুপ, পিটো, তোকে চুপ থাকতে বলছি না!' ধমক দিলেন সাইমন। 'রিভেরা, যাও, সিনর ডিয়াজোকে জাগানোর সময় হলো।'
দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল কিশোর।
জেগে গেছে মিস্টার স্প্যানিশ। উঠে বসল। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।
ধীরপায়ে ঘরে ঢুকল সে।

চব্বিশ

'গুড আফটারনুন, সিনর ডিয়াজো,' হেসে বলল কিশোর।
'গুড আফটারনুন,' খুব অবাক হয়েছে মিস্টার স্প্যানিশ। 'তুমি কে? রিভেরা কোথায়? তাকে এখুনি পাঠাও আমার কাছে।'
'সরি,' কিশোর জবাব দিল, 'রিভেরা এখানে নেই...'
'নেই! অসম্ভব! সে সব সময়...' হঠাৎ করেই যেন সব লক্ষ করল মিস্টার স্প্যানিশ। 'আরে, আমি কোথায়! এ তো আমার ঘর নয়! তুমি কে?'
'আমাকে চিনতে পারছেন না, মিস্টার স্প্যানিশ? আমি, কিশোর পাশা।'
ওকে অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়ল মিস্টার স্প্যানিশ। 'না, কখনও দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। ঘটনাটা কি, সব খুলে বলো তো আমাকে। কে তুমি, আর আমিই বা এখানে কেন?'
রবিনকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন সাইমন। হেসে বললেন, 'আস্তে আস্তে সব জানতে পারবেন, সিনর ডিয়াজো। আপনি ডিয়াজোই তো?'
'হ্যাঁ। অ্যাকোনা ডিয়াজো।'
'আপনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আপনি। এখন আর ভয় নেই। আমরা আপনার বন্ধু। আপনাকে সুস্থ করার চেষ্টা করছি আমরা।'
দুই হাতে চোখ রগরাল অ্যাকোনা। আবার তাকাল। 'হ্যাঁ, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এই সময় একটা লোক এসে কথা বলতে শুরু করল আমার সঙ্গে। হঠাৎ কি যেন বের করে বাড়ি মারল মাথায়। তারপর কি হয়েছে আর কিছু মনে নেই।'
'সেটা কয়েক দিন আগের ঘটনা,' কিশোর বলল। 'আপনি তখন কোথায়

ছিলেন, কোথায় যাচ্ছিলেন, মনে আছে?'

'আমি রকি বীচে ছিলাম। ভিকটর সাইমন নামে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। সব মনে আছে। কেন?'

'কয়েক দিন আগে হুঁশ ফেরার পর কিন্তু এ সব কিছুই মনে করতে পারেননি। স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অতীতের কথা কিছুই বলতে পারছিলেন না। অনেক চেষ্টা করে আপনার স্মৃতি ফেরানো হয়েছে।'

এই সময় ঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। মিস্টার স্প্যানিশ জেগেছে কিনা দেখতে এসেছেন। চা-নাস্তা দেবেন। কিশোরদেরকে ওখানে দেখে অবাক হলেন।

তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর। খবরটা হজম করতে সময় লাগল তাঁর। মিস্টার স্প্যানিশের স্মৃতি ফিরেছে শুনে খুব খুঁশি হলেন। সবাইকে নিচের লিভিং-রুমে এসে কথা বলতে অনুরোধ করলেন। সেখানে চা দেবেন।

সেটাই ভাল হয়। নিচে নেমে এল সবাই।

'রকি বীচে কেন এসেছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মোহরের সন্ধানে?'

'ও, জানো দেখছি,' মাথা ঝাঁকাল অ্যাকোনা। 'হ্যাঁ, মোহর খুঁজতে। আমার দাদীর দাদীর নাম ছিল মারথা ডিয়াজো। তাঁর সম্মানে তাঁর চেহারার ছাপ দিয়ে দুশো বছর আগে অনেক মোহর তৈরি করিয়েছিলেন তাঁর স্বামী আরমিজো ডিয়াজো। তখন ক্যারাবায়ার বাইরে ব্যবহার হত না সে-সব মুদ্রা। প্রথমে বাইরে নিয়ে যায় মারথার এক নাতি। সেগুলোর লোভে নাতিকে মেকসিকোর পাহাড়ী অঞ্চলে খুন করে একদল ডাকাত। তারপর থেকে একেবারে গায়েব হয়ে যায় মোহরগুলো। বলা হয়, ওগুলোতে ক্যারাবায়ার অভিশাপ দেয়া আছে, চুরি করে নিয়ে গেলে ব্যবহার করতে পারবে না। করলেই অভিশাপ নেমে আসবে চোরের ওপর।'

'অসুস্থ অবস্থায় আপনাকে কার্স অভ দি ক্যারিবিস কথাটা বার বার বলতে শুনেছি,' রবিন বলল।

'শব্দটা আসলে ক্যারাবায়া। উচ্চারণ বিকৃত হয়ে ক্যারিবিস হয়ে গেছে।'

'কিশোর সেটা আগেই আন্দাজ করেছিল। হ্যাঁ, তারপর, বলুন?'

'এই অভিশাপের ব্যাপারটাকে বাবা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর কাছে এটা পরিবারের বদনাম বলে মনে হত। মোহরগুলো কোথায় আছে খুঁজতে শুরু করলেন। কিছু মোহর বেরোল, তবে বেশির ভাগই পাওয়া গেল না। মারা যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেছেন সেগুলো খুঁজে বের করতে।

'আমি চিন্তা করলাম, পুরানো মোহর কার কাছে থাকতে পারে? মনে হলো, এগুলো তো আজকাল বাজারে ব্যবহার হয় না, থাকলে থাকবে মিউজিয়ামে অথবা সংগ্রাহকদের কাছে। সে-ভাবেই খুঁজতে শুরু করলাম। নগদ টাকায় বিক্রি করতে রাজি না-ও হতে পারে ওরা, তাই সঙ্গে রাখলাম নানা রকম পুরানো মোহর, যাতে মারথা ডিয়াজো মোহর পাওয়া গেলে বদলে নিতে পারি।'

'মোহর খুঁজতেই এ দেশে এসেছেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'হ্যাঁ। আমেরিকা আর মেকসিকোর নানা জায়গার মোহর সংগ্রাহকদের ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি দিয়েছি, সঙ্গে দিয়েছি মারথা কয়েনের ছবি। রকি বীচ মিউজিয়াম চিঠির জবাব দিয়ে জানাল, ওদের কাছে এ রকম তিনটা কয়েন আছে। সেগুলো নিতে এসেছি। ইচ্ছে ছিল, তিনটে যখন আছে, এই মোহর আরও থাকতে পারে এ শহরে। খোঁজ করে বের করব। মেকসিকো থেকেই টের পেয়েছি আমার পেছনে লোক লেগেছে। হয়তো জেনে গেছে আমার কাছে মোহর আছে। হোটেল থেকে একদিন চুরি করে প্রায় সবই নিয়ে গেল। রিভেরা আর পিটোকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে সেগুলো উদ্ধার করার জন্যে আমি রয়ে গেলাম। মিস্টার সাইমন, আপনার কাছে যাচ্ছিলাম সেদিন ওগুলোর কথা বলতেই। তখনও আমার সঙ্গে কয়েকটা মারথা ডিয়াজো মোহর ছিল। ওগুলো নেয়ার জন্যে হামলা চালানো হলো আমার ওপর।'

'কারা? চেহারা মনে আছে?'

'আছে। একজনের কালো চশমা, পাতলা দাড়ি। বয়েস পঞ্চাশের বেশি। আরেকজনের লাল চুল। আরও একজন ছিল সম্ভবত, পেছনে, দেখতে পাইনি। হঠাৎ আক্রমণ করল রাস্তার মধ্যে।'

চট করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। বেরিঙের চেহারার সঙ্গে বর্ণনা মিলে যাচ্ছে।

'প্রথমবার ডাকাতির পরই পুলিশকে জানালেন না কেন?'

'বললাম না পরিবারের বদনামের ভয়ে। পুলিশকে জানালেই খবরের কাগজে ছাপা হবে সে-খবর, মেকসিকোর লোকেরা জেনে যাবে। অভিশপ্ত পরিবার মনে করে এলাকার লোকে একঘরে করে দেবে আমাদের। আজও যে কি পরিমাণ কুসংস্কার আছে মানুষের মধ্যে, আপনি ভাল করেই জানেন, আপনাকে খুলে বলার আর প্রয়োজন নেই। যাই হোক, খোঁজ নিয়ে জানলাম রকি বীচের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দার নাম ভিকটর সাইমন।' হাসল অ্যাকোনা। 'তারপর কি ঘটেছে তা তো জানেনই।'

'ঠিক জায়গাতেই যাচ্ছিলেন,' রবিন বলল। 'আমার বিশ্বাস, মারথা ডিয়াজো মোহরগুলো আপনি পাবেন।' সাইমনের দিকে তাকাল, 'স্যার, সিনর ডিয়াজোকে থানায় নিয়ে গেলে কেমন হয়? সিলভারের কাছে? সে মোহরের গুহার খোঁজ জানে।'

'জানে!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাকোনা। 'কে এই সিলভার?'

'মাথা খারাপ এক লোক,' জবাব দিল কিশোর। 'নিজেকে জলদস্যু ব্ল্যাকবিয়ার্ডের বংশধর মনে করে। আমার বিশ্বাস, এই লোকই মেকসিকো থেকে আপনার পিছে লেগেছিল।'

তখুনি থানায় যাওয়ার জন্যে উঠতে গেল সবাই। বাধা দিলেন মেরিচাচী, 'আগে চা-টা শেষ করে নিন, তারপর যান।'

পঁচিশ

থানায় যাওয়ার পুরো পথটা চুপচাপ রইল কিশোর। চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। গভীর চিন্তায় ডুবে রইল। কি যেন ভাবছে।

থানার কাছে এসে মুখ তুলল সে। সাইমনকে বলল, 'স্যার, গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্যে আমাদেরকে দিতে আপত্তি আছে?'

গাড়ি থামালেন ডিটেকটিভ। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন প্যাসেঞ্জার সীটে বসা কিশোরের দিকে। 'না, আপত্তি নেই। কোন বুদ্ধি এসেছে নাকি মাথায়?'

'হ্যাঁ, স্যার। আপনি সিনর ডিয়াজোকে নিয়ে সিলভারের সঙ্গে কথা বলতে যান। আমি আর রবিন যাচ্ছি তাঁর মোহরগুলো খুঁজতে, রকি বীচ থেকে যেগুলো কেড়ে নেয়া হয়েছে। কার্স অভ দি ক্যারিবিস রহস্যের কিনারা তো হলো, জাল মুদ্রা রহস্যেরও সমাধান করতে পারব বলে আশা করি।'

'যাচ্ছ কোথায়, সেটা বলতে অসুবিধে আছে?'

'না, নেই। অটিংটনে।'

আর কোন প্রশ্ন করলেন না সাইমন। অ্যাকোনাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন।

রবিনকে গাড়ি চালাতে বলল কিশোর।

ড্রাইভিং সীটে বসে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি ভেবেছ, বলো তো?'

পকেট থেকে ম্যাপ বের করল কিশোর। 'এই দেখো,' পেন্সিলের দাগ দেখাল সে, 'এটা রেড হিল, এখান থেকে অটিংটন বেশি দূরে নয়। রেড হিলে ব্যাংকে ঢুকেছে বেরিং। ওখানকার একটা বাড়িতে ওকে ঢুকতে দেখেছে একটা মেয়ে। আমরা গিয়ে সেই বাড়িতে বেরিঙের বদলে পেলাম হব গুনকে। আচ্ছা, এবার দেখো, রেডহিল থেকে অটিংটনে যাতায়াত করতে হলে মুসাদের বাড়ির ওপর দিয়ে যাওয়াটাই সোজা। এখনও আমার সন্দেহ, অটিংটনেই আছে মুদ্রা জালিয়াতদের আড্ডা। অতএব, এখন তোমাকে অটিংটনে যেতে হবে। তবে তার আগে মুসাদের বাড়ি হয়ে যাও। ওকেও নেব। তিনজন থাকলে সুবিধে।'

'যদি গুপ্তধন খোঁজা বাদ দিয়ে সঙ্গে যেতে রাজি হয় সে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় তুলল রবিন।

তাঁবুর কাছে পাওয়া গেল মুসাকে।

সিলভারকে ধরার কাহিনী থেকে শুরু করে, ডিয়াজোর স্মৃতি ফিরে পাওয়ার ঘটনা সব জানানো হলো তাকে।

'খাইছে!' বলে উঠল সে। 'আসল রহস্যের কিনারা তো করেই ফেলেছ দেখি! আমাকে আর কি দরকার? আমি বরং এখানেই থাকি। তোমরা যাও অটিংটনে।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল কিশোর। 'কি ব্যাপার? কিছু ঘটেছে নাকি

এখানে?'

রাগ দেখা দিল মুসার চোখে। 'শুঁটকি শয়তানটাকে দেখেছি খানিক আগে, গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল। আমি তাকাতেই সরে গেল।'

'ও, ওটা আবার এসেছে!' রবিনও রেগে গেল। 'সিলভারের কাছে টাকা খেয়ে আমাদের কথা বলেছে। সে বলাতেই তো সিলভার আমাদের ধরে নিয়ে গেল উল্কি আঁকার জন্যে। ওর সঙ্গে আমারও একটা বোঝাপড়া আছে…'

'আমি শিওর, ও আবার আসবে এখানে,' মুসা বলল। 'আমি যে গুপ্তধন খুঁজছি, বুঝে ফেলেছে শয়তানটা। সে-জন্যেই এখান থেকে নড়ব না আমি। মাটি খোঁড়ার ছলে চারদিকে চোখ রাখব, পাহারা দেব। এখান থেকে যায়নি সে। আবার উঁকি দেবে ও। কি করছি দেখবে…'

'ঠিক আছে, তুমি থাকো, আমরা যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'রবিন, এসো।'

'অটিংটনে কোথায় খুঁজবে?' জানতে চাইল মুসা। 'কোন ঠিকানা পেয়েছ?'

'পাইনি। পোস্ট অফিস আর ব্যাংকে খোঁজ নেব। মুদ্রা বদলে নোট নেয়ার জন্যে ওসব জায়গায়ই যাবে বেরিং। কেউ না কেউ তার খোঁজ বলতে পারবেই।'

'যদি না পারে?'

'তখন দেখা যাবে…'

কিশোরের কথা শেষ হলো না। গাছের জটলার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল মুসার চোখ। বলল, 'কেউ মাথা ফেরাবে না। শুঁটকিটা এসেছে। এক কাজ করো, গাড়ির দিকে যাওয়ার ছুতো করে ঘুরে ওর পিছে চলে যাও তোমরা। তোমাদেরকে পৌঁছার জন্যে কয়েক মিনিট সময় দিয়ে সামনে থেকে এগোব আমি। ধরে ব্যাটাকে আজ এমন ধোলাই দেব, বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব।'

নাম ভোলানোর ব্যবস্থা একটা হয়তো করা যেত, কিন্তু গণ্ডগোল করে দিল রবিন। শুকনো ডালে পা দিয়ে ফেলল সে। মট করে শব্দ হলো। ঘুরে তাকাল টেরি। পেছন দিক থেকে কিশোর ও রবিন, আর সামনে থেকে মুসাকে ওভাবে নিঃশব্দে এগোতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। ধরা পড়লে যে কিলের চোটে আজ হাড্ডি একটাও আস্ত থাকবে না আন্দাজ করে নিয়ে মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল। একটা দিকই খোলা আছে, নদীর দিক। সেদিকেই ছুটল।

তাড়া করল তিন গোয়েন্দা।

কিন্তু প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে টেরি, তা ছাড়া হালকা শরীর বলে দৌড়াতে পারে ওদের তিনজনের চেয়ে বেশি। নদী পেরোতে গিয়ে ভেজা পাথরে পা পিছলে আছাড় খেলো। কাদাপানিতে মাখামাখি হয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, এসে পড়েছে তিন গোয়েন্দা। আবার দৌড় দিল।

নদী পার হয়ে খোলা মাঠ পেরিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে চলে গেল রাস্তায়। একটা স্পোর্টসকার পার্ক করা আছে ওখানে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে ওটাতে চড়ে বসল।

হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর ধরা যাবে না বুঝে থেমে গেল মুসা। মাটিতে পড়ে থাকা মোটা একটা ডাল তুলে টেরিকে দেখিয়ে শাসিয়ে বলল, 'এসো আরেকদিন,

এটা রাখলাম! ঠ্যাঙ ভেঙে খোঁড়া করে লাঠি ধরিয়ে দেব হাতে!'
দেরি করল না টেরি। স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।
ধরতে পারল না বলে আফসোস করতে লাগল মুসা।
রবিন নিজেকে গালাগাল করছে।
মুচকি হাসল কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'যে একখান আছাড় খেলো, তাতেই আক্কেল হয়ে গেছে। আর আসবে না।'
টেরির আছাড় খাওয়ার দৃশ্য কল্পনা করে হাসতে লাগল তিনজনেই।
ফেরার পথে নদীতে নেমে মাটির দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল কিশোর। তীরের নরম মাটিতে জুতোর ছাপ বসে আছে। সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'দেখো দেখো, আরও একটা রহস্যের সমাধান হলো। শুঁটকির জুতোর ছাপ। খাদে পাওয়া ছাপ আর এই ছাপ অবিকল এক। প্রথম দিন রাতে আমরা চলে যাওয়ার পর সে-ই এসেছিল খোঁড়ার জন্যে। আড়াল থেকে আমাদের খুঁড়তে দেখেছিল। রাতে নিজেও খুঁড়েছে।'
'তাহলে কি মোহর তুলে নিয়ে গেছে?' মুসার প্রশ্ন।
'না। পেলে আর আসত না। যার মোহর পরে এসে তোমাকে বেহুঁশ করে সে-ই নিয়ে গেছে।'
'যে দুটো পেলাম সেগুলো তাহলে চোরাই মাল? রয়ে গেছিল?'
'তা ছাড়া আর কি?' রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, 'চলো, যাই।'
'অটিংটনে তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
'হ্যাঁ।'
'চলো, আমিও যাব। আর এখানে থেকে লাভ নেই। শুঁটকি আজ আর অন্তত আসবে না।'
'চলো।'

ছাব্বিশ

কিন্তু অটিংটনে পাওয়া গেল না বেরিংকে। ওরা যে ভাবে খুঁজতে এসেছে, সে-ভাবে পাওয়ার কথাও নয়।
কি করা যায়, ভাবতে লাগল কিশোর।
রবিন বলল, 'আবার ভূত-থেকে-ভূতের সাহায্য নিলে হয় না? শুধু অটিংটনের ছেলেমেয়েদের কাছে খবর দেব। একটা মেয়ে পরিচিত আছে আমার।'
মুসা বলল, 'আমারও একটা ছেলের সঙ্গে জানাশোনা আছে, বেসবল খেলে।'
দু-জনই যথেষ্ট, ভাবল কিশোর। ওই দুজনে অটিংটনের আরও পাঁচজন করে দশজনকে ফোন করে খবর জানাবে। ওই দশজন পঞ্চাশজনকে···
তুড়ি বাজাল কিশোর, 'ঠিক আছে, তাই করব। মুসাদের বাড়িতে থাকব

আমরা। যাতে খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে পারি।'

মুসাদের বাড়ি থেকে অটিংটন কাছে। এখানে থাকলে বেরিংকে ধরতে সুবিধে হবে। রবিন বলল, 'তোমাদের নামিয়ে দিয়ে আমি তাহলে চলে যাই। মিস্টার সাইমনের গাড়িটা দিয়ে আসিগে।'

'হ্যাঁ, তাই করো।'

গাড়ি ফেরত দিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে আসতে আসতে রাত হয়ে গেল রবিনের। খবর জানাল, সিলভার এখনও মুখ খোলেনি। মোহরের গুহার কথা বলেনি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ইয়ান ফ্লেচার।

ভূত-থেকে-ভূতে চালু করে দেয়া হয়েছে। রাতে আর খবর আশা করল না ওরা, এলে আসবে পরদিন সকালে।

সকাল থেকে ফোনের কাছে বসে অপেক্ষা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

খবর আর আসে না।

এল বিকেলের দিকে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছে ওরা, তারও অনেক পর। একটা ছেলে জানাল, বেরিঙের চেহারার একজন লোককে পোস্ট অফিসে ঢুকতে দেখা গেছে।

একটা মুহূর্ত দেরি করল না ওরা। অটিংটন রওনা হলো।

পোস্ট অফিসের সামনে এনে গাড়ি রাখল রবিন। রাস্তার ধারে পুরানো একটামাত্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

'এতক্ষণ কি আছে ও?' পোস্ট অফিসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মুসা।

'থাকবে,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা দেরি করিনি। মুদ্রা জমা দিয়ে নোট নিতে সময় লাগবে ওর। কয়েন গুনতে অনেক সময় লাগে। তোমরা থাকো, আমি ভেতরে গিয়ে দেখে আসি...'

তার কথা শেষ হলো না। পোস্ট অফিস থেকে যে বুড়োটা বেরিয়ে এল, তাকে দেখেই চিনতে পারল ওরা। বেরিং।

পুরানো গাড়িটাতে উঠে স্টার্ট দিল সে।

পিছু নিল তিন গোয়েন্দা। কোথায় যায় দেখবে।

মেইন রোড ধরে কিছুক্ষণ চলার পর মোড় নিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় নামল বেরিং। পেছনে ধুলোর ঝড় তুলে রেখে এগিয়ে চলল গাড়ি।

'নামব?' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'আর কোন গাড়ি নেই। আমাদের দেখে ফেলবে বেরিং।'

'নামো। এত ধুলো, দেখবে না।'

আসলেও তাই। এত ধুলো, রিয়ার-ভিউ মিররে তাকিয়ে পেছনের কিছুই দেখতে পাবে না বেরিং, বুঝল মুসা। কারণ আয়নার দিকে তাকিয়ে পেছনের ধুলো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না তার।

'যাচ্ছে কোথায়?' রবিনের প্রশ্ন।

'হবে অটিংটন পাহাড়ের কোন বাড়িতে,' জবাব দিল কিশোর। ম্যাপ বের করে দেখতে লাগল। 'একটা গ্রাম আছে ওখানে।'

পাহাড়ী এলাকা শুরু হলো। এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে পথ। সামনে গাঁয়ের মধ্যে

ঢোকার পর বন্ধ হয়ে গেল ধুলো ওড়া।

'আরি, গাড়িটা কোথায়!' উদ্বিগ্ন হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

মেইন স্ট্রীট ধরে ছুটে চলল সে। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে এসে একটা পুরানো বাড়ির সামনে গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে কিশোরের দিকে তাকাল, 'কি করব?'

'আগে পুলিশকে খবর দেব, তারপর ভেতরে ঢুকব। গাড়ি রাখো।'

পথের পাশে গাড়ি রাখল মুসা।

সামনে কাছেই একটা ফোন বুদ দেখে নেমে এগিয়ে গেল কিশোর। ফ্লেচারকে ফোন করে সব বলল। চীফ বললেন, তিনি তখুনি অ্যাটিংটন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

ফিরে এসে মুসা আর রবিনকে সে-কথা জানাল সে। বলল, 'রবিন, তুমি গাড়িতে থাকো। পুলিশ এলে বাড়িটা দেখিয়ে দেবে। আমরা ঢুকছি। মুসা, পেছনের দরজা দিয়ে যাও, আমি সামনে দিয়ে ঢুকছি।'

পেছন দিকে চলে এল মুসা। জানালা দেখে উঁকি দিল। কিন্তু বোর্ড দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে জানালা, ভেতরের কিছু দেখা যায় না। কথা কানে এল তার।

সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে ঠেলা দিল কিশোর। বন্ধ। টোকা দিল। ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে?'

গলার স্বর আরেক রকম করে জবাব দিল কিশোর, 'বেরিং, জলদি খোলো, খবর আছে!'

তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। উঁকি দিল একটা লোক। কিশোরকে দেখে অবাক হলো, চিনে ফেলেছে, 'তুমি!'

চেহারাটা চেনা চেনা লাগছিল, গলা শুনে চিনে ফেলল কিশোরও, বেরিং। গালে দাড়ি নেই, তারমানে দাড়িটা নকল। চশমা আর দাড়ি খুলে পকেটে রেখে গায়ের জ্যাকেটটা উল্টে নিলেই অন্য মানুষ হয়ে যায়, ঝট করে আর তখন তাকে চেনা যায় না। সেদিন রেড হিলে এমন করেই রবিনকে ফাঁকি দিয়েছিল সে।

'ভেতরে আর কে আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'কেউ নেই।'

'দেখব।'

'তুমি দেখার কে?'

ভেতরের কামরা থেকে মুসার চিৎকার শোনা গেল, 'কিশোর, জলদি এসো...'

থমকে গেল বেরিং। এক ঠেলায় তাকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। দুজন লোক চেপে ধরেছে মুসাকে। প্রাণপণে ছোটার চেষ্টা করছে সে। আরেকজন দড়ি আনছে ওকে বাঁধার জন্যে।

তাকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর।

পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরল বেরিং। বাহু দিয়ে চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চাইল।

শত্রুরা সংখ্যায় বেশি। ওদের সঙ্গে পারল না কিশোর আর মুসা। ওদেরকে কাবু করে চেয়ারে বেঁধে ফেলা হলো। ঠিক এই সময় বাইরে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হলো। বেজে উঠল পুলিশের বাঁশি।

বেরিং আর তার লোকজন কিছু করার আগেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল পুলিশ।

'আমি জালিয়াত নই!' কিশোরের প্রশ্নের জবাবে চিৎকার করে উঠল বেরিং। 'আমি কেবল একটা প্যাকেট দিতে এসেছিলাম এদেরকে!'

কিন্তু পুলিশের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হলো জালিয়াতরা। তাদের কথা অনুসারে বাড়ির মাটির নিচের ঘর থেকে ধাতু গলানোর, আর সিকি ও আধ ডলারের ছাপ দেয়ার মেশিন বের করা হলো। প্রচুর সোনা আর রূপার মোহর বেরোল, যেগুলোকে এখনও গলানো হয়নি। তার মধ্যে প্রফেসর রস ডুগান এবং অ্যাকোনা ডিয়াজোর মোহরগুলোও রয়েছে। কার কাছে মোহর আছে খোঁজ নিত বেরিং। খবর দেয়ার জন্যে সব সময় লোক লাগিয়ে রাখত। কারও কাছে মোহরের খোঁজ পাওয়া গেলেই চুরি কিংবা ছিনতাই করে নিয়ে আসতে যেত। রূপার মোহর দিয়ে কয়েন বানাত আর সোনার মোহর গলিয়ে বার তৈরি করে ব্যাংক কিংবা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত।

'মুদ্রা জালিয়াতির ব্যবসাটা ভালই ফেঁদেছিলেন,' বেরিংকে বলল কিশোর। 'সেই সঙ্গে চুরি-ডাকাতি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের মোহরগুলোও আপনিই আনতে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'আমার ওপর কিছু চাপাতে পারবে না,' চাপা গর্জন করে উঠল বেরিং, 'আমি কিছু করিনি!'

'সেটা প্রমাণ করা এমন কঠিন কিছু হবে না। আপনি শুধু মুদ্রাই জাল করেননি, মোহর চুরি করতেও সাহায্য করেছেন। মোহর গলিয়ে মুদ্রার আকার দেয়ার পর, ছাপ দেয়ার আগেই কিছু মুদ্রা নিয়ে গিয়ে লুকিয়েছিলেন মুসাদের ফার্মে। লুকাননি?'

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল কিশোর। কিন্তু লেগে গেল জায়গামত।

প্রশ্নটার জন্যে তৈরি ছিল না বেরিং। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো। মিনমিন করে বলল, 'আমি কিছু জানি না!'

'মানে?' চেঁচিয়ে উঠল তার এক লাল-চুলো সহকারী। 'তুমি আমাদেরও ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে? আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছ! বাজারে চালান দেয়ার নাম করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলেছ?'

'না না, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না...'

কিন্তু বেরিংকে কথা বলতে দিল না তার সহকারীরা। চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন, 'থামো, বেঈমান কোথাকার! তোমাকে বিশ্বাস করে মুদ্রা চালান দিতে দেয়াই ভুল হয়েছে!'

হাসতে লাগল কিশোর। বেরিঙের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বুঝলেন? প্রমাণ করতে পারব না? আপনার দলের লোকেরাই তো সব ফাঁস করে দিচ্ছে।'

'গাধা তো!' নিরাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঢিল করে দিল বেরিং। 'বেশি কথা বলতে গিয়ে এরা সব ভণ্ডুল করল...'

'আমরা করেছি!' খেঁকিয়ে উঠল লাল-চুল। 'তুমি যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে মোহর লুকালে? ভেবেছিলে, পরে সব তুলে নিজে মেরে দেবে। ভাবোনি?'

'না, ভাবিনি,' জবাব দিল বেরিং। 'আমি যে মোহর লুকাতে গেছি, তার কোন প্রমাণ নেই।'

'আছে,' পকেট থেকে নকশা আঁকা কাগজটা বের করল কিশোর। জুতোর ছাপ দেখিয়ে বলল, 'এই ছাপ আপনার জুতোর। চোরাই মাল লুকিয়েছেন মুসাদের ফার্মে, আবার তুলেও এনেছেন, আপনার জুতো আর গাড়ির চাকার দাগই সেটা প্রমাণ করে দেবে।'

জবাব খুঁজে পেল না বেরিং। চুপ করে আরেক দিকে তাকিয়ে রইল।

সাতাশ

পরদিন সকালে তিন গোয়েন্দাকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন মিস্টার সাইমন।

গেল ওরা।

মুদ্রা জালিয়াতির রহস্য ভেদ করার জন্যে ওদের অভিনন্দন জানালেন। তারপর বললেন, 'সিলভারকে ধরতে সাহায্য করার জন্যেও তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কাল সকালেই তাকে নিয়ে পুলিশের সঙ্গে আমি মেকসিকো রওনা হচ্ছি। সঙ্গে যাবে অ্যাকোনা ডিয়াজো। মোহরগুলো কোন পাহাড়ের গুহায় লুকানো আছে, দেখিয়ে দেবে সিলভার।'

'তার মানে আছে ওগুলো সত্যিই?' কিশোরের প্রশ্ন।

'আছে। অভিশাপের ভয়ে বের করে আনতে পারছিল না। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন সিলভারের মাথায়ও গোলমাল আছে। লোকটা পাগল। তবে মুদ্রা জালিয়াতদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কোন এক নাবিক নাকি মরার সময় তাকে বলে গিয়েছিল গুহায় লুকানো মোহরের খবর। কয়েকজন সহকারী জোগাড় করে সেগুলো বের করতে গিয়েছিল সে। নানা রকম দুর্ঘটনায় একে একে সঙ্গীরা সব মারা পড়ে। সাপের কামড় খেয়ে মরতে মরতে কোনমতে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসে সিলভার। তারপর থেকে মোহরের অভিশাপকে ভীষণ ভয়। মোহরের লোভও ছাড়তে পারছিল না, এদিকে অভিশাপেরও ভয়—ডাক্তারের ধারণা এই টানাপোড়েনেই মাথাটা তার আরও খারাপ হয়েছে।'

'অ্যাকোনা ডিয়াজোর পিছু নিল কেন?'

'সিলভার নিজে মোহরগুলো বের করতে পারছিল না। তাই অন্য ফন্দি করল। ওগুলোর আসল মালিক অ্যাকোনা ডিয়াজোকে খুঁজে বের করে তার ওপর নজর রাখল। তার ধারণা ছিল, এক না এক সময় মোহরগুলো গুহা থেকে বের করে আনবেই অ্যাকোনা, তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে তখন। এ জন্যে বেশ কিছুদিন থেকেই তার পিছে লেগে ছিল সিলভার। নিজের চেষ্টাও বাদ দেয়নি সে,' কিশোর আর রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। 'যার জন্যে তোমাদেরকে ধরে নিয়ে

গিয়েছিল। মোট কথা মোহর উদ্ধারের কোন চেষ্টাই বাদ দেয়নি সে।'

'হুঁ। উদ্ধার হয়তো হবে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু তার কোন লাভ হবে না।...হ্যাঁ, ভাল কথা, জাহাজ ভর্তি সোনা লুটের কোন কিনারা করতে পারলেন?'

'পারব মনে হচ্ছে। বেরিঙের দলে লাল-চুলো যে লোকটা ধরা পড়েছে, সে ছিল লুটেরাদের দলে। পোড়ো খনিতেও সোনা গলানোর কাজ করত। তার কাছে পাওয়া সূত্র ধরেই আস্তে আস্তে খুঁজে বের করতে হবে আরকি রাঘব বোয়ালদের।'

কয়েক হপ্তা পর মেকসিকো থেকে ফিরে এলেন সাইমন। তিন গোয়েন্দাকে জানালেন, সিলভার সত্যি কথাই বলেছে। আসলেই তার জানা ছিল মারথা কয়েনের খবর। অভিশাপের ভয়ে গুহায় ঢুকতে চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে ঢুকতে বাধ্য হয়েছে। কোন রকম অঘটন ঘটেনি। এ ব্যাপারে সিলভারের ব্যাখ্যা হলো—যেহেতু মোহরের মালিক সঙ্গে ছিল, তাই অভিশাপ কার্যকর হয়নি ওগুলোর।

সাইমনের কাছে একটা চিঠি দিয়েছে অ্যাকোনা ডিয়াজো। তিন গোয়েন্দাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানিয়েছে। তিনজনের জন্যে তিনটা মারথা ডিয়াজো কয়েন স্যুভনির পাঠিয়েছে। যে কোন সময় মেকসিকো বেড়াতে গেলে তার বাড়িতে অতিথি হওয়ার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে।

মুসা বলল, 'আরেকটা রহস্য এখনও বাকি। ওটার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জানে শান্তি নেই আমার।'

'সেটা আবার কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বাহ্, ভুলে গেলে? আমাদের বাড়ির গুপ্তধন। সেগুলো এখনও উদ্ধার হয়নি। বের করতে হবে না?'

'আছে কিনা কে জানে?' কিশোর বলল।

'না থাকলে বাক্সের মধ্যে নোট রেখে লুকিয়ে রাখতে গেল কেন?'

'হয়তো ছিল। অনেক আগেই বেরও করে ফেলা হয়েছে। শিওর হবে কি করে?'

'তাই বলে কি চেষ্টা করব না?'

'করতে মানা করেছে কে? করো, চালিয়ে যাও চেষ্টা। তবে অহেতুক পরিশ্রম করবে। নোটের লেখামত সেই ওক গাছও পাবে না, পাথরটাও না, সারা খেত আর নদীর পাড় খুঁড়ে ফেলতে হবে তোমাকে।'

কিশোরের আগ্রহ নেই দেখে গুম হয়ে রইল মুসা। সে জানে, কিশোরকে বাদ দিয়ে তার একার বুদ্ধিতে কুলাবে না ওই গুপ্তধন আবিষ্কার। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'তুমি বলছ পাওয়া যাবে না?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'নোট যেটা পাওয়া গেছে, সেটা দিয়ে অন্তত যাবে না। আরও ভাল সূত্র দরকার।'

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল মুসা। হঠাৎ উজ্জ্বল হলো চোখ। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'আরেকটা কাজ তো করতে পারি! গুপ্তধন খোঁজা চালিয়ে যাওয়ার ভান করব আমরা। আমি শিওর, আমাদের খুঁড়তে দেখলে আবার আসবে

শুঁটকিটা। আমাদের সীমানায় ঢুকবে। এইবার তৈরি হয়ে থাকব আমরা। ঢুকলেই ক্যাঁক করে ধরব!'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল রবিন, 'ঠিক বলেছ! এইবার আর ছাড়া হবে না ওকে! ব্যাটা বহুত শয়তানি করেছে, একটা গণধোলাই না দিয়ে আর ছাড়ছি না!'

কিশোরের দিকে তাকাল দুজনে।

মৃদু হাসি ফুটল কিশোরের চোখের তারায়। 'এ ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজি আছি।'
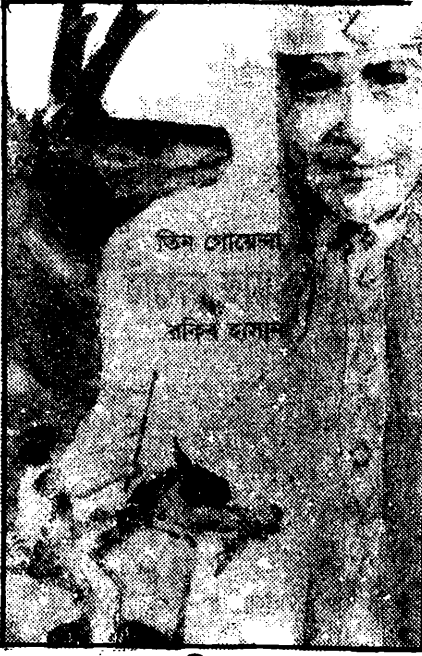
চাঁদের ছায়া

প্রকাশ প্রকাশ: ২০০০

'আমি কিশোরদের বাড়ি থেকে বলছি। কিশোর পাশার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' টেলিফোনে বলল একটা উত্তেজিত কণ্ঠ। 'খুব জরুরী।'

'ইয়েস, স্যার,' জবাব দিলেন রকি বীচ হাই স্কুলের ফুটবল টীমের ম্যানেজার। 'কিন্তু মাঠের ওপাশে রয়েছে সে। খেলা দেখছে।'

'ডেকে আনান, স্যার, প্লীজ! সাংঘাতিক জরুরী!'

'ধরুন। দেখছি।'

মাঠে নেমেছে মুসা। আরও অনেকের সঙ্গে চেঁচিয়ে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে কিশোর আর রবিন।

কিশোরকে ডাকার জন্যে একটা ছেলেকে পাঠালেন ম্যানেজার। মেরিচাচীর কথা শুনে দৌড়ে এল কিশোর। ফোন ধরল। 'হালো?'

'কে, কিশোর? আমি বোরিস। এক্ষুণি এসো। জলদি!'

'কি হয়েছে?'

'অদ্ভুত এক লোক এসে ঢুকেছে বাড়িতে। চামড়ার পুরানো জিনিস কিনতে চায়। যতই দেখানো হচ্ছে, কোনটা পছন্দ হচ্ছে না তার। একটা বিশেষ চাবির কেস খুঁজছে। লোকটার মতিগতি মোটেও ভাল ঠেকছে না আমার। শিওর, কোন ঘাপলা আছে। কোথায় যেন তার ছবি দেখেছি। কিন্তু কোথায়, মনে করতে পারছি না।'

মোলায়েম গলায় কিশোর বলল, 'আমি এখুনি আসছি।'

খেলা শেষ হতে দেরি আছে। মুসার জন্যে ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। রবিনকে নিয়ে বাড়ি ছুটল সে, রবিনের গাড়িতে করে।

গাড়ি স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছে চলে এসেছে। রবিনের হাতে হাত রাখল কিশোর। 'রাখো এখানে। গেট দিয়ে না ঢুকে পেছনের জানালা দিয়ে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি আগে। গাড়ির শব্দ পেলে পালিয়ে যেতে পারে।'

'ঠিক বলেছ,' গাড়ি রাখল রবিন।

পেছনের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, যেখানে একটা লাল কুকুর তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। কুকুরটার চোখ টিপে ধরতেই একটা ডালা সরে গেল। তিন গোয়েন্দার অনেকগুলো গুপ্তপথের একটা। নাম 'লাল কুকুর চার'। ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। রবিনও ঢুকে ভেতর থেকে আবার সুইচ টিপে নামিয়ে দিল ডালাটা।

সাবধানে মূল বাড়িটার পেছন দিকে এসে দাঁড়াল দুজনে। দেয়ালে গা মিশিয়ে লিভিং-রুমের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রবিন। একবার তাকিয়েই চাপা স্বরে বলে উঠল, 'আন্টির ডেস্ক থেকে কি যেন তুলে নিচ্ছে লোকটা!'

'কি নিচ্ছে? দেখি তো,' তাড়াতাড়ি কিশোরও তাকাল জানালা দিয়ে। 'আরি, চাচার কী কেসটা ঘাঁটছে!'

ওদের উপস্থিতি টের পেল না চোরটা। কেস থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে কেবিনেটের দিকে এগোল। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। কেবিনেটটা খুলতে চায়।

মেরিচাচীর গলা শোনা গেল। এ ঘরের দিকেই আসছেন। চট করে চাবিটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরে ফেলল লোকটা। কী-কেসটা রেখে দিল আগের জায়গায়।

আর দেখার প্রয়োজন মনে করল না দুই গোয়েন্দা। একদৌড়ে বাড়ির কোণ ঘুরে এসে বারান্দায় উঠে পড়ল। দরজা ঠেলে খুলে ঢুকে পড়ল ঘরে।

'ও, তোরা,' খুশি খুশি শোনাল মেরিচাচীর কণ্ঠ। 'এই অসময়ে ফুটবল মাঠ ছেড়ে হঠাৎ করে বাড়ি এলি যে?' সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন ওপরতলা থেকে।

'ওই লোকটা এনেছে আমাদের,' হাত তুলে ইঙ্গিত করে বলল কিশোর।

'কতদিন না নিষেধ করেছি আমার সঙ্গে রহস্য করে কথা বলবি না!'

মেরিচাচীর কথার জবাব না দিয়ে লোকটার দিকে তাকাল কিশোর। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'চাচার চাবির কেস থেকে চাবি চুরি করেছেন কেন?'

'মানে?' রেগে উঠল লোকটা।

লোকটার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ধমকে উঠলেন মেরিচাচী। 'কি বলছিস! একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এটা কি ধরনের আচরণ হলো?...শিগ্‌গির মাপ চা!' হাতে করে নিয়ে আসা কতগুলো পুরানো পার্স টেবিলে রেখে ঠেলে দিলেন লোকটার দিকে, 'দেখুন তো, মিস্টার ফ্রড, পছন্দ হয় কিনা।'

আগ্রহের সঙ্গে কী-কেসগুলো তুলে তুলে দেখতে লাগল মিস্টার ফ্রড। সবগুলো দেখার পর মাথা নাড়ল, 'না, এগুলোতে চলবে না। আমার ওই কেসটাই দরকার।'

'কিন্তু বললামই তো, ওটা আমার স্বামীর অনুমতি ছাড়া দিতে পারব না।'

'কিন্তু তাঁর তো ফিরতে দেরি হবে বললেন,' মিস্টার ফ্রড বলল। 'জিনিসটা আমার জরুরী দরকার। অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না।'

'সরি, আমার কিছু করার নেই।' কিশোরের দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'কোন কেসটা চাইছেন, বুঝলি? সেদিন যে পুরানো চামড়ার অ্যানটিকগুলো এনেছে, ইনডিয়ানদের জিনিস...'

'মানে, সেই কী-কেসটা? যেটা নিজের জন্যে রেখে দিয়েছে চাচা?'

'হ্যাঁ। মিস্টার ফ্রড পুরানো জিনিস কিনতে চাইলে ঘরে যতগুলো কেস আছে সব এক এক করে দেখাতে লাগলাম। তোর চাচার কেবিনেটে রাখা কেসটাও দেখিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, তাকে জিজ্ঞেস না করে ওটা বেচতে নিষেধ করে গিয়েছে তোর চাচা...'

'তার মানে বেচার ইচ্ছে নেই। জিনিসটা তারও খুব পছন্দ হয়েছে।'

'আমিও তা-ই বললাম,' চোখের ইশারায় আগন্তুককে দেখিয়ে বললেন মেরিচাচী, 'কিন্তু মিস্টার ফ্রডের নাকি ওটা ছাড়া চলবেই না। স্ত্রীর বার্থ-ডে'তে প্রেজেন্ট করবেন।'

হাসিমুখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার ফ্রড। যেন তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। হাসার সময় ঠোঁটের বাঁ-কোণটা শুধু বাঁকা হয়। মোটাসোটা

মানুষ। বাদামী চামড়া। বয়েস পঁয়ত্রিশমত হবে।

'আমার স্ত্রী ভীষণ খুঁতখুঁতে,' কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল মিস্টার ফ্রড। 'কিছুদিন থেকেই একটা অ্যানটিক কী-কেসের জন্যে চাপাচাপি করছে। অনেকখানে খোঁজাখুঁজি করেছি, পছন্দ হয়নি। শেষে মনে হলো, স্যালভিজ ইয়ার্ডে খোঁজ নিয়ে দেখা যাক...'

চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে থেমে গেল মিস্টার ফ্রড। ফিরে তাকাল দরজার দিকে।

বোরিস এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। ফ্রডের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মেরিচাচীর দিকে ঘুরল, 'ম্যা'ম, চেয়ারটায় রঙ করা হয়ে গেছে। বাকিগুলোতে একই রঙ করব?'

'একই রঙ?' ভাবলেন মেরিচাচী। 'করতে পারো। তোমার যা ভাল মনে হয়, করোগে।'

চলে যাচ্ছিল বোরিস, ডাকলেন আবার চাচী, 'বোরিস, তোমার কাছে চামড়ার কোন কী-কেস আছে? পুরানো?'

ফিরে তাকাল বোরিস। মেরিচাচীর দিকে নয়, আবার দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মিস্টার ফ্রড। চোখ সরিয়ে নিল। মেরিচাচীর দিকে ফিরে মাথা নাড়ল বোরিস, 'না, ম্যা'ম।'

বেরিয়ে গেল সে।

ততক্ষণে ডেস্কে রাখা চাচার কী-কেসটা তুলে নিয়ে চাবিগুলো গুনে ফেলেছে কিশোর। দুইবার গোণার পর নিশ্চিত হয়েছে, একটা চাবি কম। চাচার চাবির কেসে ক'টা চাবি আছে, তার মুখস্থ। তারমানে ভুল দেখেনি। চাবিটা সত্যি সরিয়েছে ফ্রড।

'মিস্টার ফ্রড,' কড়া দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'পাতলা তামার চাবিটা কি করেছেন?'

'কি...কি...' কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন মিস্টার ফ্রড। 'তুমি আমাকে চোর বলছ! আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ!'

কী-কেসটায় টোকা দিয়ে কিশোর বলল, 'এটা থেকে একটা চাবি গায়েব হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার,' হাত বাড়াল কিশোর। 'দিন।'

'কি বলছ তুমি! এত বেয়াদব ছেলে তো জীবনে দেখিনি!' রেগে উঠে বলল, 'মিসেস পাশা, লাগবে না আমার কী-কেস। আমি যাচ্ছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে অপমান হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

টেবিলে রাখা নিজের হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ফ্রড।

পথ আটকে দাঁড়াল কিশোর।

ধমক দিলেন মেরিচাচী, 'ছেড়ে দে বলছি! অনেক হয়েছে।'

'কিন্তু চাচী, কেসে চাবিটা নেই। চাচার পার্সোনাল কেবিনেটের...'

'কেসে নেই বলে যে ইনি চুরি করেছেন, ভাবলি কি করে? সত্যি, কিশোর, মাঝেমধ্যে তোর মাথায় যে কি ঢোকে...চাবিটা হয়তো তোর চাচাই খুলে অন্য কোথাও রেখেছে...'

'তা কেন রাখবে?'

'সেটা আমি কি জানি? রেখেছে হয়তো কোন কারণে!'

'চাচী, আমি জানালা দিয়ে এই লোকটাকে চাবির কেস হাতাতে দেখেছি...'

'তা তো হাতাবেনই। পুরানো কেস কিনতে এসেছেন, হাতে নিয়ে দেখবেন না?...খবরদার, আর একটা খারাপ কথা বলবি না! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

সার্চ না করে লোকটাকে বেরোতে দেয়ার মোটেও ইচ্ছে ছিল না কিশোরের। কিন্তু চাচীর সামনে কিছু করতে পারল না। অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল শুধু। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ফ্রড। দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে গেল পাল্লাটা।

কিশোরের দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'প্রমাণ ছাড়া কাউকে চোর বলা ঠিক না।'

'নিজের চোখে দেখলাম...

'চোখের ভুল হয়েই থাকে।'

'কিন্তু দুজনের ভুল? রবিনও দেখেছে পকেটে হাত ঢোকাতে...'

'চাবির কেস ঘাঁটার সময় কোন কারণে পকেটে হাত ঢোকাতেই পারে। তোদের কাছে মনে হয়েছে চাবি ঢোকাচ্ছে।'

যুক্তি আছে মেরিচাচীর কথায়। কিন্তু মেনে নিতে পারছে না কিশোর। একটা চাবি কম কেন? চাচা খুলে রেখেছে, এটাও মানতে পারল না। তর্ক করল না আর। রবিনকে 'এসো' বলে দ্রুত এগোল দরজার দিকে।

'কোথায় যাচ্ছিস?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'দেখি, বোরিস কি করছে,' চাচীর দিকে তাকাল না কিশোর।

বাইরে এসে ইয়ার্ডের কোথাও দেখতে পেল না লোকটাকে। গেটের দিকে দৌড় দিল কিশোর। রবিন ছুটল পেছনে। দৌড়ে এসে উঠল রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িতে।

লোকটা কোনদিকে গেছে জানা নেই। শহরের দিকে রবিনকে যেতে বলল কিশোর।

মিনিটখানেক পরে মোড় নিতেই দেখা গেল লোকটাকে। ত্রস্তপায়ে ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছে।

ঘ্যাচ করে তার পাশে এসে ব্রেক কষল রবিন।

মুখ ফিরিয়ে ওদের দেখেই দৌড় দিল মিস্টার ফ্রড। ফুটপাথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল পাশের চিলতে জমিটায়। তার ওপাশে কয়েকটা বাড়ি।

যেদিকে যাচ্ছে, গাড়ি নিয়ে ওর পিছু ধাওয়া করা যাবে না। লাফ দিয়ে নেমে তার পেছনে ছুটল দুই গোয়েন্দা।

দুই

'গেল কোথায় ব্যাটা?' চিৎকার করে উঠল রবিন।

দুই সারি বাড়ির মাঝখানের নির্জন রাস্তার দুদিকে চোখ বোলাতে লাগল ওরা।

পার্ক করে রাখা কয়েকটা গাড়ি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।
হঠাৎ আবার চিৎকার করে উঠল রবিন, 'দেখো দেখো, ওই গাড়ি দুটোর মাঝখানে! ...ওই যে, মাথাটা নামিয়ে ফেলল!'
দৌড় দিল দুজনে।
দেখে ফেলেছে বুঝে আর লুকানোর চেষ্টা করল না ফ্রেড। লাফ দিয়ে উঠে আবার দৌড় দিতে গেল। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। অনেক কাছে চলে এসেছে রবিন। গাড়ির ফাঁক দিয়ে ঢুকে পেছন থেকে জাপটে ধরল লোকটাকে।
ছাড়া পাওয়ার জন্যে জোরাজুরি করতে লাগল লোকটা। ততক্ষণে কিশোরও পৌঁছে গেছে সেখানে। হাত চেপে ধরল ফ্রেডের।
রাস্তায় পার্কিং-প্লেস ছাড়া গাড়ি রেখে ওদের নেমে পড়তে দেখে পিছু নিয়েছিল একজন পুলিশ অফিসার। পৌঁছে গেল সে-ও।
দেখেই চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'হাই, ডুবয়! জলদি আসুন! হ্যান্ডকাফ লাগান ব্যাটাকে!'
অফিসার ডুবয় তিন গোয়েন্দার পরিচিত। কয়েকটা কেসে ওদের সঙ্গে কাজ করেছে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'
ফ্রেডকে ছেড়ে দিল দুই গোয়েন্দা।
পুলিশ দেখে আর পালানোর চেষ্টা করল না ফ্রেড।
'চাচার একটা চাবি চুরি করেছে এই লোক,' কিশোর বলল।
ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ডুবয়।
'আমি শিওর,' রবিন বলল, 'চাবিটা এখনও ওর কাছেই আছে। সার্চ করুন। পেয়ে যাবেন।'
কিশোরদের কথা বিশ্বাস করল ডুবয়। লোকটার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'চলুন, থানায় চলুন।'
যেতে চাইল না ফ্রেড। 'দুটো ছেলের কথা শুনে আপনি আমাকে থানায় নিয়ে যেতে পারেন না। ওরা মিথ্যে কথা বলছে...'
তাকে থামিয়ে দিল ডুবয়। 'ওদের কথা অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। ওরা কে, নিশ্চয় আপনি জানেন না। ওরা গোয়েন্দা। বহু জটিল কেসে পুলিশকে সাহায্য করেছে, বহু চোর-ডাকাতকে পাকড়াও করেছে। মিথ্যে কথা বলে না ওরা। থানায় চলুন। ভাল লোক হলে তো ছাড়াই পেয়ে যাবেন আপনি।'
'ওদের কিছু হবে না?'
'নিশ্চয় হবে। মানহানির কেস ঠুকে দিতে পারেন ওদের বিরুদ্ধে। অন্যায়ভাবে তাড়া করার জন্যেও কেস করতে পারেন।...কিন্তু একটা কথা বলুন তো? আপনি যদি নির্দোষই হবেন, দৌড় দিলেন কেন?'
সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারল না ফ্রেড।
ধমক দিয়ে বলল ডুবয়, 'চলুন! থানায় আপনাকে যেতেই হবে!'
থানায় এসে দেখা গেল, পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারও অফিসেই আছেন। আরও সুবিধে হলো গোয়েন্দাদের জন্যে।
'আরি, তোমরা?' ভুরু কুঁচকে ধরে আনা লোকটার দিকে তাকালেন তিনি, 'কি

করেছে ও?'

কি ঘটেছে, চীফকে জানাল কিশোর।

'চাবিটা ওর কাছেই আছে, স্যার,' রবিন বলল, 'খুঁজলেই পেয়ে যাবেন।'

'খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবেন না!' চিৎকার করে উঠল ফ্রড। 'আমি আমার উকিলকে ডাকব। তাকে ডাকতে নিশ্চয় বাধা দেবেন না?'

'কে আপনার উকিল?'

'ক্র্যাক ওয়াগনার।'

'ক্র্যাক? অদ্ভুত নাম। নতুন নাকি রকি বীচে? ওই নামে এখানে কোন উকিল আছে বলে জানতাম না।'

চীফের টেবিলে রাখা টেলিফোন থেকে ডায়াল করল লোকটা। তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা আর দুই পুলিশ অফিসার। ক্র্যাকের সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল ফ্রড। সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে তাকে।

দশ মিনিট পর গটমট করে এসে চীফের অফিসে ঢুকল ক্র্যাক। বেঁটেখাট লোক। জাম্বুরার মত গোল মুখ। পাতলা ঠোঁট। চেহারাই বলে দেয়, লোক ভাল না। চশমার ভারী লেন্সের ভেতর দিয়ে বাঁকা চোখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাতে লাগল সে। ফ্রডের সঙ্গে হাত মেলাতে এগিয়ে গেল।

রবিনের দিকে কাত হলো কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'ওর ভাবসাব ভাল মনে হচ্ছে না আমার।'

'আমারও না,' জবাব দিল রবিন। 'ফ্রডের চেয়ে খারাপ লোক।'

'ঘটনাটা কি?' জিজ্ঞেস করল ক্র্যাক। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। 'আমার মক্কেলকে আটকে রেখেছেন কেন?'

'শান্ত হোন, মিস্টার ক্র্যাক,' রুক্ষস্বরে চীফ বললেন, 'রাশেদ পাশার বাড়ি থেকে একটা চাবি চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে মিস্টার ফ্রডের বিরুদ্ধে।' কিশোরকে দেখালেন তিনি, 'ওর নাম কিশোর। রাশেদ পাশার ভাতিজা। আর এ ওর বন্ধু, রবিন। মিস্টার ফ্রডের দেহতল্লাশ করতে চাইছে ওরা।'

'দেহতল্লাশ? করুক না,' ক্র্যাক বলল। 'খুঁজে দেখুক, চোরাই মাল আছে নাকি। মনে হয় না কোন আপত্তি করবেন আমার মক্কেল।' মক্কেলের দিকে ঘুরল সে। কেমন ভোঁতা দৃষ্টি ফুটেছে ফ্রডের চোখে। 'মিস্টার ফ্রড, দেখিয়ে দিন ওদের। আপনার কাছে কোন চোরাই মাল নেই, ভয় কি?'

চীফের নির্দেশে তল্লাশীটা চালাল ডুবয়। প্রথমে ফ্রডের পকেটগুলো খুঁজে দেখল। তারপর তার জুতো খুলতে বলল। তারপর দেখল হাতব্যাগটা।

'কই, কিছু তো নেই,' দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বলল সে।

পোশাকের যে সব জায়গায় একটা চাবি লুকিয়ে রাখা সম্ভব, সবখানে খুঁজে দেখল ডুবয়। কিন্তু চাবিটা পেল না। ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের দিকে, 'নেই, স্যার।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

নীরব হয়ে আছে ঘরটা। রুমাল দিয়ে চশমা মোছায় ব্যস্ত ক্র্যাক। ডুবয়ের তল্লাশী শেষ হলে পরে নিল চশমাটা। চোখ দুটো স্থির হলো কিশোরের ওপর। 'এখন কি বলবে?'

ওর কথার জবাব না দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরল কিশোর, 'আমি ওকে নিজের চোখে কী-কেস থেকে চাবিটা খুলে নিতে দেখেছি, স্যার। আমি আর রবিন দুজনেই দেখেছি পকেটে ভরতে।'

'তাহলে গেল কোথায়?' কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্র্যাক।

'আমি কি জানি!' রেগে উঠল কিশোর। 'চোরে কি আর স্বীকার করে কোথায় লুকিয়েছে? নিশ্চয় দৌড়ানোর সময় ফেলে দিয়েছে রাস্তায় কোনখানে। বমাল ধরা পড়লে যে জেলে যেতে হবে, না জানার কথা নয় আপনার মক্কেলের।'

কিশোরের কথার জবাব দেয়ার প্রয়োজনই মনে করল না যেন আর ক্র্যাক। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তার দিক থেকে ঘুরে গিয়ে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে, 'আপনাদের কাজ শেষ হয়েছে তো? আমি আমার মক্কেলকে নিয়ে যেতে পারি?'

দ্বিধা করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। কিশোরের কথা অবিশ্বাস করতে পারছেন না। সাহায্যের আশায় ডুবয়ের দিকে তাকালেন। সাহায্য করতে পারল না অফিসার। নীরবে হাত ওল্টাল শুধু।

ক্র্যাকের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'অভিযোগ লেখাবেন না ছেলে দুটোর বিরুদ্ধে? ওদের কথা তো ভুল প্রমাণিত হলো…'

ক্যাপ্টেনকে কথা শেষ করতে দিল না ক্র্যাক, 'কি আর লেখাব। সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝামেলা করতে ইচ্ছে করছে না আর।' মক্কেলের দিকে তাকাল ক্র্যাক। 'কি, রিপোর্ট লেখাবেন?'

নীরবে মাথা নাড়ল ফ্রড। লেখাবে না।

'থাকগে, এবারকার মত মাপ করে দেয়া গেল,' উদারতা দেখানোর ভান করল ক্র্যাক। 'ভালমত ধমকে দিন। কোন ভদ্রলোককে যেন আর কখনও বিরক্ত না করে।…তাহলে এবার যেতে পারি আমরা?'

'বেশ, যান,' রুক্ষকণ্ঠে বললেন ইয়ান ফ্লেচার। ফ্রডের দিকে তাকালেন, 'আপনার ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যান, যাতে প্রয়োজন পড়লে আবার যোগাযোগ করা যায়।'

'থ্যাংক ইউ, চীফ,' ক্র্যাক বলল। ভারিক্কি ভঙ্গিটা বজায় রয়েছে। 'আপনার সহযোগিতার কথা মনে থাকবে আমাদের। ছেলেরা, তোমাদেরও ধন্যবাদ।'

বাউ করার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল একবার। তারপর এগোল দরজার দিকে।

খানিক পরে, বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে কিশোরের দিকে ফিরে তাকাল রবিন। 'ফ্রডের হাতের পেছনটা দেখেছ? ব্যাগ বন্ধ করছিল যখন, আমি দেখেছি।'

'দেখেছি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'একটা অদ্ভুত কাটা দাগ। ডব্লিউর মত। সহজেই চোখে পড়ে।'

'এটা দেখে ওকে শনাক্ত করা সহজ হবে। বোরিস কি বলেছে, মনে আছে? লোকটার ছবি নাকি কোথাও দেখেছে।'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আমার মনে হয়, পত্রিকায় দেখেছে। চুরি-ডাকাতি করেছিল হয়তো ফ্রড। ধরা পড়ার পর পত্রিকায় ছেপে দিয়েছে তার ছবি।'

বাড়ি ফিরে সোজা রান্নাঘরের দিকে এগোল ওরা। খিদে পেয়েছে।

'অ্যাপল পাইয়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?' নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকে বলল রবিন।

'হ্যাঁ,' সড়াৎ করে জিভের পানি গিলে নিয়ে বলল কিশোর। 'মুসার অবস্থা হয়েছে আমার। পুরো এক বাসন শেষ করে ফেলতে পারব।'

চুলার সামনে দাঁড়িয়ে হাতা দিয়ে কি যেন নাড়ছেন মেরিচাচী। পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন। 'চাবিটা পেয়েছিস?'

নীরবে মাথা নাড়ল কিশোর। আচমকা চিৎকার করে উঠল রবিনের দিকে তাকিয়ে, 'উফ, আমি একটা গাধা! চাবিটা কোথায় লুকিয়েছে আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার!'

'কোথায়?' রবিনও চিৎকার করে উঠল।

'মুখের মধ্যে। ওই একটা জায়গাতেই কেবল খোঁজা হয়নি। উকিলকে আসতে ফোন করার পর কোন এক ফাঁকে মুখে পুরে ফেলেছিল। তারপর থেকে আর একটা কথাও বলেনি, লক্ষ করেছ!'

তিন

'এ বাড়িতে আবার হানা দেবে ও!' কিশোর বলল।

খাওয়া শেষ। ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছে দুই গোয়েন্দা।

'কি করে বুঝলে?' জানতে চাইল রবিন।

'চাবিটা নিয়ে যাওয়ার আর কোন কারণ নেই,' কিশোর বলল। 'ওটা খুলে নিয়ে গেছে যাতে গোপনে এসে কেবিনেটটা খুলতে পারে। চাচার ফাইল কেবিনেটের জন্যে আরেকটা নতুন তালা আর চাবি দরকার।'

সেদিনই পরিচিত তালার দোকান থেকে একজন চাবিওলাকে ডেকে আনল কিশোর। পুরানো তালাটা ফেলে দিয়ে নতুন তালা লাগাল।

চাবিওলা চলে গেলে, কী-কেসটা বের করল কিশোর। 'যে জিনিসের জন্যে এত কাণ্ড করল ফ্রড, ওটা নিশ্চয় সাধারণ জিনিস নয়। স্ত্রীর জন্মদিনে প্রেজেন্ট করার কথাটা মোটেও বিশ্বাস করিনি আমি, অন্য কোন ব্যাপার আছে। যেটা স্ত্রীকে উপহার দেয়ার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী। তা ছাড়া ফ্রডের কোন স্ত্রী আছে বলেও আমার মনে হয় না। যাকগে, ওটা আসল কথা না। কথা হলো, প্রেজেন্ট করার কথাটা মিথ্যে; এবং কোন কারণে কী-কেসটা তার কাছে খুব জরুরী।'

'কেন জরুরী, দেখলেই তো পারি আমরা,' রবিন বলল। 'ভালমত দেখলে কোন সূত্রও পেয়ে যেতে পারি।'

'ঠিক বলেছ,' তুড়ি বাজাল কিশোর। তখনই কেবিনেট খুলে বের করে আনল কেসটা। উল্টেপাল্টে নানা ভাবে দেখেও কিছু বের করতে পারল না। 'কই, কিছুই

তো নেই। দেখতে মোটামুটি খারাপ না। কিন্তু এর জন্যে…'

'গুপ্তধনের নকশা নেই তো?' প্রশ্ন করল রবিন।

'সেটাই তো দেখলাম। কিন্তু নকশা লুকানোর মত গোপন কোন জায়গাই নেই।'

'দেখি তো?' হাত বাড়াল রবিন।

হাতে নিয়ে দেখতে লাগল রবিন। কোন কোম্পানির নাম চোখে পড়ল না।

তবে এক কোণে একটা ছাপ দেয়া মনোগ্রাম রয়েছে। একটা ফুল আঁকা। মাঝখানে বড় করে লেখা একটামাত্র ইংরেজি অক্ষর, 'আর'। এ রকম মনোগ্রাম কোন চামড়ার জিনিসে এর আগে চোখে পড়েনি তার। কেসটা থেকে নতুন কিছু সে-ও বের করতে পারল না। দুই ঠোঁট চোখা করে সামনে ঠেলে দিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করল। মাথা নাড়ল, 'নাহ্, কিচ্ছু নেই। হয়তো ঠিকই বলেছে ফ্রড, বৌয়ের জন্যেই কিনতে চেয়েছে। অনেক লোক আছে না, স্ত্রীকে অতিরিক্ত ভালবাসে…'

'কিংবা ভয় পায়,' রবিনের হাত থেকে কেসটা নিল আবার কিশোর। স্ত্রীকে দেয়ার জন্যে চাইছে ফ্রড, কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। 'নিশ্চয় কোন বিশেষত্ব আছে এটার। এক কাজ করা যেতে পারে, কোম্পানিতে খোঁজ নিতে পারি।' মুখে হাসি ফুটল অবশেষে। 'কাল গিয়ে রকি বীচের বড় বড় চামড়ার ব্যবসায়ীদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করব, এই মনোগ্রাম কোন কোম্পানির।'

খেলার মাঠে প্র্যাকটিস থাকায় পরদিনও মুসা ওদের সঙ্গে যেতে পারল না প্রথমেই ওদের পরিচিত একজন ব্যবসায়ী মিস্টার গার্ডনারের দোকানে চলে এল। বৃদ্ধ এই ভদ্রলোকের একটা উপকার করে দিয়েছিল একবার ওরা, সেই থেকে পরিচয়।

কী-কেসটা বের করে দিয়ে কিশোর বলল, 'এ জিনিসটা কে বানিয়েছে, জানতে চাই আমরা। এই যে, মনোগ্রামটা দেখুন। কাদের এটা, বলতে পারেন? কোন কোম্পানির?'

ভাল করে মনোগ্রামটা দেখলেন মিস্টার গার্ডনার। মাথা নাড়লেন, 'উঁহু!' কিছুটা অবাকই মনে হলো তাঁকে। 'পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এই ব্যবসা করছি। এ রকম ছাপ তো কখনও দেখিনি।'

'নতুন কোন কোম্পানি হয়তো,' কিশোর বলল। 'আপনাদের হাতে হয়তো এদের মাল এখনও আসেনি। হতে পারে না?'

'পারে,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার গার্ডনার। 'তবে যে বানিয়েছে, সে খুব বড় কারিগর, এটুকু বোঝা যায়। হাতে বানানো, মেশিন ব্যবহার করেনি।'

মিস্টার গার্ডনারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। আরেকটা দোকানে খোঁজ নিতে ঢুকল। ওই দোকানদারও কিছু বলতে পারল না।

প্রথমে চামড়ার দোকান, তারপর কোম্পানিগুলোতে খোঁজ নিতে লাগল ওরা একে একে। দোকানে দোকানে ঘুরে কী-কেস, ওয়ালেট, হ্যান্ডব্যাগ, সুটকেস দেখল। জুতার দোকানে জুতা পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখল। কোনটাতেই এ ধরনের

কোন মনোগ্রাম দেখতে পেল না।

রবিন বলল, 'এক কাজ করি বরং। ফ্রডের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।'

'তাতে লাভ?'

'কেসটা কেন চায়, ওকেই বরং খোলাখুলি জিজ্ঞেস করি। বলতে হবে, আসল কথাটা জানালে কেসটা ওদের কাছে বিক্রি করতে রাজি আছি আমরা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর বলল, 'তা মন্দ বলোনি। আসল কথাটা ফাঁস করবে বলে মনে হয় না ফ্রড। তবু বলা যায় না, জিনিসটা পাওয়ার লোভে···চলো, কালকেই যাই।'

পরদিন আবার থানায় চলল দুজনে। ফ্রডের ঠিকানাটা নেয়ার জন্যে।

ডিউটি অফিসার চেনে ওদেরকে। একটা রেজিস্টার খুলে জানাল, হাভানা হোটেলে উঠেছে ফ্রড। হোটেলটা কোথায়, জানে কিশোর। বন্দরের কাছে সমুদ্রের পাড়ে, একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেল।

অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

হোটেলে পৌঁছে ডিউটি-ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ওয়াগনার ফ্রড বলে কোন লোক উঠেছে আপনাদের হোটেলে?'

রেজিস্টার দেখল ক্লার্ক। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'উঠেছিল। কিন্তু ও তো চলে গেছে।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। আবার হতাশ। ভুরু নাচাল, 'কি করব?'

'ওর উকিলকে ফোন করব,' কিশোর বলল। 'স্মিথ ক্র্যাক। ওই লোক নিশ্চয় বলতে পারবে, কোথায় পাওয়া যাবে তার মক্কেলকে।'

উকিলের ঠিকানাও পাওয়া গেল হোটেলের খাতায়। ক্র্যাকই দিয়ে রেখেছে, মক্কেল জোগাড়ের জন্যে। পে-ফোন থেকে ফোন করল কিশোর। তিনবার রিঙ হতেই জবাব দিল ক্র্যাক। পরিচিত আত্মম্ভরী কণ্ঠ, 'স্মিথ ক্র্যাক বলছি। কি উপকার করতে পারি আপনার?'

নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল কিশোর, ফ্রডকে কোথায় পাওয়া যাবে।

'সরি, মাই বয়, কোন সাহায্য করতে পারলাম না তোমাকে। ফ্রড কোথায় আছে, বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার।'

রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ক্র্যাক মিথ্যে বলল কিনা বুঝতে পারল না। রবিনকে জানাল, 'খোঁজ পাওয়া গেল না।'

ডেস্কের পাশ কেটে এগোতে যাবে দুজনে, হাত তুলল ক্লার্ক। দাঁড়িয়ে গেল ওরা।

'তোমাদের কোথাও দেখেছি মনে হয়?' ক্লার্ক বলল। 'ও, মনে পড়েছে। পত্রিকায়। তোমরা গোয়েন্দা। এই তো কয়েকদিন আগে এক কোটিপতির মেয়েকে উদ্ধার করে এনেছিলে কিডন্যাপারদের হাত থেকে। তাই না?'

ক্যাসির কথা ভাবল কিশোর। খবরটা ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। মাথা ঝাঁকাল ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে।

'হুঁম!' মাথা দোলাল ক্লার্ক। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্রডকে খুঁজছ কেন? কোন কেস-টেস? লোকটাকে ভাল মনে হয়নি আমার।'

দ্বিধা করে জবাব দিল কিশোর, 'কেসই বলতে পারেন। তবে এখনও শিওর না। কেস বলার মত তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি এখনও।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্লার্ক। 'এসো আমার সঙ্গে। ও কোন ঘরটায় ছিল, দেখিয়ে দিই। খুঁজে দেখো কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা।'

'থ্যাংকস।'

শূন্য ঘরটায় দুজনকে পৌঁছে দিয়ে গেল ক্লার্ক।

তন্ন তন্ন করে খুঁজল ওরা। ড্রয়ারগুলো দেখল। ওয়েস্টবাস্কেট, এমনকি ম্যাট্রেসের নিচেও বাদ দিল না। কিছুই পেল না যেটা ফ্রেডকে খুঁজে পেতে ওদের সাহায্য করে।

'নাহ্, কোন লাভ হলো না,' হতাশ ভঙ্গিতে বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রবিন।

'হুঁ!'

কিশোরও বেরোল তার সঙ্গে। হাতে একগাদা মখমলের পর্দা নিয়ে করিডর ধরে আসতে দেখা গেল একজন আয়াকে। মহিলা কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করতে চলল কিশোর।

'ফ্রেড! ফ্রেড!' মনে করার চেষ্টা করল মহিলা। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অদ্ভুত লোক। কেন যেন দেখতে পারত না আমাকে। পর্দা, বিছানার চাদর বদলানোর জন্যে যেতেই হত আমাকে। ঘরে ঢুকলেই ধমকানো শুরু করত। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে বলত। আজব চরিত্র।'

'কাউকে আসতে দেখেছেন তার কাছে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মহিলা, 'দেখেছি। হ্যান্সি ডুগান বলে এক লোক। প্রায়ই আসত। ওকে ওই নামে ডাকতে শুনেছি ফ্রেডকে। ও ঘরে থাকলে আমাকে পর্দাও বদলাতে দিত না ফ্রেড। বলত, পরে এসো।'

'হ্যান্সি কোথায় থাকে নিশ্চয় জানা নেই আপনার?'

'আছে,' হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'কিন্তু তোমরা এত কথা জানতে চাইছ কেন?'

'আমরা গোয়েন্দা।' পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দেখাল কিশোর। 'একটা বিশেষ কারণে ফ্রেডকে খুঁজছি আমরা।...ঠিক আছে, কথাটা বলেই ফেলি, আপনি যেহেতু আমাদের এত কথা জানাচ্ছেন। ওই লোক আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটা চাবি চুরি করে নিয়ে এসেছে। চুরিটা কেন করল, তাকে জিজ্ঞেস করা দরকার।'

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে বলল মহিলা, 'আমার আগেই মনে হয়েছিল, এ লোক ভাল হতে পারে না। ডুগানের সঙ্গে যেভাবে ফিসফাস করত...ওদের শয়তানির খবর আমি জেনে যাব, এ জন্যেই আমাকে ঘরে থাকতে দিত না।'

'ডুগানের ঠিকানাটা কি?'

'ফিফটিন, ডক স্ট্রীট, প্যাসিফিকপোর্ট।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

মুচকি হাসল মহিলা। 'গোয়েন্দা গল্প পড়তে খুব ভালবাসি আমি। সন্দেহজনক

কিছু ঘটতে দেখলে চোখে পড়ে যায়। ফ্রডকে সন্দেহ হওয়ায় তার ওপর নজর রাখতে লাগলাম। হোটেলের বয়কে একটা চিঠি পোস্ট করতে দিয়েছিল। খামটা দেখেছি। ঠিকানাটা মুখস্থ হয়ে গেছে।'

'হ্যান্সি ডুগান দেখতে কেমন, একটা ধারণা দিতে পারেন?'

ডুগানের চেহারার বর্ণনা দিল মহিলা।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'বিরাট উপকার করলেন।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

রকি বীচ থেকে কয়েক মাইল দূরে প্যাসিফিকপোর্ট। মাঝে মাঝে মাছ ধরতে কিংবা বোটে করে ঘুরতে যায় ওখানে তিন গোয়েন্দা।

'যাব নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'যাবে না মানে,' কিশোর বলল। 'এখনই চলো।'

আধঘণ্টার মধ্যে বন্দর-পাড়ের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল রবিনের ফোক্স-ওয়াগন। একপাশে বন্দরের ঘোলাপানি, আরেকপাশে বাড়ি-ঘরের জটলা। ডক স্ট্রীটে ঢুকল ওরা। নম্বর পড়তে আরম্ভ করল কিশোর। আচমকা হাত রাখল রবিনের বাহুতে। 'রাখো। ওই যে!'

ফিফটিন ডক স্ট্রীট একটা অতি জরাজীর্ণ বাড়ি। খোলা সদর দরজা দিয়ে যখন ঢুকছে ওরা, নোংরা পোশাক পরা একজন গাট্টাগোট্টা লোক ওদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হলঘরে ঢুকল।

'কিশোর,' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'এই লোকই হ্যান্সি ডুগান নয়তো?'

নড়বড়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে লোকটা। পিছু নিল দুই গোয়েন্দা।

'এই যে, স্যার, শুনছেন,' ডাক দিল রবিন। 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

ফিরে তাকাল লোকটা। রাগত স্বরে জানতে চাইল, 'কে তোমরা?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আমাদের কয়েকটা কথার জবাব দেবেন?'

'কে তোমরা?' কর্কশ কণ্ঠে আবারও জিজ্ঞেস করল লোকটা। সচকিত ভাবভঙ্গি।

এবারও জবাব দিল না কিশোর। 'আপনি হ্যারিসন ফ্রডকে চেনেন?'

'না।'

'আপনি হ্যান্সি ডুগান?'

মুখোমুখি দাঁড়ানো দুই কিশোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটা। দৃষ্টির লড়াইয়ে ওদের পরাস্ত করতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কে, সেটা জানার কি দরকার?'

'মিস্টার ফ্রডকে আমাদের বিশেষ দরকার। হ্যান্সি ডুগান হয়ে থাকলে আপনি তার বন্ধু। হয়তো বলতে পারবেন, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'আমার নাম হ্যান্সি ডুগান নয়। এ বাড়ির নিচতলায় একটা দরজার গায়ে হ্যান্সি ডুগানের নাম দেখেছি। গিয়ে দেখতে পারো, ওই লোককেই খুঁজছ কিনা তোমরা।'

আর কিছু না বলে ওপরে চলে গেল সে।

নিচে নেমে এল দুই গোয়েন্দা। হলঘরটা অন্ধকার। ভাপসা গন্ধ। ডুগানের নাম লেখা দরজাটায় থাবা দিল কিশোর।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে শুনল।

খুলে গেল দরজা।

'কি চাও?' খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা এক লোক জিজ্ঞেস করল ওদের। খসখসে কণ্ঠস্বর। গায়ে নীল সোয়েটার।

'আমরা হ্যারিসন ফ্রড আর হ্যান্সি ডুগানের খোঁজে এসেছি,' কিশোর বলল। 'কোথায় পাওয়া যাবে ওদের, বলতে পারেন?'

চোখের পাতা সরু সরু করে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। 'ওদেরকে কি দরকার?'

'জরুরী কথা আছে ফ্রডের সঙ্গে। শুনলাম, হ্যান্সি ডুগান তার বন্ধু। ডুগানকে পেলে ফ্রডকে কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করতাম।'

ফ্রডের চেহারার বর্ণনা দিল কিশোর।

'আমি তাকে চিনি না,' লোকটা বলল।

হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে, পেছনে।

বিপদের গন্ধ পেল কিশোর। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কালো কাপড়ে নাক-মুখ ঢাকা দুটো লোককে এগিয়ে আসতে দেখল ওদের দিকে।

পিছিয়ে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল নীল সোয়েটার পরা লোকটা।

'সাবধান, রবিন!' বলে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

চার

সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওরা।

পারল না।

গায়ের ওপর এসে পড়ল লোক দুটো। কাঠের ছোট লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে কাবু করে ফেলল রবিনকে। বেহুঁশ হয়ে গেল সে।

কিশোরকে যে ধরতে এল, তার পেটে ঘুসি মারার চেষ্টা করল কিশোর। সরে গেল লোকটা। ঠিকমত লাগাতে পারল না কিশোর। তাকে কাবু করাটাও কঠিন হলো না ওদের জন্যে।

দুজনকে টানতে টানতে এনে একটা আলমারিতে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিল।

'চাবিটা তালার ফুটোতেই রেখে দাও,' বলল একজন।

তারপর আর কিছু শোনা গেল না।

কয়েক সেকেন্ড পর জ্ঞান ফিরল রবিনের। কি ঘটেছে মনে পড়ল।

দরজা খোলার চেষ্টা করছে তখন কিশোর।

শক্ত কাঠ। কব্জাও খুব শক্ত। কিছুই করতে পারল না সে। হাল ছেড়ে দিয়ে

হেলান দিল আলমারির দেয়ালে। চিৎকার শুরু করে দিল, 'কে আছেন! এই যে, শুনছেন! আলমারি থেকে বের করুন আমাদের! এই যে ভাই…!'

অবশেষে ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে শুনল। বন্ধু, না শত্রু?

এ বাড়িতে বন্ধু থাকবে আশা করতে পারল না রবিন। শত্রুই ধরে নিল।

কি জানি কি হয়ে গেল ওর, বোধহয় মাথার যন্ত্রণাটাই খেপিয়ে দিয়েছে—দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে শত্রু না মিত্র বাছ-বিচার না করে যে খুলেছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিশোর বাধা দেয়ার আগেই। মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল লোকটাকে নিয়ে। চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, ধরেছি ব্যাটাকে! ধরেছি!'

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল রবিনের শত্রু। 'আরে সরো না গায়ের ওপর থেকে।'

'মুসা!' তাড়াতাড়ি দুজনকে তোলার জন্যে এগিয়ে গেল কিশোর।

'অ্যা, তুমি!' মুসার গায়ের ওপর থেকে দ্রুত সরে এল রবিন। 'বলবে তো আগে। সরি! তুমি এসেছ, কল্পনাই করতে পারিনি। আমি ভাবলাম ওই দুই ডাকাতের একজন।'

'বলার সুযোগ দিলে আর কখন?' উঠে বসে কনুই ডলতে ডলতে বলল মুসা।

'কিন্তু এলে কি করে তুমি এখানে? জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তোমাদের বাড়িতে গিয়ে বোরিসের কাছে শুনলাম থানায় গেছ। গেলাম থানায়। ডিউটি অফিসার বলল হাভানা হোটেলে গেছ। গেলাম সেখানে। হোটেলের আয়ার কাছে জানলাম এখানে এসেছ।'

'বাহ্, চমৎকার একটা গোয়েন্দাগিরি করে ফেলেছ। একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়ে গেল তোমার। তুমি না এলে ওই আলমারির মধ্যে যে কতক্ষণ আটকে থাকা লাগত কে জানে!'

'সরি, মুসা,' রবিন বলল, 'না দেখে তোমার ওপর ঝাঁপ দিয়েছি।'

'থাক থাক; আর মাপ চাওয়া লাগবে না,' কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল মুসা। 'এই মুসা আমানকে কবে উদ্ধার করতে পেরেছ তোমরা? ধন্যবাদ-টন্যবাদ না দিয়ে বরং একটা বড় কোক খাওয়াও তো দেখি, তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে গলা শুকিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, খাওয়াব,' কিশোর বলল। 'আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি, শেষ করে নিই আগে।' রবিনের দিকে ফিরল, 'চলো নীল-সোয়েটারওলার সঙ্গে আবার কথা বলিগে। আমার ধারণা, সে জানে কে আমাদের বাড়ি মেরেছে।'

করিডর ধরে এগোল তিনজনে। আবার এসে দরজাটায় থাবা দিল রবিন। সাড়া দিল না কেউ। আবার থাবা দিল।

'ব্যাপারটা রহস্যময়,' কিশোর বলল। 'ওই লোকটা জানত বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা। ওদের দলের লোক যদি না হবে তো আমাদের সাহায্য করল না কেন? কেন দরজা লাগিয়ে দিল?'

'আমার বিশ্বাস, এই লোকই হ্যান্সি ডুগান,' রবিন বলল।

অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পরও যখন দরজা খুলল না, কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে, নেই। আমরা যখন আলমারিতে, তখন বেরিয়ে চলে গেছে। এখানে আর

কিছু করার নেই আমাদের। চলো, প্যাসিফিকপোর্ট পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে চলে যাই।'

থানায় ঢুকে ডিউটি-সার্জেন্টকে সব খুলে বলল কিশোর। নতুন কিছু ঘটলে তা যেন রকি বীচ থানায় জানানো হয়, অনুরোধ জানিয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ফিরে চলল রকি বীচে।

*

কোনমতেই ফ্রডের কথা মাথা থেকে দূর করতে পারল না কিশোর। হঠাৎ করে কাকতালীয়ভাবেই মনোগ্রামটার সন্ধান পেয়ে গেল।

শনিবারে ম্যাচ খেলার দিন, খেলার মাঠে ফীল্ড হাউসের লকার রুমের করিডর ধরে এগোতে গিয়ে সিমেন্টের মেঝেতে একটা মোকাসিন পড়ে থাকতে দেখল। অন্য সময় হলে এড়িয়ে যেত কিংবা লাথি মেরে সামনে থেকে সরিয়ে দিত। কিন্তু এখন চামড়ার কোন জিনিস দেখলেই সেটার দিকে নজর দেয়। জুতোটা তুলে দেখল। মনোগ্রামটার দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'রবিন, দেখো, দেখো, পাওয়া গেছে!'

রবিনও দেখে বলল, 'আরে, তাই তো! কার জুতো এটা? কে ফেলে গেল?'

খেলার মাঠ থেকে ফিরে এল মেয়ার অ্যান্ডারসন নামে লম্বা একটা ছেলে। লকারের কাছ থেকে একটা জুতো তুলে নিয়ে অন্যটা খুঁজে বেড়াতে লাগল সে। ডাক দিল কিশোর, 'এই যে, আমার কাছে।'

এগিয়ে এল ছেলেটা। 'কোথায় পেলে?'

'করিডরে পড়ে ছিল। তুলে এনে রেখে দিয়েছি। ভাবলাম, যার জুতো সে খোঁজ করবেই।'

'থ্যাংক ইউ,' খুশি হলো মেয়ার। হাত বাড়াল জুতোটার জন্যে। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

'মেয়ার,' কিশোর বলল, 'জুতোটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। খুব সুন্দর। কোনখান থেকে কিনেছ?'

'আমি কিনিনি।'

'কে কিনেছে?'

'গত বসন্তে আমার জন্মদিনে উপহার দিয়েছে আমার এক আঙ্কেল, আঙ্কেল রোডস। এ জিনিস রকি বীচের দোকানে পাবে না। আঙ্কেল বলেছে, ইনডিয়ানরা বানায়।'

'কোন ইনডিয়ানরা?' জানতে চাইল রবিন।

'তা তো জিজ্ঞেস করিনি।'

'মেয়ার,' কিশোর বলল, 'তোমার আঙ্কেল রোডসকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবে, প্লীজ? জানতে পারলে একটা চোরকে ধরতে সুবিধে হত।'

হাসল মেয়ার। 'নতুন কেস নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

এক মুহূর্ত ভাবল মেয়ার। 'এক কাজ করো না বরং। কাল চলে এসো ডিয়ারভিলে, আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়ির কয়েক ব্লক পরেই থাকে আঙ্কেল

রোডস। তোমাদের সামনেই তাকে ফোন করব। নাহয় তোমাদের নিয়ে তার বাড়িতেই চলে যাব। যা যা প্রশ্ন করার নিজেরাই করতে পারবে। আসবে?'

খুশিমনে রাজি হয়ে গেল কিশোর, 'আসব।'

পাঁচ

রবিবার বিকেলে ডিয়ারভিলে এসে হাজির হলো দুই গোয়েন্দা। সেদিনও সঙ্গে আসতে পারল না মুসা। বাগান পরিষ্কারের কাজে ওকে লাগিয়ে দিয়েছেন ওর আম্মা। ফোন করেছিল কিশোর। মুসা বলেছে, আসতে পারবে না। বেরোতে না পারায় মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে ওর। টেলিফোনেই বোঝা গেছে।

মেয়ারদের বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। গাছপালায় ঘেরা একটা র‍্যাঞ্চ টাইপের বাড়ি।

কিশোরদের অপেক্ষাতেই ছিল মেয়ার। গাড়ির শব্দ পাওয়ামাত্র দৌড়ে এসে গেট খুলে দিল। ঘরে নিয়ে গেল।

ফোনে পাওয়া গেল না মেয়ারের আঙ্কেল রোডসকে। লাইন এনগেজ। মেয়ার বলল, কয়েক মিনিট হাঁটলেই তাঁর বাড়িতে চলে যাওয়া যাবে। সেটাই ভাল মনে করল দুই গোয়েন্দা।

মন দিয়ে ওদের কথা শুনলেন আঙ্কেল রোডস। পাইপে ঘন ঘন টান দিয়ে বললেন, 'ট্রেনে এক লোকের কাছ থেকে কিনেছিলাম জুতোজোড়া। অপরিচিত লোক। পরে আর কোনদিন দেখিনি ওকে।'

'ইনডিয়ান?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'কোন উপজাতির?'

'তা তো জিজ্ঞেস করিনি।'

আর কিছু জানাতে পারলেন না আঙ্কেল রোডস। ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। রকি বীচে রওনা হলো।

'আবার অন্ধগলি!' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'কোন সূত্রই ধরে রাখা যাচ্ছে না। যেখানে ছিলাম, সেখানেই রয়েছি। এগোনো নেই।'

'আচ্ছা, এমন তো হতে পারে,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল রবিন, 'আর আদ্যক্ষর দিয়েই নাম শুরু হয়েছে ইনডিয়ান গোত্রটার? ইনডিয়ানদের ওপর খানিকটা রিসার্চ-টিসার্চ করলে কেমন হয়?'

'মন্দ হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'ভাবছি, ফ্রড লোকটা ইনডিয়ান নয়তো?'

'চেহারা দেখে তো মনে হয় না।'

'পূর্ণ-রক্ত নয়। আধা-রক্ত, মানে হাফ-ব্রীড হতে অসুবিধে কোথায়?'

'তা হতে পারে।...মুসাদের বাড়ি ঘুরে যাব নাকি?'

'যাও।'

এক প্লেট বড় বড় বার্গার নিয়ে তখন খেতে বসেছে মুসা। দুই বন্ধুকে দেখে হাসল। 'যাহ্, একা একা আর সারতে পারলাম না। ঠিক চলে এলে ভাগ বসাতে।' প্লেটটা দুজনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'নাও, শুরু করে দাও। চিন্তা নেই। ফ্রিজে আরও আছে।'

দুজনে দুটো বার্গার তুলে নিল কিশোর আর রবিন। ডিয়ারভিলে গিয়ে কি করে এসেছে, খেতে খেতে মুসাকে জানাল। ইনডিয়ানদের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মুসা।

'কি হলো?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রবিন।

'আসছি,' হাতের বার্গারের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে দিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা।

কয়েক মিনিট পর দরজার কাছ থেকে শোনা গেল বিচিত্র হাঁক।

চমকে গিয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর আর রবিন। হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

ভারী গলায় নাটকীয় ভঙ্গিতে মুসা বলল, 'আমি চীফ ওয়ালাপ্যাটুকুংক!'

'মুসা!' হেসে উঠল রবিন। 'হঠাৎ এই ইনডিয়ান সর্দার সাজার শখ হলো কেন?'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এ পোশাক তুমি কোথায় পেলে?'

ইনডিয়ান সর্দারের মত হেলেদুলে রাজকীয় চালে হেঁটে এসে মাথা দুলিয়ে বলল মুসা, 'এটা ইনডিয়ানদের যুদ্ধের পোশাক। বাবা নিয়ে এসেছে। নতুন যে ছবিটাতে কাজ করছে, তাতে নাকি লাগবে। প্যাশুঙ্ক গোত্রের পোশাক।'

'ওয়ালাপ্যাটুকুংক নামটা কোথায় পেলে?' জানতে চাইল রবিন।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'কিছু জানো মনে হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ। ওয়ালাপ্যাটুকুংক ইনডিয়ান শব্দ। এর মানে হলো আস্ত-একটা-মুজ-খেয়ে ফেলো।'

'মুজ হরিণ তো?' মুসা বলল, 'কাবাব হিসেবে পেলে খেয়ে ফেলতে আপত্তি নেই আমার।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি কোথায় পেলে এই নাম?'

'বাবাকে বলতে শুনেছি। অদ্ভুত একটা গল্পও শুনিয়েছে বাবা, কাল রাতে। ওই গল্পটার ওপর ভিত্তি করেই ছবিটা হচ্ছে। কিসের গল্প, শুনবে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর আর রবিন দুজনেই।

'গুপ্তধনের গল্প,' মুসা বলল। 'প্যাশুংক গোত্রের লোকের বিশ্বাস, ওরা যে অঞ্চলে বাস করে সেখানে নাকি মাটির তলে মহামূল্যবান, মহাপবিত্র প্রচুর ধন-সম্পদ লুকানো আছে।'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের, 'মাটির তলে গুপ্তধন?'

'কোন জায়গায়?' জানতে চাইল রবিন।

'তা কেউ জানে না,' জবাব দিল মুসা।

'কিন্তু কোন না কোন সূত্র নিশ্চয় আছে,' কিশোর বলল।

'আছে। গুজবটা বলছে ক্রুশের মত একটা ছায়ার নিচে লুকানো আছে ওগুলো।'

'ছায়াটা কিসের? ক্রুশের নাকি?'
'তা কেউ জানে না।'
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'কিন্তু আমরা নিশ্চয় প্যাশুংকদের খুঁজছি না। তাদের নামের আদ্যক্ষর "আর" নয়।'
'বই ঘাঁটা দরকার,' রবিন বলল। 'এ ছাড়া আর কোথাও পাব বলে মনে হয় না। আদ্যক্ষর "আর" আছে কোন ইনডিয়ানদের, একমাত্র রেফারেন্স বইতেই পাওয়া যাবে।'
'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'উপজাতির নাম জানতে পারলে কোন্ কোন্ কাজে ওরা দক্ষ, সেটাও জানা যাবে নিশ্চয়।'
খাওয়ার পর লাইব্রেরিতে চলল ওরা।
পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল। একগাদা বইপত্র এনে রীডিং টেবিলে ফেলল রবিন। ওল্টাতে শুরু করল তিনজনে মিলে।
সবচেয়ে পুরানো বইগুলোর প্রতি আগ্রহ কিশোরের। হলদে হয়ে আসা পাতাগুলো সাবধানে উল্টে চলল সে।
ডজন ডজন গোত্রের নাম জানতে পারল, যেগুলোর অস্তিত্বই নেই আর এখন। বহুকাল আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওরা। নামগুলোও বিচিত্র। অ্যাবনাকিস, শনিজ, ন্যারাগানসেটস, আর আরও সব দাঁতভাঙা উচ্চারণের নাম। এক সময় রকি বীচে আস্তানা ছিল ওদের, শিকার করে বেড়াত, এখন বিলুপ্ত—ভাবলে কেমন লাগে!
'আমরা যাদের খুঁজছি,' রবিন বলল, 'তাদের গোত্রটা হয়তো এতই ক্ষুদ্র, ইতিহাসেও নাম ঠাঁই পায়নি।'
নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পাতা উল্টে যেতে থাকল।
বই ঘাঁটাঘাঁটি ভাল লাগে না মুসার, তবু ধৈর্য ধরে দেখতে লাগল।
কিন্তু একটা গোত্রও পাওয়া গেল না যেটার নামের আদ্যক্ষর "আর"।
'কি করবে?' হতাশ ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল রবিন। 'পাওয়া তো গেল না।'
'অত সহজে হাল ছাড়ছি না আমি,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'বের করেই ছাড়ব।'
'যদি থেকে থাকে।'
বাড়ি ফেরার সময় হলো। মুসা লাইব্রেরি থেকেই চলে গেল। কিশোরকে নামিয়ে দিতে চলল রবিন।
স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছে পৌঁছে বাড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'ওই দেখো!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল সে। 'ওই জানালাটা!'
দোতলার জানালার দিকে তাকাল রবিন। চাঁদের আলোয় দেখা গেল একজন লোক বেরিয়ে আসছে জানালা দিয়ে।
গাড়ি ভেতরে ঢোকানোর আর সময় নেই। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে পাশের দরজা খুলে একলাফে বেরিয়ে এল রবিন। তার আগেই নেমে পড়েছে কিশোর। দৌড় দিল লোকটাকে ধরার জন্যে।
ড্রাইভওয়েতে ঢুকে আবার যখন ওপরে তাকাল, দেখল, রান্নাঘরের ছাতের

পাশে কার্নিসের মত বেরিয়ে থাকা চাতালটার ওপর নেমে পড়েছে ততক্ষণে লোকটা। ঠিক এই সময় চাঁদকে ঢেকে দিল ঘন কালো এক টুকরো মেঘ। অন্ধকারে হারিয়ে গেল লোকটা।

'জলদি এসো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ওকে পালাতে দেয়া চলবে না!'

ধুপ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ার শব্দ হলো। রান্নাঘরের পাশের চত্বরে।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আবার চাঁদ।

কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা।

ছয়

গেল কোথায়?

'জলদি!' আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওদিক দিয়ে ঘুরে যাও।'

বাড়ির ছায়ায় কাউকে লুকিয়ে থাকতে দেখা গেল না। পাশের বাগানটায় খুঁজল ওরা। লাভ হলো না। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন লোকটা।

'ঘরে গিয়ে দেখা দরকার,' কিশোর বলল, 'কিছু নিল কিনা!'

সিঁড়ির সবগুলো বাতি জ্বলে উঠেছে।

লাফ দিয়ে নিচতলার বারান্দায় উঠল দুজনে। দৌড়ে হলঘরে ঢুকল।

সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'চাচী, সব ঠিক আছে?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মেরিচাচী। 'এসেছিস! বাঁচলাম!'

হাতের ছাতাটা নাচালেন তিনি। বাড়ি মারার জন্যে নিয়েছিলেন।

'দোতলার জানালা দিয়ে একটা লোককে বেরিয়ে যেতে দেখলাম,' কিশোর বলল।

'ধরতে পারলি না কেন তাহলে?' আবার ছাতা নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পালাল।'

'চুরি করেছে নাকি কিছু?' জানতে চাইল রবিন। 'চেহারা দেখেছেন?'

'না। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল। হলঘরে খুটুর-খাটুর শুনে মনে পড়ে গেল ফ্রেডের কথা। ভাবলাম, নিশ্চয় আবার এসেছে কী-কেস চুরি করতে। একবার ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে আমাকে, ভাবতেই রাগ হলো ভীষণ। ভাবলাম, আজ আর যেতে দেব না বাছাধনকে। আস্তে করে গিয়ে বাইরে থেকে সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দিলাম। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে রান্নাঘর থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে হলঘরে ঢুকলাম। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে দৌড় দিল সে। খুলতে না পেরে সিঁড়ির দিকে দৌড়। দোতলার ঘরের জানালা গলে পালাল শেষে।'

'বোরিসকে ডাকলে না কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সময় পাইনি।'

মেরিচাচীর ছাতার আওতায় পড়লে লোকটার কি দুর্গতি হত ভেবে হেসে

ফেলল কিশোর। 'হলঘরে কি করছিল?'

'ফাইলিং কেবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করছিল মনে হলো।'

যা ভেবেছে তাই। আর কিছু না বলে স্টাডির দিকে ছুটল কিশোর। রবিন এল পেছন পেছন।

একবার দেখেই নিশ্চিন্ত হলো কিশোর।

'ভাগ্যিস তালাটা বদলে রাখার কথা আগেই মাথায় এসেছিল তোমার,' রবিন বলল।

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে কেবিনেটটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'তবে চাচী না শুনলে তালাটা ভেঙে ফেলত ও।'

'কী-কেসটা আছে নাকি, দেখো তো?'

চাবি এনে তালা খুলল কিশোর। আছে কেসটা। জায়গামতই।

'কে লোকটা?' রবিনের প্রশ্ন।

'ফ্রড ছাড়া আর কে? কোন সূত্রটুত্র ফেলে গেল কিনা দেখা যাক।'

তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হলো। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। হতাশ ভঙ্গিতে কেবিনেটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে রবিন, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ড্রয়ারের হাতলের কোনায় আটকে আছে এক টুকরো উলের সুতো। হাত বাড়িয়ে সুতোটা খুলে নিল সে।

'কি পেলে? দেখি?' এগিয়ে এল কিশোর। রবিনের হাতে নীল রঙের উলটা দেখে বলে উঠল, 'আরে এ তো সেই লোকটা! প্যাসিফিকপোর্টে? মনে নেই? নীল সোয়েটার গায়ে ছিল?'

'ঠিক বলেছ!' বলে উঠল রবিন। 'চাবিটা নিয়ে গিয়ে নীল সোয়েটার পরা লোকটাকে দিয়েছে ফ্রড। সে এসেছে কেবিনেট খুলে কী-কেস চুরি করার জন্যে।'

'চলো, কাল আবার যাই প্যাসিফিকপোর্টে। লোকটাকে জিজ্ঞেস করি।'

পরদিন সোমবার, ক্লাসের পর আবার প্যাসিফিকপোর্টে যেতে তৈরি হলো গোয়েন্দারা। মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি, যাবে নাকি?'

'নাহ্, আজও যেতে পারব না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মুসা। 'আমাদের বাগানের কাজ শেষ হয়নি এখনও।'

'তাহলে আর কি করা। আমি আর রবিনই যাই।'

'যাও। সাবধান থেকো। লোক ভাল না ওরা।'

কাছেই দাঁড়ানো ওদের বন্ধু বিড ওয়াকার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা? কোন কেসটেস নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ।'

'আমি যেতে পারি সঙ্গে ' কিশোরের দিকে তাকাল বিড। 'তোমাদের পাহারা দিতে পারব।'

অনেক কেসে ওদের সাহায্য করেছে বিড। আপত্তি করল না কিশোর। 'ঠিক আছে, চলো।'

'থ্যাংক ইউ। কোথায় যাচ্ছ বললে না তো।'

কোথায় যেতে হবে, বলল কিশোর।

'তাহলে আরেক কাজ করা যেতে পারে,' বিড বলল। 'গাড়িতে করে না গিয়ে আমাদের মোটরবোটটা নিতে পারি। বোটে করে প্যাসিফিকপোর্টে যাওয়া সহজ। শর্টকাট হবে।'

প্রস্তাবটা মন্দ না। পছন্দ হলো কিশোরের।

বিডদের প্রাইভেট পোর্ট থেকে বোটটা নিয়ে রওনা হলো তিনজনে। প্যাসিফিকপোর্টে পৌঁছে বিডকে বোট পাহারায় থাকতে বলল কিশোর। বলল, ওরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যদি ফিরে না আসে, যেন খুঁজতে যায় বিড। রবিনকে নিয়ে তীরে উঠল কিশোর। সেদিনের সেই বাড়িটার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। ঢোকার আগে দ্বিধা করল একবার কিশোর। তারপর রবিনের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

হ্যাঙ্গি ডুগানের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। কোন্‌দিক থেকে আচমকা আঘাত আসে, এই ভয়ে আবছা অন্ধকার করিডরের দিকে নজর রাখতে লাগল কিশোর। রবিন থাবা দিল দরজায়।

যার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ছুটে এসেছে, দরজা খুলে দিল সেই লোকটাই। পরনে সেই নীল সোয়েটার।

'আবার কি চাই?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' জবাব দিল কিশোর। 'সেদিন তো কোন কথা হলো না।'

'এসে ভাল করোনি। তোমাদের সঙ্গে কোন কথা নেই আমার। কোন কথার জবাব দেব না।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন কেন?'

'তোমাদের বাড়িতে আমি যাব কেন?' রেগে উঠল লোকটা।

'চুরি করতে, আর কেন!' বলার ইচ্ছে ছিল কিশোরের। বলল না। নীল উলের সুতোটা লোকটার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'আপনার সোয়েটারের। পেটের কাছে কুঁচকানো দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকেই ছিঁড়ল নাকি?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটা। তবে দ্রুত সামলে নিল। 'হতে পারে সুতোটা এই সোয়েটারের, তবে আমার সোয়েটারের বলতে পারবে না। এটা আমার সোয়েটার নয়। পরার জন্যে ধার নিয়েছি।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করলাম না,' কিশোর বলল। ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। দেখাদেখি রবিনও চলে এসেছে ঘরে।

'অকারণ দোষ দিচ্ছ আমাকে,' লোকটা বলল। 'ঠিক আছে, বলো, কি জানতে চাও?'

অবাক হলো দুই গোয়েন্দা। এত সহজে নরম হয়ে যাবে লোকটা ভাবতে পারেনি। পরস্পরের দিকে তাকাল। হাসি ফুটল মুখে।

'আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে আপনাকে,' শীতল কণ্ঠে কিশোর বলল। 'যা বলার পুলিশের সামনে বলবেন।'

'ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও। শোবার ঘর থেকে আমার কোটটা নিয়ে আসি।'

বাধা দেবার আগেই ঘুরে গিয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল লোকটা।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'পালানোর চেষ্টা করবে না তো?'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'এই যে, শুনছেন?'

সাড়া নেই।

বার দুই ডেকে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

মাথা নেড়ে সায় জানাল কিশোর।

দরজায় ঠেলা দিল রবিন। দিতেই খুলে গেল। ভেতরে উঁকি দিল।

লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না।

'গেল কোথায়?'

ঘরে ঢুকে পড়ল দুজনে। চারপাশে তাকিয়ে কোনখানে দেখল না লোকটাকে। বেরোনোর পথ নেই, একমাত্র জানালাটা ছাড়া। সেটাও ভেতর থেকে আটকানো। রবিনকে হলের দিকে নজর রাখতে বলে খাটের নিচে উঁকি দিল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল খাটের তলায়। ট্র্যাপডোরটা দেখতে পেল। ঢাকনা তোলা।

ওখান থেকেই রবিনকে জানাল কথাটা। বলল, 'নিচে নেমে দেখতে যাচ্ছি।'

ট্র্যাপডোরের মুখের কাছ থেকে একটা দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সেটা বেয়ে নামতে লাগল সে।

নেমে এল বেসমেন্টের মেঝেতে। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল। কাউকে চোখে পড়ল না।

আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালমত খুঁজল। কিন্তু নেই।

ওপর থেকে রবিনের ডাক শোনা গেল, 'কিশোর? কি খবর?'

'নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'কিভাবে গেল বোঝার চেষ্টা করছি।'

মোটরবোটের ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল।

'বেসমেন্টটা মনে হচ্ছে ডকের খুব কাছে,' রবিনকে বলল সে। 'একটা দরজা দেখতে পাচ্ছি। অপেক্ষা করো। জানাচ্ছি তোমাকে।'

এগিয়ে গিয়ে দরজার নব ধরে মোচড় দিল সে। সহজেই খুলে গেল পাল্লাটা।

উজ্জ্বল রোদ যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল। চোখ মিটমিট করতে লাগল সে। চোখে আলো সয়ে এলে দেখল, ছোট একটা ডকে বেরিয়ে এসেছে।

ওপর থেকে শোনা গেল আবার রবিনের চিৎকার, 'কি দেখছ? কিশোর? এই, কিশোর?'

'লোকটা নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'বিডদের মোটরবোটটা শুধু দেখতে পাচ্ছি। জানালা খুলে দেখলে তুমিও দেখতে পাবে।'

পরের ডকে বোট বেঁধে অপেক্ষা করছে বিড। চিৎকার করে ডাকল কিশোর, 'বিড, আই বিড!'

ফিরে তাকাল বিড। কিশোরকে দেখে হাত নাড়ল।

হাত নেড়ে ওকে আসতে ইশারা করল কিশোর।

বোট নিয়ে এগিয়ে এল বিড।

কাছে এলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এদিক দিয়ে কাউকে বেরোতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ। দুজন।'

'কোনদিকে গেছে?'

'মোটরবোটে করে গেছে, রকি বীচের দিকে।'

'কারও গায়ে নীল সোয়েটার ছিল?'

'গায়ে ছিল না। একজনের বগলে ছিল।'

'ওদেরই খুঁজছি আমরা!' ঘরে ঢুকে ওপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল সে, 'রবিন, জলদি নেমে এসো!'

দুই গোয়েন্দা উঠে বসতে বোটের নাক ঘোরাল বিড। ছুটল রকি বীচের দিকে।

কিছুদূর এগিয়ে কপালের কাছে হাত রেখে রোদ আড়াল করে দেখতে লাগল বিড। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, 'ওই যে, যাচ্ছে ব্যাটারা!'

গতি বাড়িয়ে দিল বোটের।

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বোট।

আগের বোটটাও দ্রুত ছুটছে। কিন্তু ওদের চেয়ে বিডদের বোটটা নতুন, গতি বেশি। দেখতে দেখতে দূরত্ব কমিয়ে আনল মাঝখানের।

সামনের বোটে তিনজন লোক। একজন হুইল ধরেছে, বাকি দুজন বসে আছে।

'ওই যে নীল সোয়েটার,' রবিন বলল। 'আবার মুখে কালো কাপড় বেঁধেছে।'

বাকি দুজনের মুখেও কালো কাপড় বাঁধা।

'পাশের লোকটা নিশ্চয় ফ্রড,' বোটের কিনার খামচে ধরল কিশোর।

'হতে পারে,' রবিন বলল।

সামনের বোটের আরও কাছে চলে এল বিডের বোট।

ফিরে তাকাল নীল সোয়েটার পরা ডুগান। দেখে ফেলল গোয়েন্দাদের। চিৎকার করে কিছু বলল পাইলটকে। মুহূর্তে বেড়ে গেল ইঞ্জিনের গতি। খেপা ঘোড়ার মত সামনে লাফ দিল ওদের বোট। ছুটতে শুরু করল তীব্র গতিতে।

বিডও ছাড়ল না। পিছে লেগে রইল।

গোয়েন্দাদের এ ভাবে খসাতে পারবে না বুঝে নিচু হয়ে গেল ডুগান আর ফ্রড। বোটের নিচ থেকে ভারী একটা তক্তা তুলে ফেলে দিল বিডের বোটের সামনে।

সরার চেষ্টা করল বিড। পারল না। তক্তার এক মাথার ভয়ানক খোঁচা লাগল বোটের গলুইয়ের ঠিক নিচে।

সাত

ঝাঁকুনিটা এতই সাংঘাতিক, সামলাতে পারল না গোয়েন্দারা। ছিটকে পড়ল পানিতে।

কয়েকটা সেকেন্ড কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারল না। ঢেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেল। কানে এল বিডের চিৎকার, 'কিশোর! রবিন! ভাল আছ তোমরা?'

মাথা তুলে জবাব দিল কিশোর, 'আছি।'

রবিনও মাথা তুলেছে।

দুজনের চোখ বোটের গলুইয়ের নিচে। মস্ত এক গর্ত হয়ে গেছে। ওখানেই লেগেছিল তক্তার খোঁচা। ঢেউয়ের দোলায় সামনের অংশটা নিচু হলেই পানি ঢুকছে, ওপরে উঠলে ঢোকা বন্ধ।

'এ ভাবে উঠতে থাকলেও ডুবে যাবে!' চেঁচিয়ে বলল রবিন।

ইঞ্জিনও বন্ধ হয়ে গেছে। চালু করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে বিড। কিছুই করতে পারছে না।

'ওদের বোটটা গেল কোনদিকে?' জানতে চাইল কিশোর।

তীরের কাছে জড়াজড়ি করে থাকতে দেখা গেল অনেকগুলো মোটরবোটকে। ওগুলোর মাঝখানেই হয়তো গিয়ে ঢুকেছে। আলাদা করে চেনা গেল না। আবারও ওদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে ফ্রড।

রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'তক্তা ফেলেছিল যে লোকটা, তার হাতের বিরাট কাটা দাগটা দেখেছ?'

'দেখেছি। ডব্লিউর মত দেখতে। ফ্রড।'

বোট থেকে বিড বলল, 'স্টার্ট যে হচ্ছে না! কি করা? সহজে না ডুবলেও স্রোতে ভেসে যাব।'

'ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা হয়তো করা যেতে পারে,' কিশোর বলল। 'তবে ভেসে যাওয়া ঠেকানো সম্ভব নয়।...রবিন, এসো, ধরো তো। দেখি কি করা যায়।'

ফোকরটা হয়েছে বোটের তলা যেখানে পানি ছুঁয়েছে ঠিক সেখানে। দুজনে মিলে ঠেলে তুলে ধরে রাখল। বিড চলে গেছে পেছন দিকে। ওপরে ঠেলে রাখতে কষ্ট হলেও অসম্ভব হলো না।

ওই অবস্থাতেই ভেসে চলল বোট। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যেতে লাগল দুই গোয়েন্দা। পানি ওঠা বন্ধ।

ঠাণ্ডা পানিতে অমানুষিক কষ্ট করতে করতে যখন আর পারছে না, এই সময় কোস্ট গার্ডের চোখে পড়ল বোটটা। ছুটে এল ওদের একটা উদ্ধারকারী ছোট জাহাজ। গোয়েন্দাদের তুলে নিল জাহাজে। বোটটাকে বেঁধে নিল জাহাজের গায়ে। তীরে নামিয়ে দিল।

ডকেই আছে বোট মেরামতের ওঅর্কশপ। বোটটা মেরামত করতে দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে রকি বীচে ফিরতে হলো।

বিড চলে গেল ওদের বাড়ির দিকে। ইয়ার্ডে ঢুকল দুই গোয়েন্দা।

দেখেই বলে উঠলেন মেরিচাচী, 'কোথায় গিয়েছিলি? অস্থির হয়ে গেছে মুসা। একের পর এক ফোন।'

'কেন?'

'কি জানি! বলল, জরুরী। এলেই যেন ফোন করিস।'

ফোন করল কিশোর। শোনা গেল মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ, 'কিশোর! আর-এর খোঁজ পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'বাবার লাইব্রেরিতে। ইনডিয়ানদের ওপর লেখা একটা বইতে। রামাপান

ইনডিয়ান।'

'এখনই আসছি!'

কিশোর ফোন রাখতেই মেরিচাচী বললেন, 'এখনই যাচ্ছিস মানে? খেয়ে যা।'

'জলদি দাও। তাড়াতাড়ি।'

আধঘণ্টার মধ্যে মুসাদের বাড়িতে পৌঁছে গেল কিশোর আর রবিন।

বইটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে।

রামাপানরা ছোট একটা উপজাতি। রকি বীচ থেকে পাঁচশো মাইল দূরে থাকে। ছোট ছোট ধাতব খেলনা আর চামড়ার জিনিস বানানোর দক্ষ কারিগর আছে ওদের।

নামের আদ্যক্ষর "আর"। চামড়ার জিনিস বানায়। সব মিলে যাচ্ছে!

উত্তেজিত কণ্ঠে মুসাকে বলল কিশোর, 'একটা ম্যাপ নিয়ে এসো তো।'

রেফারেন্স বইতে জায়গার নাম দেয়া আছে। ম্যাপে দেখতে লাগল কিশোর, কোথায় আছে রামাপানদের বাস।

'এই যে,' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রেখে বলল সে। 'লোকসংখ্যা তো দেখা যাচ্ছে খুবই কম।'

রুক্ষ একটা আদিম পার্বত্য অঞ্চল। জঙ্গলে ছাওয়া।

মুসা বলল, 'প্যাশুঙ্করাও ওখানেই বাস করে। যেতে পারলে মন্দ হয় না। কিংবদন্তীর গুপ্তধনগুলো খোঁজা যেতে পারে।'

'যেতে অসুবিধে কি?' রবিন বলল।

'আমার তো মনে হয় না কোন অসুবিধে আছে। কিশোর, কি বলো?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করেছে কিশোর। ম্যাপের দিকে চোখ। মুসার কথা কানে যেতে মুখ তুলে তাকাল, 'উঁ!'

'বলছিলাম, রামাপানদের গাঁয়ে গেলে কেমন হয়?' মুসা বলল।

'মন্দ হয় না।'

'যেতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু ওখানে কেন যেতে চাইছি আমরা?' রবিনের প্রশ্ন। 'ফ্রডকে খুঁজতে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'সেটা একটা কারণ। তা ছাড়া যে জন্যে ফ্রড যেতে চাইছে ওখানে, আমরাও সে-জন্যেই যাব।'

'ফ্রড কেন যেতে চাইছে?'

জবাব দেয়ার আগে নিচের ঠোঁট ধরে জোরে এক টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। 'গোড়া থেকে দেখা যাক। ফ্রড একটা বিশেষ কী-কেস নিতে আমাদের বাড়িতে গেল। কিনতে চাইল। না পারায় চাবি চুরি করল। রাতে লোক পাঠাল কেবিনেট খুলে কী-কেসটা চুরি করতে। তারমানে, কী-কেসটা মূল্যবান। ওটা পরীক্ষা করে কিছুই পেলাম না আমরা। কিন্তু আমরা না পেলেও নিশ্চয় কিছু আছে ওতে, কিংবা ছিল, যেটা ফ্রডের ভীষণ প্রয়োজন। সেই জিনিসটা কি? গুপ্তধনের নকশা হলেও অবাক হব না, কারণ, দেখা যাচ্ছে ওদিকটায় ইনডিয়ানদের গুপ্তধনের গুজব আছে প্রচুর, এই প্যাশুঙ্কদের কথাই ধরো না। হতে পারে, রামাপানদেরও আছে। সেই গুপ্তধনেরই খোঁজ করছে ফ্রড। কী-কেসটা যেহেতু হাতাতে পারেনি, আমার বিশ্বাস, আবার চুরি করার চেষ্টা করবে সে। আর ইতিমধ্যে যদি রামাপান

কান্ট্রিতে রওনা হয়ে যাই আমরা, আমি শিওর, আমাদের পিছু নেবে সে। তাতে আমাদের এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। ফ্রডকে টেনে নিয়ে যেতে পারব, সুযোগ মত পাকড়াও করতে পারব তাকে; সেই সঙ্গে গুপ্তধনেরও খোঁজ করতে পারব।' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল সে, 'কি মনে হয়? রামাপান কান্ট্রিতে যাওয়ার জন্যে কারণগুলো যথেষ্ট?'

'যথেষ্ট!' সমস্বরে জবাব দিল রবিন ও মুসা।

সারাটা বিকেল অভিযানের পরিকল্পনা করে কাটাল তিন গোয়েন্দা। রামাপানদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে নিল বই পড়ে। ওদের ইতিহাস, ওদের সমাজ ব্যবস্থা, সব।

সন্ধ্যার অনেক পরে যার যার বাড়ি ফিরল কিশোর আর রবিন।

পরদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর থানায় ঢুঁ মারতে গেল দুজনে। পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচার অফিসেই আছেন। ফ্রড আর তার সহকারীদের কোন খবর আছে কিনা জানতে চাইল কিশোর।

'না, নেই তেমন কিছু,' স্যুইভেল চেয়ারে হেলান দিলেন ক্যাপ্টেন। 'ওরা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আশেপাশের সমস্ত শহরের পুলিশকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এবার বেরোলে আর বাঁচতে পারবে না। ধরা ওদের পড়তেই হবে।'

থানা থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা।

পরদিন সকালে স্কুলে এসে দেখে মহা উত্তেজনা। কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে একজন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'ঘটনাটা কি?'

একটা নোটিশ দেখিয়ে ছেলেটা বলল, 'পড়ে দেখো।'

নোটিশটা পড়ল রবিন। হঠাৎ করে হীটিং প্ল্যান্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ছাত্রদের ক্লাস করার অসুবিধের কথা ভেবে কিছুদিনের জন্যে ছুটি দিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

'যাহ্, দারুণ হলো,' তুড়ি বাজাল মুসা। 'এক্কেবারে সময়মত। রামাপান পাহাড়ে চলে যাব আমরা।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'কি বলো?'

আট

'চলো, স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নেয়া যাক ট্রেন ছাড়বে কটায়,' কিশোর বলল।

জানা গেল, রামাপান কান্ট্রিতে যেতে হলে ল্যানটার্ন জংশনে নামতে হবে। এর পরে শ্বেতাঙ্গদের আর কোন গ্রাম নেই। বেলা এগারোটায় রকি বীচ স্টেশন থেকে ছাড়বে রামাপানে যাওয়ার ট্রেন।

'দেরি কোরো না,' দুই সহকারীকে বলল কিশোর। 'বাড়ি গিয়ে ব্যাগ-ব্যাগেজ গুছিয়ে নাও। দু'ঘণ্টার বেশি সময় পাবে না। সোজা চলে আসবে স্টেশনে। আমিও চলে আসছি। এখানেই দেখা হবে।'

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই স্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। তিনজনেই উত্তেজিত।

'কারও কোন অসুবিধে হয়নি তো?' জানতে চাইল কিশোর।

'হয়েছিল। আরেকটু হলেই আটকে দিয়েছিল মা, অনেক কাজ নাকি বাকি পড়ে আছে,' মুসা জানাল। 'অনেক কষ্টে ছুটে বেরিয়েছি।'

'আমাকেও আটকে দিচ্ছিল চাচী,' কিশোর বলল। 'ইনডিয়ানরা ভয়ঙ্কর, নরমুণ্ড শিকারি–হেনতেন নানা কথা বলে আসতে দিতে চাচ্ছিল না।'

রবিন বলল, 'আমার তেমন কোন অসুবিধে হয়নি। মা শুধু বলল, সাবধানে থাকতে।'

টিকেট কাটা হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মের কিনারে লাইনের ধারে এসে দাঁড়াল তিনজনে। ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। পাশে কাত হয়ে মুখ তুলে তাকাল মুসা। দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনটাকে দূরে রয়েছে এখনও।

'ওই যে, আসছে!'

কথা শেষ হলো না তার, রাস্তার দিক থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার। ঝট করে ঘুরে গেল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো প্রায় সব ক'টা মুখ। একই সঙ্গে টের পেল কিশোর আর রবিন, লাইনের ওপর ঠেলে ফেলে দেয়া হচ্ছে ওদের।

চিৎকারটা করা হয়েছে সবার নজর অন্য দিকে সরিয়ে দিয়ে ওদের ফেলে দেয়ার জন্যে, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্ট করল সে। পারল না। পড়ে গেল নিচে। লাইনের ওপর। পড়ে রইল। কোমরের কাছে মেরুদণ্ডে আঘাত লেগেছে, সাময়িক অবশ হয়ে গেছে শরীর। উঠতে পারছে না।

চিৎকার করে উঠল বহুলোক।

ট্রেন এসে গেছে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল মুসার শরীরে। ঝাঁপিয়ে পড়ল লাইনের ওপর। দুই হাতে কিশোরকে তুলে ধরে প্রায় ছুঁড়ে ফেলল একপাশে। গড়ান দিয়ে নিজেও সরে গেল লাইনের ওপর থেকে।

'ওহ্, বাঁচল!' কে যেন চিৎকার করে উঠল।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। রবিন এসে তার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল কোথাও লেগেছে কিনা। মুসার দিকে তাকিয়ে কাঁপা কণ্ঠে কিশোর বলল, 'থ্যাংকস!'

জনতা ঘিরে ধরেছে ওদেরকে। নানা কণ্ঠে নানা প্রশ্ন। কি করে পড়ল? পা পিছলেছিল? না দেখে লাইনের দিকে বেশি সরে গিয়েছিল?

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, ওসব কিছু না। কে যেন ধাক্কা মেরেছিল।'

ট্রেন থামলে দৌড়ে এল একজন কনডাকটর। কিভাবে পড়ে গিয়েছিল সেটা জানিয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে ট্রেনটাকে আটকাতে অনুরোধ করল তাকে কিশোর।

'লোকটাকে ধরা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতাম,' বলল সে।

রাজী হলো কনডাকটার। যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে অনুরোধের সুরে বলল, 'পাঁচ মিনিট থাকব এখানে। দয়া করে প্ল্যাটফর্মেই থাকুন আপনারা।'

ওদেরকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ধাক্কা দিয়ে সরে যেতে কিংবা দৌড়ে পালাতে কাউকে দেখেছে কিনা। কিন্তু কেউ দেখেনি। চিৎকারটা রাস্তার দিকে নজর ঘুরিয়ে দিয়েছিল সবারই, আর কোনদিকে তাকানোর কথা মনে হয়নি কারও।

'নাহ্, এ ভাবে হবে না,' কিশোর বলল। 'ধাক্কা দিয়েই কেটে পড়েছে।'
ট্রেনে চড়ল তিনজনে। সীটে বসে মুসা বলল, 'ধাক্কা দিয়েছে যে লোকটা, তার সঙ্গে চিৎকার করেছে যে তার কোন সম্পর্ক নেই তো?'
'আছে,' কিশোর বলল, 'প্ল্যান করেই করেছে এ কাজ। একজন চিৎকার করে লোকের নজর অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে ধাক্কা মেরেছে আরেকজন।'
'খাইছে!' গাল ফুলিয়ে শিস দিল মুসা। 'সাংঘাতিক লোক ওরা। খুন করতেও দ্বিধা নেই।'
'সাবধান থাকতে হবে,' রবিন বলল। 'কিশোরের অনুমানই ঠিক, ফ্রডের লোক পিছু নিয়েছে আমাদের।'
হাত নাড়ল মুসা। 'আপাতত ওদের আলোচনাটা বাদ দিয়ে এখন এসো, যাত্রাটাকে বরং উপভোগ করি।'
ব্যাগ থেকে ছোট একটা রেডিও বের করে সুইচ অন করল সে। ডায়াল ঘুরিয়ে একটা বিশেষ স্টেশনে সেট করল। বাজতে লাগল জোরাল রক মিউজিক।
শহর পেরিয়ে এল ট্রেন। দুই পাশে গ্রামাঞ্চল। তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে গাছপালা। বাড়িঘর কম।
সময় কাটতে লাগল। কখনও গান শুনে, কখনও আলোচনা করে, চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে।
এক সময় গতি কমে এল ট্রেনের। রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে চলেছে এখন। রামাপান কান্ট্রিতে প্রবেশ করেছে।
অবশেষে ল্যানটার্ন জংশনে এসে থেমে দাঁড়াল বিরাট ডিজেল ইঞ্জিনটা।
সবার আগে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। হোটেলের খোঁজখবর নিতে শুরু করল। কোন হোটেলে থাকলে ভাল হয়, খরচ কম, ইত্যাদি। আলোচনা করে বোঝা গেল, গ্র্যান্ড হোটেলে থাকলে সুবিধে হবে। কোথায় উঠবে ঠিক করার পর বাড়িতে একটা ফোন করল কিশোর। চাচী বলে দিয়েছেন, পৌঁছেই যেন খবর জানায়। চাচীকে জানাল কিশোর, ঠিকমতই পৌঁছেছে ওরা। গ্র্যান্ড হোটেলে উঠছে।
সাবধানে থাকতে বললেন চাচী। কিশোর বলল, থাকবে।
হোটেলে রওনা হলো ওরা।
এই পাহাড়ী অঞ্চলে যতটা হবে আশা করেছিল, তারচেয়ে ভাল হোটেলটা। ওদের ঘর দেখিয়ে দেয়া হলো। সাধারণ আসবাবে সজ্জিত। তবে রুচিসম্মত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কম দামের দুটো ঘর পাওয়া গেছে। একটাতে ডাবল বেড, আরেকটায় সিঙ্গেল। ঠিক হলো, ডাবলটাতে কিশোর আর রবিন থাকবে। অন্য ঘরটায় মুসা।
ঘরে ঢুকে ব্যাগ-সুটকেস খুলতে শুরু করল ওরা।
'উফ্, যা সুন্দর জায়গা!' ঘরে ঢুকে সুটকেস খুলতে খুলতে বলল মুসা। 'খাঁড়িগুলোতে নিশ্চয় প্রচুর মাছ। ভুল হয়ে গেছে। ছিপ আনা উচিত ছিল।'
'ছিপের সমস্যা হবে না,' রবিন বলল। 'দোকানপাট আছে। কিনে নেয়া যাবে।'
'চলো তাহলে, কিনে নিয়ে আসিগে ছিপ।'
'কিন্তু মাছ ধরতে তো আসিনি আমরা এখানে,' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

'যেটার জন্যে এসেছি, সেটা আগে করা দরকার।'
'সেটা কি?'
'চাবি চুরির তদন্ত। ফ্রেডকে ধরার চেষ্টা। আর গুপ্তধন খোঁজা।'
'ও!' হতাশ মনে হলো মুসাকে। 'তো, কোনটা দিয়ে শুরু করবে?'
'তিনটা একসঙ্গেই চলবে।'
বুঝতে না পেরে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।
'আগে রামাপানদের গাঁয়ে যাব,' কিশোর বলল। 'ওখানে গেলেই বুঝতে পারব, কি করব।'
আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ। 'চলো তাহলে।'
পার্বত্য অঞ্চলে ঠাণ্ডা বেশি। গরম কাপড়-চোপড় পরে বেরিয়ে এল ওরা। নিচে নেমে ডেস্ক ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল কিশোর, রামাপান কান্ট্রিতে কিভাবে যেতে হবে। বলে দিল ক্লার্ক। নির্জন অঞ্চল, গভীর বনের ভেতর দিয়ে গেছে পথ। রাস্তা খুব খারাপ। এ সময় না বেরিয়ে, আগামী দিন সকালে বেরোনোর পরামর্শ দিল।
কিন্তু হোটেলে বসে থাকতে মন চায়নি ওদের। আপত্তিতে কান না দিয়ে তাই বেরিয়ে পড়েছে। পথ চলতে গিয়ে এখন বার বার মনে হতে লাগল, দিলেই ভাল করত।
পথ সত্যি দুর্গম। ভীষণ সরু আর আঁকাবাঁকা। কোথাও কোথাও তো এতটাই সরু, আগে-পিছে থেকে এক সারিতে চলতে হলো। পোকা-মাকড়ের একটানা গুঞ্জন। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে জন্তু-জানোয়ারের চিৎকার কিংবা পাখির ডাক।
ছোট্ট এক টুকরো খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। দম নেয়ার জন্যে থামল। নাক দিয়ে বাতাস যে বেরোচ্ছে, দেখা যায়, ঠাণ্ডায় হালকা সাদা ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে।
ওপাশের বনে একটা ঝোপের মধ্যে খসখস শব্দ হলো।
থমকে দাঁড়াল তিনজনে। তাকিয়ে রইল।
পাতার ফাঁকে উঁকি দিল একটা মুখ। ডালপাতা সরিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল একজন মানুষ। ইনডিয়ান। ওদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।
তিনজনেই চুপ।
লোকটার পরনে হাতে সেলাই করা পাজামা। গায়ের কোটটা পুরানো, কুঁচকানো। লম্বা, কুচকুচে কালো চুল নেমে এসেছে কাঁধের ওপর।
নীরবতা ভাঙল লোকটা, কড়া টান মেশানো ইংরেজিতে বলল, 'ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের বন্ধু।'
'আপনি কি রামাপান?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।
প্রশ্নের জবাব দিল না লোকটা। বলল, 'তোমাদের সাবধান করে দিতে এলাম। বড় খারাপ জায়গায় ঢুকে পড়েছ তোমরা।'
'মানে?' জানতে চাইল রবিন।
'বিচ্ছিরি, অমিশুক একটা জাতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। ওরা বিপজ্জনক লোক।'
'বিপজ্জনক?' আপনমনে বলল কিশোর। 'আজকাল আবার কোন বিপজ্জনক

ইনডিয়ান আছে নাকি?'

'দেখো, যা বললাম বিশ্বাস করো,' রাগ ফুটে উঠল লোকটার কণ্ঠে। 'শ্বেতাঙ্গদের দুচোখে দেখতে পারে না ওরা। বাইরের লোকের যাতায়াতকে সন্দেহের চোখে দেখে।'

ওদেরকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না লোকটা। ঝটকা দিয়ে ঘুরে গটগট করে এগিয়ে গেল বনের দিকে। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

'লোকটা হয়তো ঠিকই বলেছে,' গলা কাঁপছে মুসার। 'মনে হচ্ছে ওর কথা শোনাই ভাল। চলে যাওয়া উচিত আমাদের।'

'কেন, তুমি না ওয়ালাপ্যাটুকুংক?' খোঁচা দিয়ে বলল রবিন। 'মুজ হরিণ তো এখনও চোখেও দেখা হলো না। না খেয়েই পালানোর চিন্তা?'

'নারে ভাই, আমার ভাল্লাগছে না...'

ওদের কথায় কান নেই কিশোরের। চিন্তিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল, 'কথায় বড় বেশি টান। আজকাল কোন ইনডিয়ানের কথায় এ রকম টান থাকে না। স্পষ্ট, পরিষ্কার ইংরেজি শিখে গেছে সবাই। লোকটা ভুয়া নয়তো?'

'তুমি বলতে চাইছ, চেহারা, পোশাক, কথা বলা, সব নকল?' বিশ্বাস করতে চাইছে না মুসা।

'হতে অসুবিধে কি? ইনডিয়ান সেজে এসেছে হয়তো আমাদের ভয় দেখিয়ে বিদেয় করার জন্যে।'

'তাতে কি লাভ তার?'

'ফ্রেডের দলের লোক হলে অনেক লাভ।'

রবিন বলল, 'লোকটার পিছু নিতে পারলে ভাল হত। কোথায় যায় দেখা যেত।'

লাফিয়ে উঠল মুসা, 'এখনও নেয়া যায়। এসো।'

নয়

বনে ঢুকে লোকটা যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটল তিন গোয়েন্দা।

'গেল কোথায়?' অনেকখানি এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।

'এই যে, পায়ের ছাপ,' মাটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল মুসা। 'ঠিক দিকেই যাচ্ছি। এসো।'

আগে আগে ছুটতে শুরু করল আবার সে। পেছনে কিশোর আর রবিন। সরু, পাথুরে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে নীরব, আবছা অন্ধকার বনের ভেতরে।

হঠাৎ ডানে তীক্ষ্ণ মোড় নিল পথটা। আগে আগে ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। হাত তুলল। পেছনে থমকে দাঁড়াল অন্য দুজন।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। কান খাড়া, চোখ বোলাচ্ছে রাস্তার ওপর, বনের দিকে; বোঝার চেষ্টা করছে কোনদিকে গেছে লোকটা। কিছুই দেখতে পেল না। অনুমান করল, পাথরে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেছে লোকটা, যাতে

পায়ের ছাপ না পড়ে, অনুসরণকারীদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে।

'আপাতত গেল, আর ধরা যাবে না,' কিশোর বলল। 'ওকে খুঁজে আর সময় নষ্ট না করে, যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকেই যাই। তবে তার আগে খেয়ে নেয়া দরকার।'

সঙ্গে করে আনা স্যান্ডউইচ খেতে বসল ওরা। খাওয়া সেরে পানি খেয়ে এল একটা পাহাড়ী ঝর্না থেকে।

আবার উঠে রওনা হলো। কিছুদূর এগিয়ে কান পেতে মুসা বলল, 'শুনতে পাচ্ছ!'

কিশোর আর রবিনও কান পাতল। নিয়মিত তালে শোনা যাচ্ছে ভোঁতা এক ধরনের শব্দ।

'টম-টম!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'খাইছে!' ঝট করে ওর দিকে ঘুরে গেল মুসা। ভঙ্গিতে অস্বস্তি। চোখে ভয়। 'কিশোর, লোকটা বোধহয় ঠিকই বলে গেল। আমাদের চলে যাওয়াই উচিত। হয়তো আমাদের ওপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ইনডিয়ানরা।'

'না-ও হতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'শত্রুকে আক্রমণ ছাড়া অন্য কারণেও টম-টম বাজায় ইনডিয়ানরা।'

'অত চিন্তা না করে কেন বাজাচ্ছে, দেখতে গেলেই তো পারি,' প্রস্তাব দিল রবিন। 'নিশ্চয় আজকাল আর নরবলি দেয় না ইনডিয়ানরা।'

এগিয়ে চলল তিনজনে। আরও সিকি মাইল পথ কোন রকম বাধা-বিপত্তি এল না। তারপর সামনে দিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে গেল একটা হরিণ। মনে হলো তাড়া খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। মুহূর্ত পরেই বোঝা গেল ওটার ছুটে পালানোর কারণ। পেছন পেছন বন থেকে বেরিয়ে এল ওদেরই বয়েসী এক ইনডিয়ান কিশোর। থমকে দাঁড়াল ওদের দেখে।

পরনে মোটামুটি ওদেরই মত পোশাক। গায়ের রঙ তামাটে। কালো কালো লম্বা চুল, প্রায় মেয়েদের মত।

'হালো,' আন্তরিক কণ্ঠে সম্বোধন জানাল ছেলেটা। 'এই গভীর বনে কি করছ তোমরা? পথ হারিয়েছ?'

কিশোর, মুসা বা রবিন, কেউ জবাব দিতে পারল না। কথা সরছে না মুখ দিয়ে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ছেলেটার পায়ের জুতোর দিকে। মোকাসিন। দুটোরই বুড়ো আঙুলের কাছটায় রঙিন সুতো দিয়ে লেখা 'আর'।

'না, পথ হারাইনি,' অবশেষে জবাব দিল কিশোর। 'রামাপান ভিলেজে যাচ্ছি।'

জুতোর দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো ছেলেটা। 'কি দেখছ?'

'এই জুতো পেলে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কেন, এখানেই। আমরাই বানাই।'

'তুমি রামাপান?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

আনন্দে ছেলেটার হাত চেপে ধরল রবিন। 'কি যে খুশি হলাম তোমাকে দেখে!

এই জুতো যারা বানায় তাদেরই খুঁজছি আমরা।'

'তাই নাকি?' হেসে বলল ছেলেটা। 'এসো আমার সঙ্গে, এ রকম জুতো আরও অনেক দেখাতে পারি তোমাদের।...আমার নাম জোরো বাফেলোস্টোন। আমার বাবা ইয়েলো বাফেলোস্টোন এ গাঁয়ের সর্দার।'

নিজেদের নাম বলল তিন গোয়েন্দা। তারপর জোরোর সঙ্গে রওনা হলো ওদের গাঁয়ে।

অস্বস্তি যাচ্ছে না মুসার। ফিসফিস করে রবিনের কানে কানে বলল, 'মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছু করবে না তো?'

ওদিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে কিশোর।

তার প্রশ্নের জবাবে জোরো বলল, 'না, অন্য ইনডিয়ানদের মত টিপিতে বাস করি না আমরা,' হাসল সে। 'মাথায় পালকের মুকুটও পরি না। যোদ্ধার পোশাকও না।'

'কিন্তু টম-টমের আওয়াজ শুনেছি আমরা,' সন্দেহ যাচ্ছে না মুসার।

'সব কিছুই তো আর বাদ দিয়ে দেয়া যায় না। টম-টম একটা বাদ্যযন্ত্র, ক্ষতিকর কিছু নয়। আমাদের একজন বাদক উৎসবের জন্যে প্র্যাকটিস করছে। বছরের এ সময়ে একটা বড় ধরনের উৎসব হয় আমাদের গাঁয়ে।'

কয়েক মিনিট আগে ইনডিয়ান সেজে আসা লোকটার কথা বলল কিশোর। চেনে কিনা জিজ্ঞেস করল জোরোকে।

বড় বড় হয়ে গেল জোরোর চোখ। 'আমাদের লোকেরা এখন আর ওসব পোশাক পরে না, অদ্ভুত টানে কথা বলে না, বুড়ো ডিক ভালচার বাদে। কিন্তু ভালচার তো লোক খারাপ না, বরং খুব ভাল।...লোকটা কি বলেছে তোমাদের?'

রামাপানদের ব্যাপারে লোকটা যে সতর্কবাণী করে গেছে, সেটা জানাল কিশোর।

'উঁহু, ভালচার নয়,' মাথা নাড়ল জোরো। 'ও তোমাদের ভয় দেখাতে যাবে না। বুঝতে পারছি না অপরিচিত একজন লোক তোমাদের এখানে আসা বন্ধ করতে চাইবে কেন?...বাবাকে বলা দরকার।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। রামাপানদের গাঁয়ে গিয়ে বিপদ ডেকে আনতে যাচ্ছে না তো ওদের জন্যেও?

সামনে হঠাৎ করে চওড়া হয়ে গেল পথ। তারপর খোলা জায়গা। জোরো জানাল, 'এসে গেছি।'

মূল রাস্তাটার দুই ধারে গড়ে উঠেছে রামাপানদের গ্রাম। বেশ কিছু গলি চলে গেছে রাস্তা থেকে এদিক ওদিক। কিছু দোকানপাট আছে মেইন রোডের ধারে। বাকি রাস্তাগুলোর ধারে বাড়িঘর। বেশির ভাগ বাড়ি সাদা রঙ করা। সবই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একধারে একটা লম্বা, নিচু ছাদওয়ালা বাড়ি, অনেকগুলো জানালা। অন্যপাশে একটা মাঠ। জোরো জানাল, ওই মাঠে মল্লযুদ্ধের খেলা হয়। বাড়িটাতে জরুরী আলোচনা সভা বসে।

পাল্লায় সবুজ রঙ করা একটা ছোট সাদা বাড়ির সামনে এসে জোরো বলল, 'এটা আমাদের বাড়ি।'

দরজা খুলে দিলেন লম্বা, সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন মানুষ। জোরোর সঙ্গে চেহারার অনেক মিল।

'বাবা,' জোরো বলল, 'এরা আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছে। এর নাম কিশোর। ও মুসা। আর ও রবিন।'

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলালেন সর্দার ইয়েলো বাফেলোস্টোন। মুখে আন্তরিক হাসি। 'এসো, ভেতরে এসো। খুশি হলাম তোমাদের দেখে। আমাদের এই গভীর বনে সচরাচর কেউ বেড়াতে আসে না।'

কেন এসেছে, জানাল কিশোর।

রামাপানদের তৈরি চামড়ার জিনিসে আগ্রহ আছে, এতদূর এসেছে ওরা ওসব জিনিস দেখতে, শুনে এত খুশি হলেন বাফেলোস্টোন, তক্ষুণি নিয়ে যেতে চাইলেন চামড়ার কারখানা দেখাতে।

তিন গোয়েন্দারও আপত্তি নেই।

বাফেলোস্টোন আর তাঁর ছেলের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কারখানার দিকে এগোনোর সময় গাঁয়ের পথে যে-ই সামনে পড়ল, মাথা নুইয়ে, হাসিমুখে সর্দারকে সালাম জানাল। নিচু ছাতওয়ালা লম্বা যে বাড়িটা দেখে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা, তার সামনে ওদের নিয়ে এলেন সর্দার। ভেতরে ঢুকলেন।

'এই আমাদের কারখানা,' গর্বের সঙ্গে বলল জোরো। ডান হাতটা লম্বা করে পুরো দুশো সত্তর ডিগ্রি ঘুরিয়ে আনল।

বিরাট ঘরের বিশাল ছাত ধরে রেখেছে অসংখ্য থাম। মাঝের ফাঁকা জায়গাগুলোতে বসে কাজ করছে কারিগরেরা।

ওদের পাশ দিয়ে এগোতে এগোতে সর্দার বুঝিয়ে দিলেন, কোনখানে-কোন কাজ হয়।

বুড়ো এক কারিগরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থামলেন তিনি। 'ওর নাম মুজো। মোকাসিন বানাচ্ছে।'

তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। সাদা একটা কাঠের ছাঁচের ওপর চামড়ার ফালি পরাচ্ছে মুজো। ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে যাচ্ছে জুতোর অবয়ব।

অন্য একখানে নিয়ে এসে সর্দার বললেন, 'এখানে চাবির কেস তৈরি হচ্ছে।'

নিপুণ ভঙ্গিতে চামড়ার ফালিতে সুচ চালিয়ে চলেছে দক্ষ কারিগরেরা।

যে কেসটার জন্যে এত কাণ্ড করেছে ফ্রড, সেটা বের করল কিশোর; পকেটে করে নিয়ে এসেছিল। বাফেলোস্টোনকে দেখাল। 'এটা কি আপনাদের এখানে তৈরি?'

কেসটা হাতে নিয়ে দেখলেন সর্দার। 'হ্যাঁ, রামাপান জিনিসই, তবে অনেক পুরানো। কোথায় পেলে?'

কোথায় পেয়েছে, জানাল কিশোর।

কেসটা ফিরিয়ে দিলেন বাফেলোস্টোন।

আপাতত কেসের ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না কিশোর। পকেটে রেখে দিল।

কারখানা দেখানো শেষ করে ওদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাফেলোস্টোন।

তারপর আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন, 'শুধুই কি চামড়ার কারখানা দেখতে এসেছ তোমরা? নাকি আর কোন উদ্দেশ্য আছে?'

গোপন রাখলে তদন্ত করতে পারবে না। কিন্তু কিভাবে নেবেন বাফেলোস্টোন, কে জানে। একবারে সব না বলে ধীরে ধীরে জানানোর সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল।

আগ্রহের সঙ্গে কার্ডটা নিলেন সর্দার। পড়ে মাথা দোলালেন, 'হুঁ, তাহলে তোমরা গোয়েন্দা!' মুখ তুলে সরাসরি তাকালেন কিশোরের চোখের দিকে, 'এখানে কি তদন্ত করতে এসেছ?'

'ফ্রড নামে একটা চোরকে ধরতে এসেছি। একটু আগে যে কী-কেসটা দেখালাম, সেটা চুরি করতে গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। ওটা তার কেন দরকার, কেসটা দেখে বুঝতে পারিনি। ওটাতে রামাপানদের মনোগ্রাম দেখলাম। মনে হলো, সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে এখানে এলে।'

'কতখানি অগ্রগতি হলো তদন্তের?'

'কিছুই হয়নি এখনও। সবে তো এলাম।'

'ও।' আবার কার্ডটার দিকে তাকালেন বাফেলোস্টোন। কার্ডে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রশ্নবোধকগুলো কেন? নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোন ধরনের অনিশ্চয়তা?'

'মোটেও না। বরং উল্টোটা। নিজেদের কাজের ব্যাপারে অনেক বেশি নিশ্চিত আমরা। প্রশ্নবোধকগুলো দেয়ার কারণ, যে কোন রহস্যের তদন্ত করতে আগ্রহী। যে কোন ধরনের, ভূতুড়ে হলেও আপত্তি নেই। এমনকি গুপ্তধন উদ্ধার করে দিতেও রাজি। কোন রকম সূত্র যদি না থাকে, শুধু গুজব বা কিংবদন্তীর ওপর ভিত্তি করে তদন্ত করতেও পিছপা নই আমরা। এ রকম কাজ বহু করেছি, ব্যর্থ হইনি কখনও।'

গুপ্তধনের কথা বেশি বেশি করে বলল কিশোর, বাফেলোস্টোনের কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে।

একটা মুহূর্ত চুপ থেকে কি যেন ভাবলেন বাফেলোস্টোন। তারপর তিন গোয়েন্দাকে অবাক করে প্রস্তাব দিয়ে বসলেন, 'মনে মনে তোমাদের মত কাউকেই খুঁজছিলাম আমি। এসেছই যখন, আরেকটা রহস্য সমাধানের চেষ্টা করবে? রামাপানদের একটা পুরানো রহস্য?'

খুশিতে লাফাতে ইচ্ছে করল কিশোরের। এত তাড়াতাড়ি সুযোগ করে দেবেন রামাপানদের সর্দার নিজে, কল্পনাও করেনি সে।

দশ

'নিশ্চয় করব!' জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল না কিশোর।

'আর কিশোর পাশা যখন বলেছে,' হেসে বলল মুসা, 'ধরে নিতে পারেন রহস্যটার সমাধান হয়ে গেছে।'

ওদের আত্মবিশ্বাস দেখে হাসি ফুটল বাফেলোস্টোনের মুখে।

'কখন থেকে কাজ শুরু করব আমরা,' রবিনের প্রশ্ন। 'বেশি দেরি করা যাবে না। হপ্তাখানেকের মধ্যেই আমাদের স্কুল খুলে যাবে।'

'কোনখানে গিয়ে তদন্ত করতে হবে, সেটাও একটা কথা,' কিশোর বলল। 'বেশি দূরে হলে কিন্তু পারব না, যাওয়ার সময়ই পাব না।'

'দূরে যেতে হবে না,' বাফেলোস্টোন বললেন। 'এখান থেকেই শুরু করতে পারো। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করা আমাদের জন্যেও জরুরী। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যদি না পারো, তাহলে পুরো এক বছর আবার অপেক্ষা করতে হবে।'

গোয়েন্দাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন বাফেলোস্টোন। আগুনের সামনে আরাম করে বসে সব শোনাবেন।

ঘরটা ছোট। ইনডিয়ান আসবাবপত্র। একধারে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে।

'রামাপানরা অনেক পুরানো জাতি,' শুরু করলেন সর্দার। 'এক সময় এদিকের সমস্ত ইনডিয়ানদের নেতৃত্ব দিয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষরা। তারপর শ্বেতাঙ্গরা আসতে আরম্ভ করল। ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ছোট হয়ে যেতে লাগল আমাদের সীমানা। অসুস্থতা আর গোত্রে গোত্রে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে রইল, মরে সাফ হয়ে যেতে লাগল আমাদের লোকেরা। রামাপানদের ক্ষমতা কমে গিয়ে এমন অবস্থা হলো, উত্তরে সরে যেতে বাধ্য হলাম আমরা। এ সব কয়েক পুরুষ আগের ঘটনা।

'তারপর, এক সময় বন্ধ হলো যুদ্ধ। আধুনিক ওষুধ-পত্র আর চিকিৎসা-ব্যবস্থা আমাদের মৃত্যুহার কমিয়ে দিল। তবে যা খোয়ানোর খুইয়ে ফেলেছি ততদিনে। অতীতের স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না আমাদের।' চোখ দেখে মনে হলো, বহুদূর থেকে কথা বলছেন সর্দার, বাস্তবে নেই।

'সতর্ক হয়ে গেছে ততদিনে গোত্রের লোকেরা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ অনুভব করছে। মাছ ধরে আর জন্তু-জানোয়ারের চামড়া বিক্রি করে টাকা জমাতে শুরু করল। তারপর ঊনষাট বছর আগে গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা জরুরী আলোচনা সভায় বসল। আমার বাবা ছিল তখন গোত্রের সর্দার। সব্বাই মিলে ঠিক করল উত্তর থেকে সরে চলে আসবে আমাদের আদিম নিবাসে, অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষেরা যেখানে বাস করে গেছে এক সময়, সেই অঞ্চলে।' চেয়ারের হাতলে টোকা দিলেন তিনি, 'এটাই সে-জায়গা।'

মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছে গোয়েন্দারা এক চমকপ্রদ কাহিনী।

'আমার বাবা আর গোত্রের লোকেরা মিলে, ডুগান নামে এক লোকের কাছ থেকে এ জায়গাটা কিনেছিল,' বাফেলোস্টোন বললেন।

ডুগান! কান খাড়া করে ফেলল কিশোর। 'তার নাম কি হ্যান্সি ডুগান?'

'না,' মাথা নাড়লেন সর্দার, 'তার নাম ব্রিক ডুগান।...যা বলছিলাম, গাঁটের টাকায় কেনা নতুন বাড়িতে এসেও শান্তি আর নিরাপত্তা পেল না গোত্রের লোকেরা, যার আশায় তারা এসেছিল।'

'আবার কি ঘটল?' রবিনের প্রশ্ন।

লম্বা পাইপে আগুন ধরানোর জন্যে থামলেন সর্দার। ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে

ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'প্রতিবেশী একটা গোত্র হামলা চালাতে শুরু করল আমাদের ওপর। প্রতি রাতেই আসতে লাগল তারা। ঘরবাড়ি-জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে, ডাকাতি করে, আমাদের লোকদের আতঙ্কিত করে তুলল। তবে রামাপানরা প্রতিরোধ করতে শিখে গেছে ততদিনে।

'আমার বাবার ভয় ছিল, হামলাকারীরা আমাদের জমির দলিল চুরি করে নিয়ে যাবে। সেগুলোকে তখন মাটির নিচে পুঁতে ফেলল বাবা, সেই সঙ্গে একটা অনেক দামী রত্নখচিত ছোরা। পুরুষানুক্রমে ছোরাটার মালিক রামাপানরা। দুশো বছরেরও বেশি আগে ফরাসীদের সঙ্গে এক যুদ্ধে জিতে গিয়ে ছোরাটার মালিক হয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা।'

'কাগজপত্র আর ছোরাটা কোথায় পুঁতেছিলেন আপনার বাবা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নেড়ে সর্দার বললেন, 'সেটাই তো রহস্য। লুকানোর দিন কয়েকের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ল সে। আমরা বুঝে গেলাম, মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে তার।

'গোত্রের নিয়ম অনুযায়ী তার ছেলে হিসেবে সর্দার হলাম আমি। সবাই জানত কাগজপত্রসহ ছোরাটা আমার বাবা লুকিয়ে ফেলেছে। জায়গাটা সবার কাছ থেকেই গোপন রেখেছে বাবা। মৃত্যুর আগে তার কাছে জানতে চাইলাম, কোথায় রেখেছে।

'বাবা তখন পুরোপুরি নেতিয়ে পড়েছে। এর মধ্যেই বহু কষ্টে চোখ মেলে ফিসফিস করে বলল : কাগজগুলো···ছোরাটা··· শিকারি-চাঁদের আলো যেখানে ক্রসের মত ছায়ার সৃষ্টি করে, সেখানে পুঁতে রাখা হয়েছে। সেই ক্রসটা কোন জায়গায় আছে জিজ্ঞেস করলাম। জবাব দিতে পারল না বাবা।'

থামলেন বাফেলোস্টোন। অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরে।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

গুপ্তধনের সন্ধান করতে চেয়েছিল ওরা। এসে গেছে সুযোগ।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বাফেলোস্টোন বললেন, 'সূত্র বলতে শিকারি-চাঁদের ছায়া, ক্রসের মত, আর কিছু নেই। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সামান্য এই সূত্র দিয়ে আজ পর্যন্ত জিনিসগুলো খুঁজে বের করতে পারিনি আমি।'

'কাজটা খুব সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছেও,' কিশোর বলল।

'ইতিমধ্যে কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে গাঁয়ে,' সর্দার বললেন। 'কিছুদিন আগে দুজন অপরিচিত লোক এসে হাজির। তারা আমাদের জায়গাটা কিনতে চাইল। ভাল দাম দিতে রাজী। আমি বললাম, দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়েই এ জমি বেচব না আমরা। এটা আমাদের ঘর। বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে এ ঘর পেয়েছি আমরা। এ জমি বিক্রির জন্যে নয়।'

'কিন্তু দমল না ওরা,' বাবার মুখের কথা কেড়ে নিল জোরো। 'চাপাচাপি করতেই থাকল। যতই বলি বিক্রি করব না, ততই চাপাচাপি। রেগে গিয়ে তো শেষে চিৎকারই শুরু করে দিল একজন। বাবাকে ধমকাতে লাগল, দেখুন, সাবধান করে দিচ্ছি আপনাকে! যদি নিজেদের ভাল চান তো জায়গাটা বিক্রি করে দিন আমাদের কাছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন বাফেলোস্টোন। 'জিজ্ঞেস করলাম, কি বলতে চান?

লোকটা জবাব দিল, এ জায়গা আপনাদের নয়, কথাটা কি জানা আছে? হাসলাম। সে বলল, হাসির কিছু নেই এতে। আমরা প্রমাণ করে দিতে পারব, আপনারা অন্যায় ভাবে এ জমি ভোগ-দখল করছেন। আমাদের হুমকি-ধামকি দিয়ে গটমট করে বেরিয়ে চলে গেল দুজনে। এখন আমাদের ভয়, আমাদের আগেই দলিলগুলো খুঁজে বের করে ফেলবে ওরা। নষ্ট করে ফেলবে। মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার আর কোন উপায় থাকবে না আমাদের। যে রেজিস্ট্রি অফিসে সম্পত্তিটা রেজিস্ট্রি হয়েছিল, কয়েক বছর আগে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সে-অফিস। কাগজপত্র কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই। ওখান থেকে দলিলের নকল বের করারও আর কোন উপায় নেই।'

'তারমানে লোকগুলো আপনাদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে,' রবিন বলল।

'ভীষণ। রেজিস্ট্রি অফিস পুড়ে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বার বার পত্রিকায় জরুরী ঘোষণা দিয়েছে, যার যার দলিল নিয়ে এসে নতুন করে জায়গা রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে। কিন্তু দলিলটা আমাদের হাতে নেই, নিয়ে যেতে পারিনি।'

'হুঁ, ভাল বেকায়দায় ফেলেছে ওরা আপনাদের,' কিশোর বলল। 'ঠিক আছে, খুঁজে বের করবই দলিলগুলো, যে করেই হোক।'

'দলিল ছাড়া জায়গা দখলে রাখার আর কোন উপায় নেই?' জানতে চাইল মুসা। 'এত সহজেই কেড়ে নিয়ে যাবে অন্য লোকে? আমি তো জানতাম, জায়গা যার দখলে থাকে তার অধিকার বেশি।'

'কেউ যদি কোন জায়গা ষাট বছর দখল করে থাকতে পারে, সেই জায়গাটা তার হয়ে যায়, দলিল দেখানোর আর প্রয়োজন পড়ে না তখন। এটাই আইন,' সর্দার বললেন। 'কিন্তু আমাদের দখলের ষাট বছর পূর্ণ হতে কয়েক মাস বাকি আছে। এর মধ্যে কেউ যদি পুরানো দলিল জমা দিয়ে দেয়, এ জমি হাত ছাড়া হয়ে আবার সেটা পুরানো মালিকের মালিকানায় ফিরে যাবে। বড় দুশ্চিন্তায় আছি। কারও হাতে পড়েই গেল কিনা, কে জানে!'

'আমার মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'সৎ লোকের হাতে পড়লে আপনাদের দলিল আপনাদের ফিরিয়ে দিত। আর অসৎ লোকের হাত পড়লে এতদিনে গোলমাল শুরু করে দিত।'

'ওই দুজনের হাতে যদি পড়ে গিয়ে থাকে, যারা আমাদের হুমকি দিতে এসেছিল?'

'তাহলে ওরা এসে বিক্রির জন্যে চাপাচাপি করত না। দলিল গোপন করে সোজা চলে যেত রেজিস্ট্রি অফিসে, ক্লেম করতে।'

'দলিলটা নিশ্চয় ওরাও খুঁজছে,' রবিন বলল। 'তাহলে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে আমাদের। হাতে সময় নেই। এখনই কাজ শুরু করে দেয়া দরকার।'

'তোমাদের আগ্রহ দেখে খুশি হলাম,' হাসি ফুটল সর্দারের মুখে। 'খাওয়ার কথা ভুলে গেলে নাকি? আগে খেয়ে নাও। এক কাজ করো না কেন, তোমাদের মালপত্র সব নিয়ে এসোগে এখানে। শুধু শুধু হোটেলে ফেলে রাখার দরকার কি? থাকবে যখন এখানে, জিনিসপত্র তো লাগবে।'

'হ্যাঁ, লাগবে,' কিশোর বলল। 'নিয়েই আসব।'

জোরোর মায়ের রান্না করা হরিণের মাংস, গমের রুটি আর অ্যাপল পাই দিয়ে

যখন খাওয়া শেষ করল ওরা, বাইরে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

'আজ রাতে আর যেতে পারবে না,' জোরো বলল। 'জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। রাতটা কাটুক। সকালে উঠে জিনিসপত্র আনতে যেয়ো।'

জোরোর কথা মেনে নিল ওরা। ওর ঘরে ক্যাম্পখাটে শুয়ে রাত কাটাল।

পরদিন সকালে নাস্তার পর রবিন বলল, 'আমাদের এখন প্রথম কাজ, শহরে গিয়ে মালপত্রগুলো নিয়ে আসা।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'সবার যাওয়ার দরকার নেই। আমি যাচ্ছি। জিনিসপত্রও সব বোঝা বয়ে আনার দরকার নেই। দরকারী জিনিসগুলো শুধু নেব। ওগুলো একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে বাকি মালপত্র ক্লার্কের দায়িত্বে রেখে আসব।'

'যাও,' রবিন বলল। 'আমি আর মুসা এখানে ততক্ষণ সূত্র খুঁজে বেড়াই।'

'হ্যাঁ, তা-ই করো।'

কিশোর চলে গেলে, মুসা আর রবিনও বেরোল। গোত্রের কয়েকজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে। দুজন দুদিক দিয়ে গেল।

মেইন রোড ধরে রবিন চলে এল চামড়ার কারখানায়। বাড়িটার চারপাশ ঘিরে চক্কর দিয়ে আগে দেখে নিতে চাইল। তারপর ভেতরে গিয়ে কারিগরদের সঙ্গে কথা বলবে।

খুট করে একটা শব্দ হতে দাঁড়িয়ে গেল সে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরোতে দেখল একজন লোককে। কারিগরই হবে হয়তো। নইলে কারখানা থেকে আর কে বেরোবে? লোকটার ভাবভঙ্গি কেমন যেন লাগল তার। চট করে একটা গাছের আড়ালে সরে গেল।

হাঁটতে শুরু করল লোকটা। দ্রুত হেঁটে ঢুকে গেল বনের ভেতর।

নিঃশব্দে পিছু নিল রবিন।

থামল লোকটা।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখছে রবিন।

নখ দিয়ে একটা গাছের ছাল খোঁচাতে লাগল লোকটা। নির্বিকার ভঙ্গিতে শিস দিয়ে চলেছে। প্রস্রাব করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সিগারেট ধরাল তারপর। কয়েক টান দিয়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে নেভাল। ফিরে চলল কারখানায়।

কারখানায় 'নো স্মোকিং' বোর্ড টানানো আছে মনে পড়তে আনমনে হাসল রবিন। প্রস্রাব করতে এসেছিল লোকটা। সেই সঙ্গে বিড়ি টানাও শেষ করে গেল। আর সে ভেবেছিল না জানি কি!

গাঁয়ে ফিরে চলল রবিন। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। অদ্ভুত খসখস শব্দ কানে এসেছে।

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল সে। পা টিপে টিপে এগোল শব্দ লক্ষ্য করে। সামনে ছোট এক টুকরো ফাঁকা জায়গা। আরেকটু হলেই চিৎকারটা বেরিয়ে যাচ্ছিল ওর মুখ থেকে।

আগের দিন চামড়ার পোশাক পরা যে লোকটাকে দেখেছিল ওরা, সেই লোকটা।

এগিয়ে গেল রবিন। কি করছে লোকটা, জানতেই হবে।

লোকটার দিকে নজর। মাটিতে পড়ে থাকা ডালটা দেখতে পায়নি। পায়ের তলে পড়ে মট করে ভাঙল।

পরক্ষণে আরেকটা শব্দ হলো পেছনে। ঝট করে ফিরে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে।

আরেকজন লোককে দেখতে পেল। হাতে একটা লাঠি। বাড়ি মারার জন্যে তুলে ধরেছে।

মাথা সরানোর চেষ্টা করল রবিন। পারল না। ধাঁ করে নেমে এল লাঠিটা।

চিৎকার করারও সময় পেল না সে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এগারো

মিনিট পনেরো পর নড়ে উঠল রবিন। চোখ মেলল। চাঁদিতে তীব্র ব্যথা। গালে ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা অনুভূতি। মাটিতে ঠেকে আছে গাল।

অনেক কষ্টে জোর করে টেনে তুলল নিজেকে। কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে তাকাল চারপাশের গাছপালার দিকে। মনে পড়ল, কি ঘটেছিল। আপনাআপনি হাত চলে গেল মাথায়। গোল আলুর মত ফুলে উঠেছে জায়গাটা।

'গাঁয়ে ফেরা দরকার,' নিজেকে বোঝাল সে। 'লোকটার ব্যাপারে সর্দারকে সাবধান করে দিতে হবে।'

মাথার মধ্যে দপদপ করছে। উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে কয়েকটা অনিশ্চিত কদম ফেলল। খুব কষ্ট হচ্ছে। তবে গাঁয়ে এসে পৌঁছল অবশেষে।

সর্দারের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল রবিন। থেমে থেমে, দম নিতে নিতে।

পেছনে চিৎকার শোনা গেল, 'রবিন! কি হয়েছে তোমার?'

'জোরো! আহ্, বাঁচলাম!'

'কি হয়েছে তোমার?' কাছে এসে দাঁড়াল জোরো।

'মাথায় বাড়ি মেরেছে।'

'কে!'

'জানি না।'

রবিনের হাত ধরে বাড়ির দিকে নিয়ে চলল জোরো।

ওরা সিঁড়িতে সবে পা রেখেছে, এ সময় বেরিয়ে এলেন বাফেলোস্টোন। তাড়াতাড়ি এসে ধরলেন রবিনকে। দুজনে মিলে ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন রবিনকে। কাউচে বসিয়ে দিলেন।

গাঁয়ের ডাক্তারকে ডেকে আনল জোরো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, খুলি ফাটেনি। তবে বাড়িটা বেশ জোরেই লেগেছে। আগামী কয়েক ঘণ্টা ব্যথা থাকবে। ব্যান্ডেজ করে দিলেন। অবনতি ঘটলে অবশ্যই যেন তাঁকে খবর দেয়া হয় এ কথা বলে বিদায় নিলেন।

জোরে একটা নিঃশ্বাস বেরোল জোরোর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। 'যে ভাবে টলতে টলতে হেঁটে আসছিলে, আমি তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম।' স্বস্তির হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

কিন্তু বাফেলোস্টোনের মুখে হাসি নেই।

'ওই লোকটা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল!' পাইপটা শক্ত করে চেপে ধরলেন। কালো জিনিসের গায়ে অতিরিক্ত সাদা দেখাল তাঁর আঙুল। ছেলের দিকে তাকালেন, 'গাঁয়ে গিয়ে ভালমত খোঁজখবর করো তো। কে এতে জড়িত, বের করা দরকার। রবিন এখানে বিশ্রাম নিক।'

'আমাকে নিয়ে ভাববেন না, চীফ,' রবিন বলল, 'আমরা গোয়েন্দা। এ রকম অঘটন বহুবার ঘটেছে। এ সবের সঙ্গে আমরা পরিচিত।'

'যে লোকটা বাড়ি মেরেছে, তার চেহারা দেখেছ?' জোরো জানতে চাইল।

'দেখেছি। তবে এতই পলকের জন্যে, আবার দেখলে চিনতে পারব কিনা জানি না।'

একটা ছোট ছেলের মুখে খবর পেয়ে হুড়মুড় করে দৌড়ে এসে ঢুকল মুসা। 'রবিন! কি হয়েছে?'

*

দ্রুতপায়ে বুনো পথ ধরে হেঁটে চলল কিশোর। কোন অঘটন ছাড়াই ল্যানটার্ন জংশনে পৌঁছল। গ্র্যান্ড হোটেলে ঢুকে ক্লার্ককে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি।'

'এত তাড়াতাড়ি? বাড়ি ফিরছ নাকি?'

'না। রামাপানদের সঙ্গে থাকতে যাচ্ছি। যদি আমাদের কোন চিঠি বা ফোন আসে, দয়া করে মেসেজটা রামাপান ভিলেজে পাঠিয়ে দেবেন, চীফ বাফেলোস্টোনের ঠিকানায়। যা খরচ দিতে বলেন দেব।'

'ঠিক আছে।'

হোটেলের বিল শোধ করে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সুটকেস থেকে বের করে নিয়ে ছোট ব্যাগে ভরল। রবিন আর মুসার জিনিসও নিল। সুটকেসগুলো এনে রাখল ক্লার্কের দায়িত্বে। এ সময় মনে হলো, মেরিচাচীকে একটা ফোন করলে মন্দ হয় না।

খুশি হলেন চাচী। 'কিশোর! কেমন আছিস?'

'ভাল। আমরা ভাল আছি, এটা জানানোর জন্যেই করলাম।'

'খুব ভাল করেছিস। কিশোর, শোন্, আমাদের বাড়িতে আবার চোর ঢুকেছিল।'

রিসিভারটা কানের সঙ্গে চেপে ধরল কিশোর, 'কিছু নিয়েছে!'

'বুঝতে পারছি না। চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে জানিয়েছি। তিনি এসেছিলেন। তদন্ত করছে পুলিশ।'

'ও। ঠিক আছে, পরে আবার করব। কিছু নিল কিনা জেনে নেব তখন। আমার মনে হয়, কী-কেসটার জন্যেই আবার গেছে। আচ্ছা, রাখি।'

'আচ্ছা। সাবধানে থাকিস।'

'থাকব।'

ডেস্ক ক্লার্ককে শুভেচ্ছা জানিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। কিছুদূর এগিয়ে মোড় নিয়ে রামাপান ভিলেজের পথ ধরল।

বুনোপথে বেশ কিছুটা এগোনোর পর দেখল, একটা পরিচিত মূর্তি ছুটে আসছে।

মুসা! ও এ ভাবে দৌড়ে আসছে কেন? হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল কিশোর। তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল ওর সামনে।

'পুরোটা রাস্তাই দৌড়ে এলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'রবিনকে কে জানি মাথায় বাড়ি মেরে মরার জন্যে ফেলে রেখে গিয়েছিল।'

'বাড়ি মেরেছে!'

একটা গাছের শেকড়ে বসে পড়ল কিশোর।

মুসাও বসল। দম নিতে নিতে সব কথা খুলে বলল। সবশেষে বলল, 'গাঁয়ের ডাক্তার দেখে গিয়েছেন। এখন ভালই আছে সে। আমি পুলিশকে খবর দিতে এসেছি।'

'হুঁ।' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

উঠে দাঁড়াল মুসা। দম নেয়া হয়েছে। 'জোরো আর আমি রবিনের হামলাকারীকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।'

'পেয়েছ?'

'যে জায়গায় বাড়ি মেরেছে, সে-জায়গাটা খুঁজে বের করেছি আমরা। পায়ের ছাপ দেখে সেটা ধরে ধরে এগিয়ে গেলাম। কয়েক গজ গিয়ে শেষ।'

'আর কোন সূত্র পেয়েছ?'

হাসল মুসা। জ্যাকেটের পকেট থেকে কাপড়ে মোড়া একটা জিনিস বের করল।

'কি?' জানতে চাইল কিশোর।

কাপড়টা খুলল মুসা। 'অর্ধেকটা লাঠি। এটা দিয়েই বাড়ি মারা হয়েছে।'

'হুঁ। দেখি তো?'

ভালমত দেখল কিশোর। আস্ত লাঠির আধখানা। বাড়ি লেগে দু'টুকরো হয়ে গেছে। এই দিকটা দিয়েই বাড়ি মারা হয়েছে। বাড়ি লেগে ভেঙেছে। কত জোরে মারা হয়েছে, বোঝা যায় এ থেকে। ভাগ্য ভাল, বেঁচে গেছে রবিন।

'এটা নিয়ে তাহলে পুলিশের কাছে যাচ্ছিলে?' আনমনে প্রশ্ন করল কিশোর।

'হ্যাঁ। আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে।'

মুসার সঙ্গে কিশোরও চলল। ডেস্ক সার্জেন্টকে নিজেদের পরিচয় জানিয়ে চীফের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। চীফের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের।

'গোয়েন্দা?' উষ্ণ, আন্তরিক হাসি দেখা গেল চীফের ঠোঁটে। গোলগাল, বেঁটে মানুষ। 'আমার নাম ডিরেল। তোমরা যে গোয়েন্দা তার কোন প্রমাণ আছে?'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড আর ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসাপত্রটা বের করে দিল কিশোর।

প্রশংসাপত্রটা পড়ে মাথা দোলালেন চীফ। ফিরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু এই বনের মধ্যে কি উদ্দেশ্যে আগমন? কোন রহস্য?'

সংক্ষেপে ওদের আসার কারণ জানাল কিশোর।

রবিনের কি ঘটেছে শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন ডিরেল। 'সূত্রটুত্র পেয়েছ কিছু?'

লাঠিটা দেখাল মুসা। কোথায় পেয়েছে, জানাল। 'আঙুলের ছাপ থাকতে পারে ভেবে নিয়ে এসেছি।'

'আছে কিনা জানতে সময় লাগবে না। একটু বসো।' লাঠিটা নিয়ে পেছনের একটা ঘরে চলে গেলেন তিনি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন। হাতে একটা বড় ম্যানিলা খাম। 'একটা কাজের কাজই করেছ, মুসা। একজন দাগী আসামীর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে লাঠিতে।'

চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দার মুখে।

'কার প্রিন্ট? লোকটা কে?' জানতে চাইল কিশোর।

ফোল্ডার খুলে কিছু কাগজপত্র বের করলেন চীফ। 'লোকটার নাম জারভিস। বয়েস চল্লিশ। ছেঁচড়া চোর। চুরির অপরাধে বছরখানেক জেল খেটে কয়েক মাস আগে ছাড়া পেয়েছে। এই শহরেই থাকে এখন।'

'জারভিস, না?' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ভাবছি, আমরা যাদের পেছনে লেগেছি, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তো এর?'

'তা বলতে পারব না। তবে জেলে এমন কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে হয়তো ওর, যে ওর কানে কুমন্ত্রণা ঢুকিয়েছে।'

'কোথায় থাকে?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওর বাড়িওয়ালিকে ফোন করেছিলাম। মহিলা বলল, দুদিন ধরে নাকি তার দেখা নেই। কোথায় গেছে বলতে পারবে না। ধরার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছি। ধরা পড়লে ডেকে পাঠাব তোমাদের। রবিনকে নিয়ে এসো তখন এখানে, সনাক্ত করার জন্যে।'

'ঠিক আছে। যাই এখন।'

'আচ্ছা। সাবধানে থেকো।'

চীফকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দুজনে। হালকা লাঞ্চ খেয়ে নিল। ফিরে চলল ইনডিয়ানদের গাঁয়ে।

রবিনের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে কিশোর। তাকে সুস্থ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পরদিন মাথাব্যথাও কমে গেল ওর। ইনডিয়ানদের হারানো দলিল আর রত্নখচিত ছুরি নিয়ে আলোচনায় বসল তখন তিন গোয়েন্দা আর জোরো। জোরোর বাবা সর্দার বাফেলোস্টোন ব্যবসার কাজে গেছেন ল্যানটার্ন জংশনে।

'শিকারি-চাঁদের আলোয় ক্রুশের মত ছায়া পড়ে বলছে,' মুসা বলল। 'শিকারি-চাঁদটা কি জিনিস বোঝা যাচ্ছে। বছরের কোন একটা বিশেষ মাসের শিকারের উপযুক্ত জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় ক্রসের মত ছায়া পড়ে। কিন্তু ছায়াটা কিসের? কোন জিনিসের ওরকম ছায়া হয়?'

নিজের প্রশ্নের জবাবে নিজেই কয়েকটা সম্ভাবনার কথা বলল। রবিনও বলল। সবগুলোই বাতিল করে দিল জোরো। কারণ কোনটাই কিংবদন্তী বা গুজবের সঙ্গে

মেলে না।

'কথাটা কথিত আছে এ ভাবে,' জোরো বলল, 'খুব তাড়াতাড়ি চাঁদ ওঠার কালে তার শিকারিরা যখন আস্তানায় তখন বহু চক্ষুওয়ালা ড্যাগারটা আর ফ্যাকাসে লেখাওয়ালা কাগজগুলো পুঁতেছিলেন সর্দার।'

'শিকারির আস্তানা!' তুড়ি বাজাল কিশোর, 'বুঝে গেছি!'

বারো

'কি বুঝেছ!' সমস্বরে চিৎকার করে উঠল অন্য তিনজন।

'শিকারির আস্তানা,' বুঝিয়ে দিল কিশোর। 'টিপির কথা বলেছে। টিপির খুঁটির বেরিয়ে থাকা মাথা ক্রসের মত ছায়া তৈরি করতে পারে।'

'ঠিক! তাই তো!' চিৎকার করে উঠল জোরো। 'এ কথাটা ভাবলাম না কেন আমরা?'

'আর শিকারির চাঁদ ওঠে অক্টোবরে, তাই না?' মুসার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। অক্টোবরে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে অন্য সময়ের চেয়ে তাড়াতাড়ি। সূর্য ডোবার পর পরই। আলোও হয় বেশি।'

'এখন প্রথম কাজ হলো,' কিশোর বলল, 'সর্দারের টিপিটা কোথায় খুঁজে বের করা। কোনখানে আছে, কিছু অনুমান করতে পারো?'

'গাঁয়ের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো যেখানে হত,' জবাব দিল জোরো। 'রেকর্ডে বলে উৎসবের পাথরটা রয়েছে একটা ঝর্নার পাশে, ঝর্নাটা যেখানে সাপের জিভের মত দুই ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে যোদ্ধাদের সম্মানিত জায়গাটাকে চিরে দিয়ে।'

'মানে কি এর?' ভুরু নাচাল মুসা।

'বহুকাল আগে, যুদ্ধ জয় করে যোদ্ধারা ফিরে এলে তাদের সম্মানে সারাদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া আর...'

বাধা দিল মুসা, 'খাওয়া-দাওয়া? কি খেত? নিশ্চয় আস্ত মুজ হরিণের রোস্ট?'

জোরো মুসার কথার জবাব দেয়ার আগেই উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'চলো, যাওয়া যাক।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল জোরো। অনেক দিন আগে উৎসব হত ওখানে। জোরো জানাল, তার জীবদ্দশায় ওখানে কখনও উৎসব হতে দেখেনি সে।

'বাপরে! যে ঘন জঙ্গল,' রবিন বলল। 'এর মধ্যে পাথরটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে।'

এখনও দুর্বল রয়েছে সে। সঙ্গে যাবার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু জোর করে তাকে ওখানে বসিয়ে রেখে গেল কিশোর। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বলল, যাতে শত্রুদের কেউ দেখে না ফেলে। নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে একটা মরা গাছের ওপর বসে পড়ল রবিন। গাছটা আড়াআড়িভাবে পড়েছে একটা শুকনো নালার ওপর। এক সময় ঝর্না থেকে বেরিয়েছিল নালাটা, সাপের জিভের মত ভাগ হয়ে।

দশ মিনিট পর কোন কিছু না পেয়ে ফিরে এল অন্য তিনজন। বেদী বানানোর মত কোন চ্যাপ্টা পাথরের সন্ধান পায়নি ওরা।

'নাহ্, পাব না,' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'এতজনে এতভাবে খুঁজেও যা পেল না, আমরা কি আর পাব নাকি?'

তার কাছ থেকে খানিক দূরে বসে পড়ল কিশোর। তাকিয়ে রইল মূল ঝর্নাটার দিকে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওই যে, ওই যে ওটা!'

দৌড়ে গেল উঁচু হয়ে থাকা একটা ঢিপির দিকে। শ্যাওলায় ঢেকে আছে। আগের বার এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়েনি। উত্তেজিত হয়ে কিছুক্ষণ খোঁড়াখুঁড়ি আর চেঁছে চেঁছে শ্যাওলা ও বহুকালের জমা আবর্জনা সরানোর পর বেরিয়ে পড়ল চ্যাপ্টা একটা বিশাল পাথর।

'এখন বের করতে হবে সর্দারের টিপিটা,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রবিন।

'ওটা আর পাওয়া যাবে না,' একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল মুসা। 'এদিকে কোথাও থাকলে তো দেখাই যেত। এত বছরে কি আর আস্ত আছে সর্দারের টিপি...'

'সর্দারের টিপি খুঁজছ?' পেছন থেকে শোনা গেল একটা কণ্ঠ।

চমকে গেল মুসা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল কে কথা বলে দেখার জন্যে। চামড়ার শার্ট পরা বুড়ো এক ইনডিয়ান দাঁড়িয়ে আছে।

'আরে, ভালচার!' জোরো বলল।

গাঁয়ে ওকে দেখেছে তিন গোয়েন্দা। অন্য রামাপানদের মত আধুনিক পোশাক পরে না, পুরানো খাঁটি ইনডিয়ান পোশাক পরে। গাঁয়ের সবচেয়ে পুরানো লোক।

'পুরানো আমলের কত গল্প শোনায় আমাদের ডিক,' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল জোরো।

'তাই,' বলে বুড়ো ভালচারের দিকে তাকাল কিশোর। 'পুরানো সর্দারের টিপিটা কোনখানে ছিল জানা দরকার। খুঁজে বের করতে সাহায্য করবেন আমাদের?'

'আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে,' বুড়ো ভালচার বলল। 'বহু চাঁদ পার হয়ে এসেছি তো। তবু মহান যোদ্ধা সাহসী সর্দারের টিপিটার কথা ভুলিনি।'

বলেই পায়চারি করার মত হাঁটতে শুরু করল সে। একবার এগিয়ে যায়, আবার পিছিয়ে আসে, আর আপনমনে বিড়বিড় করে। অবশেষে উৎসবের পাথরটার কাছ থেকে দুশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে গেল।

'এখানে,' কারও দিকে না তাকিয়ে বলল সে। 'এখানেই ছিল সর্দারের টিপি।'

'ছিল! এখন নেই?' হতাশ কণ্ঠে বলল জোরো।

'এতকাল কি আর থাকে। তবে ওটার মত আরেকটা বানানো যেতে পারে। কিন্তু ওই টিপির কি দরকার হলো তোমার?' জোরোর দিকে সন্দিহান চোখে তাকাল সে।

জোরো যখন জানাল, তিন গোয়েন্দা রামাপানদের জায়গার দলিল আর মূল্যবান ছুরিটা উদ্ধার করতে চায়, উজ্জ্বল হয়ে উঠল বুড়ো ভালচারের মুখ।

'বেশ, আমি সাহায্য করব তোমাদের,' বলল সে। 'পনেরো ফুট লম্বা খুঁটি দিয়ে

টিপি তৈরি করতে হবে। আজ রাতে চাঁদ উঠলে আসব আমি।' আর কোন কথা না বলে ঘুরে গাঁয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

'রামাপান টিপি কি করে বানাতে হয়?' জোরোকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এসো লেগে পড়ি,' জোরো বলল। 'এমনি বলার চেয়ে কাজ করতে করতে দেখাব কি করে বানাতে হয়। সেটা ভাল হবে না?'

প্রথমে ছয়টা সোজা দেখে চারাগাছ কাটল ওরা। গোড়া থেকে পনেরো ফুট ওপরে মাথা ছেঁটে ফেলল। সবগুলোকে এক করে মাথার কাছে তিন ফুট নিচে শক্ত করে বাঁধল। তারপর খাড়া করে তুলে ধরে প্রত্যেকটা গাছকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে ছড়িয়ে দিয়ে গোড়াগুলো মাটিতে পুঁতল।

এর পরের কাজ হলো সরু, শক্ত শক্ত ডাল কেটে, ছোট ছোট করে খুঁটিগুলোর সঙ্গে বেঁধে কাঠামো তৈরি করা। তার ওপর বিছাল বার্চ আর হেমলকের বাকল। লতা দিয়ে বেঁধে আটকে দিল সেগুলো। শুকিয়ে বেঁকে যেতে পারে, তাই বাকলের ওপরও সরু ডাল চেপে বসিয়ে কষে বাঁধল লতা দিয়ে।

সবশেষে ভেতরে ঢোকার জন্যে একটা ফোকর বানাল। আর ওপরের দিকে করল একটা ছিদ্র, ধোঁয়া বেরোনোর জন্যে।

পিছিয়ে এসে গর্বিত চোখে দেখতে লাগল নিজেদের হাতের কাজ। অনেকটা ক্রসের মতই হয়েছে দেখতে। নিচের অংশটা শাঙ্কব আকারে দাঁড়িয়ে আছে, ওপর দিকে বেরিয়ে থাকা খুঁটির মাথাগুলো একটা জায়গা থেকে ছড়িয়ে আছে ছয়দিকে। জ্যোৎস্নায় পুরো টিপিটার ছায়া যখন পড়বে মাটিতে, দেখতে অনেকটা ক্রসের মতই হবে, তবে নিচের অংশটা ওপরের অংশের চেয়ে অনেক বড়।

মুসা বলল, 'দারুণ হয়েছে। এখন ওই চাঁদটা কেবল বেরোনোর অপেক্ষা। তোমার পূর্বপুরুষের লুকানো দলিলটা সহজেই খুঁজে বের করে ফেলব, জোরো।'

'আমাদের ওপর নজর রেখে থাকলে কারও না কারও চোখে পড়ে যাবে এটা,' কিশোর বলল। 'আজ রাতে এসে পাহারা দেব আমরা। চোরগুলো আসে কিনা দেখব।'

'আমার আপত্তি নেই,' জোরো বলল।

মুসা আর রবিনও রাজী।

সূর্য ডোবার সামান্য আগে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা, জোরো, আর তার বাবা সর্দার বাফেলোস্টোন। চলে এল নতুন বানানো টিপির কাছে। বুড়ো ভালচার আগেই এসে বসে আছে।

ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল পশ্চিমের পাহাড়ের মাথায়। হারিয়ে গেল ওপারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিগন্তে দেখা দিল চাঁদ। কয়েক টুকরো মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে লাগল। শঙ্কিত চোখে মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। তবে ওদের আশঙ্কা দূর করে দিয়ে সহসাই সরে গেল মেঘ।

হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে চিৎকার করে উঠল রবিন, 'ওই দেখো, বিচিত্র ছায়া! ক্রসের মতই!'

সত্যিই। টিপিটা লম্বাটে, অদ্ভুত ছায়া সৃষ্টি করেছে চন্দ্রালোকিত ভূমিতে।

'এসো, খুঁড়ে ফেলা যাক!' তর সইছে না জোরোর। সঙ্গে করে খোঁড়ার

যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে।

ছায়াটা যেখানে পড়েছে সেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করল সবাই মিলে।

সবাই উত্তেজিত। সবাই একটা কথাই ভাবছে। সত্যি পাবে তো রত্নখচিত ছোরাটা? দলিলগুলো?

দ্রুত গর্তের চারপাশে মাটি জমা হয়ে পাড়ের সৃষ্টি করল। ক্রমেই বড় আর গভীর হচ্ছে গর্ত।

অনেকক্ষণ খুঁড়ে বেলচায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর।

মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল জোরো। 'ভীষণ গরম লাগছে।'

থার্মোমিটার দেখলে দেখা যাবে তাপমাত্রা অনেক নিচে, শীত লাগার কথা। কিন্তু এত পরিশ্রম করেছে, গা গরম হয়ে গেছে। গরম লাগছে।

মুসা বলল তারও গরম লাগছে। 'কিন্তু আর কত খুঁড়ব? কুয়া বানিয়ে ফেলেছি তো। একটা জিনিস খেয়াল করেছ, যতই নিচে যাচ্ছি, ক্রমেই শক্ত হচ্ছে মাটি।'

'পাহাড়ী এলাকা,' বাফেলোস্টোন বললেন, 'মাটি তো শক্ত হবেই। নিচের দিকে পাথরও বেশি।'

খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে কাজে লেগে পড়ল ওরা। শিকারি-চাঁদের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হচ্ছে আরও। ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে বুড়ো ভালচার, চারদিকে কড়া নজর।

সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারল না রবিন। ক্লান্ত হয়ে পড়ল। খোঁড়া বাদ দিয়ে এসে দাঁড়াল টিপির ছায়ায়। বুড়ো ভালচারের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও নজর রাখতে লাগল চারদিকে। গোপনে কেউ এলে যাতে চোখ এড়িয়ে না যায়।

হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল সে। কান খাড়া করে ফেলল। মাটিতে কোপ পড়ার শব্দ ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ কানে এসেছে তার।

আবার শোনা গেল শব্দটা।

বনের মধ্যে শুকনো ডাল মাড়াল যেন কেউ। দেখা দরকার।

যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে, নিঃশব্দে সেদিকের বনে ঢুকে পড়ল সে। গাছের নিচে, ঝোপের মধ্যে জ্যোৎস্না পুরোপুরি ঢুকতে পারছে না যেখানে, সে-সব জায়গায় আবছা অন্ধকার। সামনে গাছপালার মধ্যে একজন মানুষ নড়ছে মনে হলো।

ছায়ামূর্তিটাকে অনুসরণের চেষ্টা করল সে। একবার বেরোয়, আবার আড়ালে চলে যায় মূর্তিটা, টেনে নিয়ে চলল যেন রবিনকে। শেষে একেবারে হারিয়ে গেল, আর বেরোল না।

কে লোকটা? ভাবতে ভাবতে আগের জায়গায় ফিরে এল সে, যেখানে মাটি খোঁড়া হচ্ছে।

'কিছু পাওয়া গেল?' জিজ্ঞেস করল সে।

বেলচাটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গর্ত থেকে উঠে এলেন বাফেলোস্টোন।

কিশোর আর মুসাও উঠে এল একে একে।

'কিছুই নেই?' আবার প্রশ্ন করল রবিন।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এখানে আর খুঁড়ে লাভ নেই। কিছু আছে বলে মনে হয় না। হয় ভুল জায়গায় টিপিটা বানিয়েছি, নয়তো ভুল সময়ে ভুল ছায়ার মধ্যে

খোঁজাখুঁজি করছি।'

সবার মুখেই হতাশা, চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছে সবাই।

'বাড়ি গিয়ে ভালমত একটা ঘুম দেয়া দরকার এখন,' রবিন বলল। 'সকালে উঠে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বের করতে হবে হিসেবে কোন্‌খানে ভুল হয়েছিল আমাদের।'

'ঠিক,' একমত হলেন বাফেলোস্টৌন। 'চলো। গরম গরম কিছু খেয়ে নিয়ে সোজা বিছানায় চলে যাব। আজ রাতে আর কিছু করার দরকার নেই।'

শাবল-বেলচাগুলো ভাগাভাগি করে তুলে নিয়ে ফিরে চলল সবাই। যেতে যেতে বনের মধ্যের ঘটনাটার কথা জানাল রবিন। তার সন্দেহের কথাও বলল। তার সন্দেহ, ছায়ামূর্তিটা চোরের দলেরই কেউ হবে, তাদের ওপর গোপনে নজর রাখতে এসেছিল।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'তাহলে তো আর ঘরে যাওয়া চলে না। বরং টিপিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকা দরকার। কে আসে দেখতে হবে।'

প্রবল আপত্তি তুললেন বাফেলোস্টৌন আর জোরো। কিন্তু সিদ্ধান্তে অটল রইল কিশোর।

চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। 'দেখো, মেঘ করছে। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল না।'

'তাড়াতাড়ি লাকড়ির ব্যবস্থা করা দরকার,' রবিন বলল। 'বৃষ্টি হলে ঠাণ্ডা বাড়বে। আগুন ছাড়া হবে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তুমি জোরোর সঙ্গে চলে যাও। তোমার শরীর ভাল না, থাকার দরকার নেই। মুসা, তুমিও যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো কয়েকটা কম্বল নিয়ে চলে এসো। আমি আছি এখানে।'

'আমি আসব মুসার সঙ্গে?' জানতে চাইল জোরো।

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর, 'না। তুমি আসবে না। বলা যায় না, আমাদের কিছু ঘটতে পারে। তুমি আর রবিন মুক্ত থাকলে আমাদের সাহায্যে লাগতে পারবে, পরে। একসঙ্গে থেকে সবার বিপদে পড়ার কোন মানে হয় না।'

আর তর্ক করল না জোরো।

কিশোর রয়ে গেল, বাকি সবাই দ্রুত হেঁটে চলল গাঁয়ের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে কম্বল নিয়ে ফিরে এল মুসা।

পাইনের শুকনো ডালপালা জোগাড় করে ফেলেছে ইতিমধ্যে কিশোর। আগুন জ্বালতে অসুবিধে হলো না। টিপির বাকলের তৈরি দরজাটা লাগিয়ে দিতে দিতে মুসা বলল কিশোরকে, 'তুমি আগে ঘুমিয়ে নাও। আমি পাহারা দিচ্ছি।'

কয়েক সেকেন্ডেই ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর। শোনা যেতে লাগল তার নিয়মিত নিঃশ্বাসের শব্দ। কম্বলে ভাল করে দেহ মুড়ে নিয়ে দরজার কাছে পাহারায় বসল মুসা। তুষার পড়া শুরু হলো। এত তাড়াতাড়ি সাধারণত তুষারপাত হয় না এখানে। এবার একটু আগেভাগেই পড়া শুরু করেছে।

দুই ঘণ্টা পর কিশোরকে জাগিয়ে দিল সে।

'বাইরের কি অবস্থা?' জানতে চাইল কিশোর।

'তুষার পড়ছে। একটা ছায়াকেও নড়তে দেখিনি এতক্ষণে।'

পাহারায় বসল কিশোর। তুষারপাত থেমে গিয়ে মিহি বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। তবে তার পাহারার সময় শেষ হতে হতে তুষারপাত আর বৃষ্টি কোনটাই রইল না আর।

সময় শেষ হলে মুসাকে আবার জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'সাংঘাতিক ঠাণ্ডা।'

শেষ হলো রাত। অনেক নেমে গেছে তাপমাত্রা। ভোরের আলো ফুটল। গাছপালা আর মাটিতে বরফের পাতলা আস্তর পড়ে গেছে।

খসখস শব্দ হলো। বাকলের দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল জোরো।

'গুড মর্নিং। কেমন আছ তোমরা? রাতে কিছু ঘটেছিল?'

'কিচ্ছু না,' জবাব দিল কিশোর।

মুসা তাকিয়ে আছে একটা ঝোপের দিকে। একজন লোক বেরিয়ে এল সাবধানে। মুসাকে দেখেই ঘুরে দৌড়ে পালাতে চাইল লোকটা। কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে ততক্ষণে মুসা। ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল লোকটাকে। চমকে গেছে লোকটা। কি করবে বুঝে ওঠার আগেই ল্যাং মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল মুসা। কিশোর আর জোরোও পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। তিনজনে মিলে লোকটাকে চেপে ধরল মাটিতে।

'তোমার নাম জারভিস, তাই না?' মুসা বলল, 'রবিনকে বাড়ি মেরেছিলে।'

'হ্যাঁ, আমি জারভিস,' স্বীকার করল লোকটা। 'তবে তোমাদের কারও মাথায় বাড়ি মারিনি আমি।'

'মারোনি? কিন্তু তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে লাঠিটায়। কাল রাতে আমরা যখন খুঁড়ছিলাম, চুরি করে নিশ্চয় তুমিই দেখতে এসেছিলে।'

'না, আমি নই,' জোর প্রতিবাদ জানাল লোকটা। 'আমি নজর রাখিনি তোমাদের ওপর।'

'কিন্তু লাঠিটায় আঙুলের ছাপ তো তোমার ছিল?' আবার প্রশ্ন করল কিশোর।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লোকটার চেহারা। জবাব দিল না।

'চলো, থানায় যেতে হবে তোমাকে,' কিশোর বলল আবার।

'এক মিনিট!' মরিয়া হয়ে বলল লোকটা। 'তোমাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে পারি আমি।'

'চুক্তি আবার কিসের?' ভুরু নাচাল মুসা। 'থানায় যেতে হবে, ব্যস। যা বলার পুলিশকেই বোলো।'

'আমাকে ছেড়ে দিলে মূল্যবান তথ্য জানাব তোমাদের।'

চট করে মুসার দিকে তাকাল একবার কিশোর। লোভনীয় প্রস্তাব। রহস্যের সমাধান করতে হলে তথ্যই এখন দরকার।

লোকটার দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বলবে তুমি আন্দাজ করতে পারছি। এই জমি যে কিনতে চায়, সে তোমাকে পাঠিয়েছে আমাদের খুন করার জন্যে। এই তো?'

'তুমি জানলে কি করে?' জারভিস অবাক। সে আর কিছু বলার আগেই পেছনের ঝোপ থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'খবরদার! একটা কথাও বলবে না আর,

জারভিস!'

ফিরে তাকাল গোয়েন্দারা।

মুখোশ পরা তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত।

তেরো

জারভিসকে ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর আর মুসা। জোরোও দাঁড়াতে যাচ্ছিল, দৌড়ে এসে তার মুখ চেপে ধরল একজন মুখোশধারী, যাতে রামাপানদের যুদ্ধ-চিৎকার দিয়ে গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দিতে না পারে জোরো। অন্য দুজন ধরল দুই গোয়েন্দাকে। ছাড়া পাওয়ার জন্যে লড়াই শুরু করল ওরা।

কিন্তু এঁটে উঠতে পারল না।

'বাঁধো ওদের,' আদেশ দিল একজন। ভঙ্গিতে মনে হলো সে ওদের সর্দার।

বেঁধে ফেলা হলো দুই গোয়েন্দা আর জোরোকে। চোখ বেঁধে দেয়া হলো রুমাল দিয়ে।

'হয়েছে?' বলল আবার সর্দার। 'চলো যাই। কি করতে হবে মনে আছে তো?'

কঠিন হাতে মুসা আর কিশোরের কাঁধ চেপে ধরে ঠেলা মারল দুজন লোক।

'হাঁটো,' আদেশ দিল ওদের সর্দার।

চোখ বাঁধা থাকায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। হোঁচট খাচ্ছে বার বার। কিছুক্ষণ একসঙ্গে আসার পর জোরোকে নিয়ে ভাগ হয়ে গেল জারভিস। বোঝা গেল ওদের কথা থেকে।

কিশোরকে বলল মুসা, 'জোরোকে আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে।'

'চুপ! কোন কথা নয়!' ধমকে উঠল সর্দার।

'দাঁড়াও, আগে ধোলাই পর্বটা হয়ে যাক তোমাদের ওপর,' শাসিয়ে বলল আরেকজন, 'অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে আসার ইচ্ছে হবে না আর কোনদিন।'

'জিততে তোমরা পারবে না,' সর্দার বলল। 'খুব সহসাই চলে যেতে হচ্ছে ইনডিয়ানদের।'

'ধাপ্পা দিচ্ছেন, ওসব খুব বোঝা আছে আমাদের,' কিশোর বলল।

'ধাপ্পা, না? অপেক্ষা করো। দেখবে, কি ঘটে। শীঘ্রি হাত বদল হয়ে যাবে এই জমি, কোনভাবেই ঠেকাতে পারবে না।'

থামতে বলা হলো দুই গোয়েন্দাকে। এতক্ষণ শুধু হাত বাঁধা ছিল, এখন পা-ও বাঁধা হলো শক্ত করে। তারপর মাটিতে ওদের ফেলে রেখে চলে গেল লোকগুলো।

কতক্ষণ ধরে পড়ে থাকল দুজনে, বলতে পারবে না। অনেক চেষ্টা করেও হাতের বাঁধন খুলতে পারেনি। পেটে আগুন জ্বলছে। বহুক্ষণ কিছু খায়নি। খালি পেটে, ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে পড়ে থেকে কাহিল হয়ে পড়ল ওরা। যখন আর সহ্য করতে পারছে না, এই সময় কানে এল অনেক লোকের গলা। কথা বলতে বলতে এদিকেই আসছে।

রবিনের গলা চেনা গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েকজন গ্রামবাসীকে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। দ্রুত বাঁধন কেটে দেয়া হলো দুজনের। ঘোরের মধ্যে যেন উঠে বসে আরও অনেকের সঙ্গে বাফেলোস্টোনকে দেখতে পেল কিশোর।

কি হয়েছে দু'চার কথায় জানিয়ে আগে খাবার চাইল।

এখানে খাবার নেই। গাঁয়ে যেতে হবে। একজন লোককে খাবার আনতে পাঠিয়ে দিলেন সর্দার। দৌড়ে চলে গেল লোকটা। পেছনে মুসা আর কিশোরকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দলটা।

'কারা জোরোকে ধরে নিয়ে গেছে, কিছু অনুমান করতে পারো?' জিজ্ঞেস করলেন সর্দার।

'যারা আপনাদের জমি কেড়ে নিতে চাইছে, সম্ভবত তারাই,' জবাব দিল কিশোর।

শঙ্কিত হলেন সর্দার। 'জিম্মি হিসেবে নিয়ে যায়নি তো?'

'নিতে পারে।'

'দলিলগুলো খুঁজতে বলাই ভুল হয়েছিল আমার,' আফসোস করে বললেন সর্দার। 'পরিস্থিতি এতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, ভাবতে পারিনি, তাহলে বলতাম না। কোন্‌দিকে নিয়ে গেছে জোরোকে?'

কোনদিকে নিয়ে গেছে, অনুমানে জানাল কিশোর।

গাঁয়ে ফিরে জোরোকে খুঁজতে লোক পাঠালেন সর্দার। রবিন গেল ওদের সঙ্গে। রাতে ঘুমিয়ে অনেক সুস্থ বোধ করছে সে। কিশোর আর মুসার যাওয়ার মত অবস্থা নেই। ঘরে শুয়ে থাকতে বললেন ওদের বাফেলোস্টোন।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও জোরোর কোন হদিস পাওয়া গেল না। সেদিন গেল। রাতটা কাটল। পরদিন সকালে আবার ছেলেকে খুঁজতে বেরোতে তৈরি হলেন সর্দার।

'পুলিশকে জানানো দরকার,' কিশোর বলল।

মাথা ঝাঁকালেন বাফেলোস্টোন, 'ঠিক আছে, তোমরা ল্যানটার্ন জংশনে চলে যাও। আমরা এদিকে খুঁজতে থাকি।'

'সবার যাওয়ার দরকার নেই। আমি আর মুসা যাচ্ছি। রবিন আপনাদের সঙ্গে থাকুক।'

আর কথা না বাড়িয়ে মুসাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

অফিসেই পাওয়া গেল চীফ ডিরেলকে। সমস্ত ঘটনা জানানোর পর কিশোর বলল, 'জোরোকে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে জারভিস। কাল অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি। আপনি কি কোন সাহায্য করতে পারেন?'

চুলে আঙুল চালালেন চীফ। হঠাৎ তুড়ি বাজালেন, 'কেবিন! হ্যাঁ, মনে হয় ওখানেই নিয়ে গেছে জোরোকে। বনের মধ্যে একটা কেবিন ছিল জারভিসের, শিকারির কেবিন। বেচে দিয়েছে। তবে আমি শিওর, ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে ছেলেটাকে।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। মুসাকে বলল, 'চলো, এক্ষুণি গিয়ে খোঁজ লাগাই।'

চীফের দিকে তাকাল, 'কেবিনটা বনের মধ্যে কোনখানে আছে, স্যার?'

একটা কাগজে এঁকে দেখাতে গিয়ে কি মনে করে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন ডিরেল। 'চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।'

গাড়িতে করে চলল ওরা। মাইল দুয়েক যাওয়ার পর ঘন বনের ধারে গাড়ি রাখলেন চীফ। গোয়েন্দাদের নিয়ে এগোলেন ঘন ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছে ভরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

মিনিট বিশেক চলার পর দাঁড়িয়ে গেলেন। হাত তুলে দুই গোয়েন্দাকে থামার ইঙ্গিত দিলেন।

'ওই গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে,' চাপাস্বরে বললেন তিনি।

খুব সাবধানে, পা টিপে টিপে, নিঃশব্দে কেবিনটার দিকে এগিয়ে চলল তিনজনে। মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

কেবিনটা চোখে পড়ল। একটা জানালার নিচে গিয়ে বসে পড়ল মুসা। আস্তে মাথা তুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে ফিরে তাকাল। হাত নেড়ে অন্য দুজনকে এগোতে ইশারা করল।

অন্ধকার ঘরটাতে প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না।

ধীরে ধীরে চোখে আলো সয়ে এলে দেখা গেল, ওপাশের বেড়ার কাছে কুঁকড়ে রয়েছে হাত-পা বাঁধা জোরো।

চোদ্দ

জোরোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে জারভিস। হাতে চাবুক।

'জলদি বলো!' গর্জে উঠল সে। 'না বললে আরও চাবুক আছে কপালে!'

'যতই মারো,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল জোরো, 'চাবকে ছাল তুলে ফেলো, মুখ থেকে কথা আদায় করতে পারবে না আমার।'

'গুপ্তধনগুলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জারভিস। বলেই শপাং করে বাড়ি মারল জোরোর হাতে। ব্যথাটা নীরবে হজম করল জোরো। টুঁ শব্দ করল না। 'বল্, জলদি! তুইও জানিস, তোর বাপও জানে। নিজেরা একলা মেরে দেয়ার জন্যে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিস–কেউ জানে না ওগুলোর খবর। কিন্তু আমাকে বোকা বানাতে পারবি না।'

দুই গোয়েন্দাকে ইশারা করলেন ডিরেল। চাপাস্বরে বললেন, 'কেবিনটা ঘিরে ফেলো।'

দরজা আর জানালার কাছে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল মুসা আর কিশোর, যাতে পালাতে গেলে বাধা দিতে পারে জারভিসকে।

দরজার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডিরেল। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।

ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল জারভিস। সহজে

তাকে ধরতে পারলেন না ডিরেল। তাঁর দিকে চাবুক চালাল জারভিস। লাগাতে পারল না। ঝট করে সরে গেল জানালার দিকে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে।

দু'পাশ থেকে চেপে এল দুই গোয়েন্দা। বেরোনোর পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল।

বেরোতে পারবে না বুঝে হাল ছেড়ে দিল জারভিস। ডিরেলের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক আছে, পালানোর চেষ্টা করব না। কিন্তু এ সব কেন করেছি, সেইটা আগে শুনুন।'

দরজার কাছে দৌড়ে গেল কিশোর। যাতে কোন চালাকি করে বেরিয়ে যেতে না পারে জারভিস। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল মুসা। দ্রুত গিয়ে জোরোর বাঁধন খুলে দিল। কিশোরও ঘরে ঢুকল। ঘিরে ফেলল জারভিসকে। পালানোর আর কোন উপায় থাকল না জারভিসের।

'এলে কি করে তোমরা?' একবার কিশোরের দিকে, একবার মুসার দিকে তাকাচ্ছে জোরো। হাতের কব্জি ডলছে, যেখানে এঁটে বসেছিল দড়ির বাঁধন।

'আমরা কি করে এসেছি সেটা পরে শুনো,' কিশোর বলল। 'আগে বলো, তুমি ঠিক আছ তো?'

'এখনও ঠিকই আছি। বহুত কষ্ট দিয়েছে। তবে সময়মত চলে এসেছ তোমরা। আর দেরি করলে...' কব্জি ডলায় মন দিল জোরো।

জারভিসের দিকে মনোযোগ দিল সবাই।

'এখন যা জিজ্ঞেস করব, ঠিক ঠিক জবাব দাও,' ডিরেল বললেন। 'কে তোমাকে নিয়োগ করেছে? কত টাকা খেয়েছ?'

মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল জারভিসের। 'অপরিচিত এক লোক ভাড়া করেছে আমাকে।'

'কি নাম ওর?'

'আমাকে বলেনি। শুধু বলেছে, আমাকে জেড বলে ডাকবে। কথামত কাজ করবে। ভাল টাকা পাবে।'

'কি কাজ করতে বলেছে?'

'রামাপানদের ওপর নজর রাখতে। ওরা নাকি গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

'তারমানে তুমি স্পাই?' কিশোর বলল। 'কিছু পেয়েছ?'

'নাহ্!'

সত্যি বলছে কিনা জারভিস, বোঝা গেল না।

'এই জেডটা এখন কোথায়?' জানতে চাইল মুসা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে না জানার ভঙ্গি করল জারভিস।

'ওর সঙ্গে কোথায় তোমার শেষ দেখা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন ডিরেল।

বোকা বোকা চোখে ডিরেলের দিকে তাকাল জারভিস। 'এখানেই ছিল। ওকে এই কেবিনে থাকতে দিয়েছিলাম আমি। জানি, এ সময় কেবিনের মালিক আসে না। জেড আমাকে বলেছে, শহরে থাকা তার উচিত হবে না। কারও নজরে পড়ে যেতে পারে। তাই এখানে থাকতে দিয়েছি।'

'নজরে পড়ার এত ভয় কেন জেডের? দাগী নাকি?'

আবার না জানার ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল জারভিস।

‘দেখতে কেমন ও?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘বাদামী চামড়া, গাট্টাগোট্টা। বয়েস পঁয়তিরিশ মত হবে। ডান হাতের উল্টো দিকে গভীর একটা কাটা দাগ আছে, ডব্লিউর মত দেখতে।’

‘ফ্রেড!’ চিৎকার করে উঠল মুসা।

‘হুঁ!’ মাথা দোলালেন ডিরেল। ‘ফ্রেডই হোক, আর জেডই হোক, ওকে ধরা দরকার। কেবিনে নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এলেই ক্যাঁক করে ধরব।’

হাতকড়া পরিয়ে জারভিসকে থানায় নিয়ে চললেন ডিরেল। ছেলেরা রওনা হলো গাঁয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে জোরোকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ‘লোকটা এমন কিছু বলেছে তোমাকে, যেটা খুব জরুরী সূত্র হতে পারে?’

‘না। খালি পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে। একবার শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাইরে গিয়েছিল। এমন করে বেঁধে রেখে গিয়েছিল আমাকে, অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারিনি।...বাইরে যাওয়ার আগে খারাপ ব্যবহারও করেনি তেমন। খাবার-টাবার দিয়েছে ঠিকমত। হঠাৎ আজ সকালে পেটানো শুরু করল। কথা আদায়ের চেষ্টা করতে লাগল।’

ছেলেকে ফিরে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বাফেলোস্টোন। রবিন এসে জড়িয়ে ধরল তিনজনকে।

আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর পিঠ চাপড়ানোর পালা শেষ হলে সর্দার বললেন, ‘সমস্যাটা ক্রমেই জটিল হচ্ছে।’ কিশোরের দিকে তাকালেন। ‘তোমরা যাওয়ার পর আরেকটা চিঠি এসেছে, হ্যান্সি ডুগানের কাছ থেকে।’

‘হ্যান্সি ডুগান?’ ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

‘নিজেকে ব্রিক ডুগানের নাতি বলে দাবি করছে সে। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়, বলেছিলাম, এ জায়গাটা ব্রিক ডুগানের কাছ থেকে কিনেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা।’

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, ‘আছে। কি চায় ও?’

‘হ্যান্সি বলছে, বিক্রির টাকার ন্যায্য ভাগ নাকি পায়নি ওর বাবা।’

‘ওর দাবিটা কি ন্যায্য?’

‘জানি না। তবে হলে সত্যিকারের বিপদে পড়ব আমরা। কারণ কোন জমি বিক্রি হলে, সেটার ন্যায্য হিস্‌সাদাররা সবাই ভাগ পায়।’

‘বিক্রির সময় ওর বাবার কথা কি জানানো হয়নি উকিলকে?’

‘ডুগান তো বলছে, হয়নি। ওর বাবা নাকি কিছুই জানত না। এ কথা ঠিক হলে জমি বিক্রিটা অবৈধ হয়েছে। আবার নতুন করে বেচা-কেনা হবে, নতুন দলিল হবে।’

নিচের ঠোঁটে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। ‘তারমানে ওরা বাড়তি টাকা চাইলে আপনি দিতে বাধ্য?’

‘হ্যাঁ,’ ভ্রূকুটি করলেন চীফ। ‘ডুগান বলছে, তার সৎ ভাই-বোন আছে, যারা সম্পত্তির অংশীদার। দলিলে সই দিতে তাদের রাজি করানোর জন্যে বিরাট অঙ্কের টাকা দাবি করেছে ডুগান।’

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বাফেলোস্টোন বললেন, 'আরেকটা ব্যাপারে আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

'কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমরা যেখানে গুপ্তধন খুঁজে এসেছি, তার পাশে আরও কে যেন খুঁড়ে রেখে গেছে।'

'কখন দেখলেন?'

'আজ সকালে। আশেপাশে জুতোর তাজা ছাপ। গর্তের কিনারে নতুন খোঁড়া মাটি। তারমানে কাল রাতে এসে খোঁজাখুঁজি করে গেছে।'

ঘাবড়ে গেল জোরো। 'জিনিসগুলো পেয়ে যায়নি তো?'

টেবিলে পাইপ ঠুকলেন বাফেলোস্টোন। 'বলা কঠিন। যে-ই খুঁড়েছে, অনেক গভীর করে খুঁড়েছে।'

'কিছু পেল কিনা, জানা দরকার।'

'কিভাবে জানব?'

'উপায় একটা আছে,' কিশোর বলল। 'ওকে বোকা বানাতে হবে।'

'কিভাবে? যদি তুলে নিয়েই যায়, বোকা বনতে আসবে কেন?'

'যদি না আসে তাহলে বুঝব, পেয়ে গেছে। না পেলে, অবশ্যই আসবে।'

'কিন্তু তোমার প্ল্যানটা কি?'

'আজ রাতেই উৎসব করতে চলে যাবে রামাপানরা। শিকারি-চাঁদের উৎসবের জন্যে আর দেরি করার দরকার নেই।'

'তারমানে,' বলে উঠল রবিন, 'লোকটা যদি গুপ্তধন পেয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে অবশ্যই দেখতে আসবে ইনডিয়ানরা কি করছে।'

'হ্যাঁ। সে ভাববে, সবাই উৎসবে ব্যস্ত। তার দিকে খেয়াল থাকবে না কারও। সেই সুযোগে চুরি করে দেখতে আসবে সে। কিন্তু আমরা তিনজন আর জোরো টিপির কাছে লুকিয়ে থেকে নজর রাখব।'

'বুদ্ধিটা মন্দ না,' বাফেলোস্টোন বললেন। 'আমি এখনই উৎসবের ব্যবস্থা করতে বলে দিচ্ছি।'

অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গোয়েন্দারা। সময় আর কাটে না। অবশেষে সূর্য ডুবল। চাঁদ উঠল। আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল বনভূমি। একটা জ্বলন্ত গোলার মত দিগন্তের ওপরে উঠে এল চাঁদ। জ্যোৎস্নার মধ্যে শুরু হলো রামাপানদের বিচিত্র উৎসব।

শুরু হলো ঢাকের বাজনা। প্রথমে ধীরে। তারপর দ্রুত হতে দ্রুততর। যোদ্ধার সাজে সজ্জিত, হাতে-মুখে-গায়ে রঙ লাগানো নর্তকরা দল বেঁধে এসে ঢুকল খোলা চত্বরে। নাচ শুরু হলো। নাচ মানে আগুনের কুণ্ড ঘিরে ক্রমাগত লাফ-ঝাঁপ। কে কত জোরে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফাতে পারে সেই প্রতিযোগিতা যেন। মজা পেয়ে মুসাও গিয়ে যোগ দিল ওদের দলে।

দেখতে দেখতে জমে গেল নাচ। পুরোদমে চলতে লাগল। ইনডিয়ানদের ঘেমে যাওয়া মুখগুলো চকচক করছে। আরও উদ্দাম, আরও উত্তাল হয়ে উঠছে ঢাকের শব্দ। মুসার নাচ দেখে হাততালি দিচ্ছে ইনডিয়ান দর্শকরা। উৎসাহ পেয়ে

আরও জোরে লাফাতে লাগল মুসা।

হাসতে লাগল রবিন। চিৎকার করে বাহবা দিতে লাগল মুসাকে।

দেখতে খারাপ লাগছে না কিশোরের। কাজ না থাকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। রবিনের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'চলো, আমাদের কাজ আমরা করিগে।' জোরোর কাছে এসে বলল, 'এখানে থাকো। চোখ রেখো চারদিকে। আমি আর রবিন টিপির কাছে যাচ্ছি।'

টিপির কাছে এসে ছায়ার মধ্যে দাঁড়াল দুজনে। কাউকে চোখে পড়ল না। কোন নড়াচড়া নেই। টিপিতে ঢোকার আগে দেখে নিল ওখানে কেউ ঢুকে বসে আছে কিনা। কেউ নেই দেখে ঢুকে পড়ল। বসে রইল চুপচাপ।

খুট করে একটা শব্দ কানে আসতে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রবিন। চোখ পড়ল জ্যোৎস্নায় রূপালী হয়ে থাকা বনের দিকে। তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে।

'কে যেন আসছে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। 'চলো, ধরা যায় নাকি দেখি।'

বেরিয়ে এল দুজনে। বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। ওদের দেখে ফেলল লোকটা।

রবিনের চুল ছুঁয়ে উড়ে চলে গেল কি যেন। খট করে শব্দ হলো। ফিরে তাকাল সে। বিশাল একটা ছুরি গেঁথে গেছে টিপির খুঁটিতে।

রবিনের কাঁধ চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে মাটিতে শুইয়ে ফেলল কিশোর। নিজেও শুয়ে পড়েছে। আরও ছুরি ছুটে আসার আশঙ্কায়। 'ও আমাদের খুন করতে চাইছে!'

অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে রবিন। কাঁপছে। মুখ চেপে ধরে রেখেছে বরফের মত ঠাণ্ডা মাটিতে। ছুরি খাওয়ার ভয়ে দুজনের কেউই মাথা তুলছে না।

কিন্তু আর এল না ছুরি। শোনা গেল ছুটন্ত পদশব্দ।

আস্তে মাথা তুলল রবিন। 'পালাচ্ছে। উফ্! বড় বাঁচা বেঁচেছি! গেছিলাম আজ আরেকটু হলেই।'

কিশোরও উঠে বসল। 'তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বোঝা গেল, গুপ্তধন এখনও খুঁজে পায়নি সে।'

হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল দুজনে উৎসব যেখানে হচ্ছে। শেষ হয়ে এসেছে উৎসব। থেমে গেল নাচ। বাজনা বন্ধ হলো। কেউ একা, কেউ দল বেঁধে গাঁয়ে ফিরে চলল গ্রামবাসীরা। গাঁয়ের কয়েকজন প্রবীণের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করছেন সর্দার বাফেলোস্টোন। কিশোর আর রবিনকে দেখে এগিয়ে এলেন। মুসা আর জোরোও কাছে এসে দাঁড়াল আরেক পাশ থেকে।

'কোথায় গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলেন সর্দার।

কোথায় গিয়েছিল, কি ঘটেছে, জানাল কিশোর।

গম্ভীর হয়ে বাফেলোস্টোন বললেন, 'হুঁম্, দিন-রাত পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে টিপির কাছে।'

হাত তুলে দুজন বলিষ্ঠ যুবককে ডাকলেন। বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। টিপির কাছে পাহারা দিতে চলে গেল ওরা।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'আর তো কোন কাজ নেই নিশ্চয় এখানে?

চলো, গাঁয়ে চলে যাই। আমার ঘুম পাচ্ছে।' হাই তুলল সে।
রবিন হাসল। 'কে বলেছিল তোমাকে ওদের সঙ্গে নাচতে। এখন গেলে তো কাহিল হয়ে। গুপ্তধন খোঁজায় আর থাকতে পারলে না।'
গুপ্তধন খোঁজার উত্তেজনা বাদ দিতেও রাজি নয় মুসা। বলল, 'আজ আর নাই বা খুঁজলে। পাহারা তো রাখাই হয়েছে।'
'পাহারাটা তো আসল কথা না,' কিশোর বলল। 'আসল হলো চাঁদের আলো। আবহাওয়ার যা ভাবভঙ্গি এখানে, এই ভাল তো এই খারাপ। কখন আবার বৃষ্টি নামে ঠিক আছে কিছু। চাঁদও থাকবে না, ছায়াও পাব না।'
'কি করতে চাও তাহলে?' রবিনের প্রশ্ন।
'খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাব।'
'কিন্তু কোথায় খুঁজবে?' মুসা বলল। 'কম তো খুঁড়লাম না। পেলাম তো কয়েক মণ মাটি আর পাথর।'
'খোঁজাটাই হয়েছে ভুল জায়গায় আমাদের,' রবিন বলল।
'আমারও তাই ধারণা,' কিশোর বলল। 'আসল ছায়াটা খুঁজে বের করতে হবে। সম্ভব হলে আজ রাতেই।'
'কিন্তু আমার ঘুম...' বলতে গিয়েও আবহাওয়ার কথা মনে করে থেমে গেল মুসা। 'চুলোয় যাক ঘুম। অন্যদিন বেশি করে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেব। চলো, কোথায় যেতে হবে।'
'গাঁয়ে যাব। মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি আনতে হবে।'
বেলচা, শাবল, দড়ি আর টর্চ নিয়ে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। বাফেলোস্টোনই বের করে দিলেন। জোরোর খুব ইচ্ছে ছিল সঙ্গে যায়, কিন্তু ওর শরীরের কথা ভেবে যেতে দিলেন না ওর বাবা। মন খারাপ করে বাড়িতেই রয়ে গেল জোরো।
টিপির কাছে এসে চাঁদের আলোয় মনোযোগ দিয়ে পুরো এলাকাটা পরীক্ষা করল কিশোর। আনমনে বিড়বিড় করল, 'টিপির ছায়ায় তো পেলাম না। তাহলে? কোথাকার ছায়ার কথা বলা হয়েছে? কোথায় পড়ে ক্রসের মত ছায়া?'
সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। তার ওপাশে মাথা তুলে রাখা পাহাড়টার দিকে হাত তুলল রবিন, 'চলো, ওটার ওপরে উঠে দেখিগে। ওপর থেকে ভাল দেখা যাবে। নিচ থেকে অনেক কিছুই চোখে পড়ে না।'
বুদ্ধিটা পছন্দ হলো কিশোরের। ঢাল বেশ খাড়া। পাহাড়ে চড়ার ওস্তাদ রবিনের জন্যে যতটা সহজ হলো, অন্য দজনের জন্যে তা হলো না। ওপরে উঠে হাঁপাতে লাগল বেশি বেশি।
চাঁদের আলোয় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে নিচে। প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ওরা। বোঝার চেষ্টা করছে, কোন্‌খানে লুকানো থাকতে পারে গুপ্তধন।
'এদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না,' কিশোর বলল। 'ওপাশটা দেখি, এসো।'
শ'খানেক গজ চওড়া চ্যাপ্টা মালভূমির মত চূড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। একপাশ থেকে ঝপ করে যেন খাড়া নেমে গেছে পাহাড়টা। নিচে গভীর খাত। তার ওপাশ থেকে আবার মাথা তুলেছে পাথুরে পাহাড়ের আরেকটা খাড়া দেয়াল।

হঠাৎ কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরল রবিন।

'দেখো!' চিৎকার করে উঠল সে। 'পাশের পাহাড়টায়! চূড়ার ঠিক নিচে খাঁজমত জায়গাটায়! দেখেছ?'

পনেরো

'ক্রস!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'খাইছে!' শুধু একটা শব্দ। আর কোন কথা বেরোল না মুসার মুখ দিয়ে।

হাঁ করে ছায়াটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে। ওদের দিকে মুখ করে থাকা ঢালটার গায়ে নিখুঁত ক্রসের মত একটা ছায়া। ওরা যে পাহাড়টায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটার ঢাল থেকে বেরোনো দুটো লম্বা হাতের মত পাথরের ছায়া গিয়ে সামনের পাহাড়টায় পড়ে তৈরি করেছে এই ক্রস।

'তারমানে পেয়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত!' রবিন বলল।

'পেলাম তো,' চিন্তিত স্বরে বলল কিশোর, 'কিন্তু ওখানে নামতে যাওয়াটা হবে আত্মহত্যার সামিল।'

'পা ফসকালেই ছাতু!' কেঁপে উঠল মুসার গলা।

'কিন্তু নামতেই হবে আমাদের, যে করেই হোক,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রবিন। পাহাড়কে ভয় করে না সে। কয়েকবার পা ভেঙেছে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে। যত খাড়া আর দুরারোহই হোক, পাহাড়ে চড়াটা তার কাছে একটা নেশা। আর এখনকার ব্যাপারটা তো রীতিমত একটা চ্যালেঞ্জ। 'রামাপানদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওই দলিলের ওপর। আমাদের ঠিক নিচেই একটা শৈলশিরা আছে, তাকের মত, দেখো। কোনমতে ওটাতে নামতে পারলে...'

'দড়ি দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।' কাঁধের দড়ির বান্ডিলটা নামাল কিশোর।

দড়ির একটা মাথা নামিয়ে দিল সে। পাহাড়ের দেয়ালে বাড়ি দিতে দিতে, নেচে নেচে মাথাটা নেমে গেল নিচে। তাকে গিয়ে ঠেকল। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছে না। অন্য মাথাটা বাড়িয়ে দিল কিশোর, 'বেঁধে ফেলো একটা গাছের সঙ্গে। আমি নেমে যাচ্ছি।'

'তুমি আগে নামবে কেন?' ভুরু নাচাল মুসা। 'গুপ্তধন উদ্ধারের কথা কার মাথায় আগে এসেছিল?' কিন্তু ঢালের কিনার দিয়ে গলা বাড়িয়ে তাকের দিকে একবার তাকিয়েই ঝট করে পিছিয়ে এল সে। হীরো হওয়ার চিন্তা দূর হয়ে গেল মাথা থেকে। 'থাকগে, নামলে নামোগে। সুযোগটা তোমাকেই আগে দেয়া গেল। স্বার্থপর না আমি।'

হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন।

গাছের সঙ্গে দড়ির মাথাটা শক্ত করে বেঁধে দিল মুসা। ঠিক আছে কিনা টেনেটুনে দেখল কিশোর। 'স্বার্থপর আর হতে হবে না। তোমার এখানে থাকাই

বেশি প্রয়োজন। আমি ফসকালে দুজনে মিলে টেনে তুলতে পারবে। আর তুমি ফসকালে, তোমার যা ওজন, পাঁচজনে মিলেও তুলতে পারব না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। 'বাড়ি গিয়ে এবার খাওয়া কমিয়ে দেব। সত্যি। কসম।'

আবার হাসল কিশোর আর রবিন।

কয়েকবার দড়িটা টেনেটুনে দেখল কিশোর। দড়ি ধরে নেমে যেতে শুরু করল ধীরে ধীরে। খুব সাবধানে, প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে নেমে এল শৈলশিরার কাছে। হতাশায় ছেয়ে গেল মন। যে জায়গাটাকে চ্যাপ্টা, সমতল ভেবেছিল, মোটেও সমতল নয় সেটা। এবড়োখেবড়ো আর এমনভাবে পাশের দিকে কাত হয়ে আছে, দাঁড়ানো অসম্ভব।

'নাহ্, হবে না,' ওপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে জানাল সে।

উঠে আসাটা নামার চেয়ে কঠিন হলো। মট মট আওয়াজ করছে দড়ি। পাথরে ঘষা লেগে ছিঁড়তে শুরু করেছে একটা একটা করে সুতোর পাক। হঠাৎ পিছলে গেল হাত। সড়সড় করে নেমে গেল কয়েক ফুট। দড়িতে শক্ত হলো আবার আঙুল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। পা সরে গেছে ঢাল থেকে। শূন্যে ঝুলতে থাকল শরীরটা। নিজের অজান্তেই তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। অবশ হয়ে আসছে হাতের পেশীগুলো। বেয়ে ওঠার শক্তি নেই আর।

দড়ি ধরে টেনে তুলে আনল তাকে মুসা আর রবিন।

'এ জন্যেই তোমাকে রেখে গিয়েছিলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে মুসাকে বলল কিশোর। 'এ ভাবে বোধহয় নামতে পারব না আমরা। মুসা, এক কাজ করো। দৌড়ে গাঁয়ে চলে যাও। বাফেলোস্টোনকে গিয়ে বলো, জায়গাটা পেয়ে গেছি আমরা। আপাতত পাহারার ব্যবস্থা করা দরকার। পরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর লোক নিয়ে এসে তোলার ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি যাও, আমি আর রবিন বসে পাহারা দিচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারো, চলে এসো।'

কোন কথা না বলে রওনা হয়ে গেল মুসা। পাহাড়ের জঙলা অংশটা পার হয়ে নিচে নামতে শুরু করল। খাড়া ঢালে মাঝে মাঝে পা পিছলাচ্ছে। হড়কে নেমে যাচ্ছে অনেকখানি। ঝোপঝাড় বা পাথরে ঠেকে গিয়ে, কিংবা শেকড় আঁকড়ে ধরে পতন রোধ করছে। প্রচুর শব্দ হচ্ছে তাতে।

শরীরের অনেক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেল। জ্বালা করছে ক্ষতগুলো। কিন্তু দমল না সে। থামলও না। নেমে এল পাহাড়ের গোড়ায়। দম নেয়ার জন্যেও থামল না। সোজা দৌড় দিল বন লক্ষ্য করে। বনের ভেতরে ঢুকেও দৌড়ে চলল।

সন্দেহজনক একটা শব্দ কানে আসতে যেন ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে ফেলল নিজেকে। যে পাশের ঝোপ থেকে শব্দটা এসেছে মনে হলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। হাতের তালু ঘামছে। কান পেতে আছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শব্দটা শুনতে পেল না।

আনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে যেন সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করল। তবে এখন যতটা সম্ভব শব্দ কম করে চলার চেষ্টা করছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা।

আবার শুনতে পেল শব্দটা। ঠিক তার পেছনে।

ঘুরে দাঁড়াতে গেল সে। কিন্তু পুরো পাক ঘুরতে পারল না। পেছন থেকে কাঁধ চেপে ধরে শুইয়ে ফেলা হলো তাকে। কঠিন কয়েকটা আঙুল সাঁড়াশির মত মুখ চেপে ধরল তার। ঝাড়া দিয়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল সে। লাভ হলো না।

মুখোশ পরা লোকগুলো চেপে ধরে বেঁধে ফেলল তাকে। বয়ে নিয়ে এল একটা বড় গাছের কাছে।

'কি করতে হবে ওকে, বুঝতে পারছ তো? না বলে দিতে হবে?' কর্কশ কণ্ঠে বলল এক মুখোশধারী।

'না, বলার দরকার নেই,' জবাব দিল আরেকজন। 'কিন্তু যা ভারীর ভারী, এক টনের কম হবে না। ডাইনোসরের বাচ্চা, বাপরে বাপ! তুলতেই তো জান কাবার!'

এ সময়টায় আবার মুসার মনে হলো, না, খাওয়া কমাবে না। ওজন কম থাকলে যেমন সুবিধে, বেশি থাকলেও কোন কোন সময় সুবিধে।

অনেক কায়দা-কসরত করে মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে একটা মোটা ডালে শোয়ানো হলো তাকে। বেঁধে ফেলা হলো নিচে থেকে আর সহজে চোখে পড়বে না।

'এবার অন্য বিচ্ছু দুটোর ব্যবস্থা করতে হবে,' মুসাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল মুখোশধারীদের সর্দার। 'অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছে।'

শঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। নিজের জন্যে যতখানি না, তারচেয়ে কিশোর আর রবিনের জন্যে। ওদেরকে সাবধান করার কোন উপায় নেই।

ওদিকে বসে থাকবে বললেও বসে থাকতে পারেনি কিশোর আর রবিন। ঢাল ধরে এগিয়ে পঞ্চাশ ফুট দূরে এমন একটা জায়গা আবিষ্কার করেছে, যেখানে তাকের ওপর নামা সম্ভব।

'এবার আমার পালা,' রবিন বলল। 'দুই দেয়ালের মাঝে ফাঁক খুব কম, দেখো। পার হয়ে ওপাশের দেয়ালে চলে যাওয়া যাবে।'

এখানে আবার একটা গাছের গোড়ায় দড়ি বাঁধল কিশোর। নামিয়ে দিল দড়ির অন্য মাথা।

সাবধানে দড়ি বেয়ে সরু তাকটায় নেমে এল রবিন।

ওপর থেকে কিশোর হাঁক দিল, 'নেমেছ?...আমিও আসছি।'

শৈলশিরা থেকে আট ফুটমত ওপরে থাকতে দড়িতে একটা নাড়া অনুভব করল সে। ওপর দিকে তাকাল। তাকিয়েই স্থির। শিরার রক্ত জমাট বেঁধে গেল যেন।

অনেক ওপরে, চন্দ্রালোকিত আকাশের পটভূমিতে দেখা গেল একটা মুখোশ পরা মাথা ওর দিকেই ঝুঁকে রয়েছে। মাথার পাশে একটা হাতও দেখা যাচ্ছে। হাতে একটা ছুরি।

রবিনও দেখতে পেয়েছে লোকটাকে। চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর! দড়ি কেটে দেবে!'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল কিশোর। পরক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন শরীরে। দ্রুত নামতে শুরু করল। টের পাচ্ছে, দড়িতে পোঁচানো শুরু হয়ে গেছে। হাতের আঙুল ঢিল করে দিয়ে শেষ কয়েকটা ফুট পিছলে নেমে আসতে চাইল।

তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। ফুট তিনেক ওপরে থাকতে আলাদা হয়ে গেল দড়ি। ঝপ করে তাকের ওপর পড়ল সে।

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। চিত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করেছে।

লোকটাকে দড়িতে পোঁচ দিতে দেখেই কি ঘটবে আন্দাজ করে ফেলেছিল রবিন। মরিয়া হয়ে চেপে ধরেছিল পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা মোটা শেকড়। কিশোর তার কাছে পড়তেই হাত বাড়িয়ে থাবা মেরে ধরে ফেলল জামার কলার।

কয়েকটা সেকেন্ড শেকড় আর রবিনের হাতের ওপর ভর করে ঝুলে রইল দুজনে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করল। আপ্রাণ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে দিল মৃত্যুকে।

চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে দুজনেরই। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। কিশোরের গলার মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, আরেকটা মাথা যুক্ত হয়েছে প্রথমটার সঙ্গে।

'এই, কে তোমরা?' চিৎকার করে উঠল কিশোর। দাঁড়কাকের কর্কশ স্বর বেরোল গলা দিয়ে।

খিকখিক হাসি শোনা গেল। 'আমরা কে সেটা জানার দরকার নেই। নিজেদের কি হবে সেটা নিয়ে ভাবো। এখন আর নামতেও পারবে না, উঠতেও পারবে না।'

দ্বিতীয় লোকটা বলল, 'আটকা পড়েছ ভাল জায়গায়।'

'ফ্রেডের গলা!' ফিসফিস করে রবিনকে বলল কিশোর।

'অন্য লোকটা ডুগান!'

'হুঁ।'

'বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের। মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত।'

কিন্তু সময় কাটতে লাগল। মুসা ফিরল না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

'মুসাকেও আটকে ফেলেনি তো?' রবিনের সন্দেহ।

জবাব দিল না কিশোর। গভীর মনোযোগে কি যেন ভাবছে। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

উঠে দাঁড়াল সে। 'শুধু শুধু বসে থাকার কোন মানে হয় না। নামতেই যখন পারলাম, পার হয়ে গিয়ে দেখা দরকার জিনিসগুলো পাওয়া যায় কিনা।'

দুটো দেয়ালের মাঝের দূরত্ব আন্দাজে মেপে নিল সে। লাফিয়ে পেরোনো সম্ভব না। সামনের দিকে তাকাল। বেশ কিছুটা দূরে ফাঁক অনেক কম, ওখান দিয়ে নিরাপদে পেরোনো যাবে হয়তো। বাফেলোস্টোনের বাবা গ্রিজলি বাফেলোস্টোন সম্ভবত ওখান দিয়েই পেরিয়েছিলেন।

সরু তাকের মত জায়গাটা ধরে তিল তিল করে এগিয়ে চলল দুজনে। তাড়াহুড়া করল না। কোন রকম ঝুঁকি নিল না। জানে, পা ফসকালে মৃত্যু। চলে এল সেই জায়গাটায়।

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'সরে আসতে নিশ্চয় দেখেনি আমাদের। নিচে

তাকিয়ে না দেখলে ওরা ভাববে খাদে পড়ে মরে গেছি। যেখানে রয়েছি, ওপর থেকে কোনমতেই দেখতে পাবে না।'

'না দেখলেই ভাল।'

খুব সাবধানে তাক বদল করল ওরা। পা ফসকে নিচে পড়লে কি ঘটবে ভাবতে চাইল না একটিবারের জন্যেও। চলে এল ক্রসের মত ছায়াটার নিচে। ছায়ার মধ্যে চাতালের মত বেরিয়ে থাকা ছোট, চ্যাপ্টা একটা পাথরের নিচে একটা ফাটল দেখতে পেল। পাথরটা এমন ভাবে ছাত তৈরি করে রেখেছে, বৃষ্টির পানি কোনমতেই ফাটলে ঢুকতে পারবে না। কোন জিনিস রাখলে ওখানে নিরাপদে থাকবে।

থাকলে ওটার মধ্যেই আছে, ভেবে, কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে নিল কিশোর। হাত দিয়ে এমন করে ঢেকে নিল, যাতে ওপরে দাঁড়ানো কারও চোখে আলো না পড়ে। সুইচ টিপে আলো ফেলল ফাটলের গায়ে।

হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

পরক্ষণে ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

আঁতকে উঠল রবিন। 'কি হলো! সাপ!'

ষোলো

মাথা নাড়ল কিশোর।

ফাটলের ভেতর থেকে ছোট একটা লোহার বাক্স টেনে বের করল। টর্চের আলোয় দেখতে লাগল।

তালা নেই। হুড়কো খুলে ডালা তুলতেই ঝিকিয়ে উঠল যেন লক্ষ তারার আলো।

'রত্নখচিত ছুরি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। কাঁপা হাতে তুলে নিল মহামূল্যবান অস্ত্রটা। হাতলে বসানো চুনি, পান্না, হীরাগুলো ঝিকঝিক করছে চাঁদের আলোয়।

'জলদস্যুদের জিনিস,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর।

'দলিলগুলোও আছে,' হলদে হয়ে আসা এক বান্ডিল কাগজ তুলে নিল রবিন।

'দলিলই নাকি দেখো।'

বান্ডিল থেকে একটা কাগজ মেলল রবিন। টর্চের আলোয় একবার চোখ বুলিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এগুলোই। রামাপানদের জমির দলিল।'

এই সময় কথার শব্দ কানে এল।

'লুকিয়ে ফেলা দরকার,' কিশোর বলল।

ছুরি আর কাগজগুলো আবার বাক্সে ভরে ফেলল রবিন। বাক্সটা ঢুকিয়ে রাখল ফাটলের মধ্যে। সরু কার্নিস বেয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত সরে আসতে লাগল আগের জায়গায়।

জোরাল হচ্ছে কণ্ঠস্বর।

'কিশোর! দেখো! ওরা আসছে!'

লম্বা একটা দড়ি বেয়ে নেমে আসছে ফ্রেড আর ডুগান। কিশোররা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছেই অন্য পাশের দেয়ালে ঝুলছে দড়িটা।

কিশোরের একবার মনে হলো দড়ি বেয়ে উঠে হামলা চালায় শত্রুদের ওপর। কিন্তু পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। লোকগুলোর সঙ্গে পারা কঠিন। তা ছাড়া দড়িতে ভর করে ঝুলে থেকে এতগুলো মানুষ মারামারি শুরু করলে ছিঁড়ে পড়বে দড়ি। নিচে পড়ে সব ক'জনই ভর্তা হবে তখন। তারচেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে, ওরা কি করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল।

ঢালের দেয়ালে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই গোয়েন্দা।

মুখোশ খুলে ফেলেছে দুই চোর। নেমে আসছে দ্রুত।

স্নায়ু টানটান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে দুই গোয়েন্দা।

'আমাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে রাজি হবে?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'মনে হয় না। তবে যে কোন ভাবেই হোক ঠেকাতে হবে ওদের, আমাদের সাহায্য না আসা পর্যন্ত।'

'কিভাবে?'

'ভাবছি। আমরা...'

কিশোরের কথা শেষ হলো না। তাকের ওপর নেমে পড়েছে ফ্রেড। মুহূর্ত পরেই তার দোস্তও নেমে এল। দেখে ফেলল গোয়েন্দাদের।

'খবরদার, সামনে এগোবেন না!' হুমকি দিল কিশোর।

নিজেদের অবস্থানটা ভালমত দেখে নিল ফ্রেড। কিশোরদেরটাও দেখল। বিবেচনা করল। বুঝল, কিশোররা ভাল অবস্থানে আছে। শান্তকণ্ঠে বলল, 'ভয় নেই, তোমাদের ছোঁব না আমরা। ঠেলে ফেলতে গিয়ে নিজেরাও ঝুঁকি নেব, অত বোকা ভেব না। না খেয়ে যাতে মরতে পারো, সেই ব্যবস্থাই বরং করব।'

'জিনিসগুলো পেয়েছ নাকি?' ডুগান জিজ্ঞেস করল। 'কোথায় আছে ওগুলো?'

আকাশ থেকে পড়ল যেন কিশোর। 'কিসের জিনিস?'

'না বোঝার ভান করে লাভ নেই,' গর্জে উঠল ফ্রেড। 'কিসের জিনিস, ভাল করেই জানো তোমরা। ভাল চাও তো, জলদি বলো!'

'বেশ,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল কিশোর, 'তথ্য বদল করতে রাজি আছি আমরা। আমরা যা জিজ্ঞেস করব, আপনারা জবাব দেবেন; আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেব আমরা। রাজি?'

কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন। 'সত্যি বলে দেবে?'

ওর হাতে চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করল কিশোর। সাহায্য না আসা পর্যন্ত সময় নষ্ট করতে চাইছে সে। সেই সঙ্গে কয়েকটা প্রশ্নের জবাবও জেনে নিতে চায়।

'তথ্য বিনিময়, না?' ডুগান বলল। 'সাহস আছে বলতে হবে। কোণঠাসা হয়েও...' ফিরে তাকাল সঙ্গীর দিকে, 'বলতে অসুবিধে কি?'

'না, কোন অসুবিধে নেই,' ফ্রেড বলল। 'ওরা এখন মৃত। মরা মানুষের কাছে বলা না বলা সমান কথা। ভয়ের কিছু নেই।' ছেলেদের দিকে তাকাল সে, 'বলো, কি জানতে চাও?'

'আসলে উদ্দেশ্যটা কি আপনাদের?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'এটাও বোঝোনি এতদিনে? ডুগানকে সাহায্য করছি আমি, তার ছিনতাই হয়ে যাওয়া সম্পত্তি ফেরত পেতে।'
'ছিনতাই হয়ে যাওয়া সম্পত্তি মানে?'
'এই জমিটা ডুগানের। তার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি।'
'কিন্তু ব্রিক ডুগান তো এ জমি রামাপানদের কাছে বেচে দিয়েছিল।'
'কে বলল?' খিকখিক করে হাসল ডুগান। 'প্রমাণ কই?'
'কেন, দলিলগুলো?'
'কোথায় দলিল? পেয়ে গেছ নাকি?'
'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও সময়মত সামলে নিল কিশোর। 'তারমানে দলিল সত্যি আছে। তাহলে প্রমাণ নেই বলছেন কেন?'
'দলিল আদালতে দাখিল করতে পারলে তবে তো প্রমাণ,' আবার হাসল ডুগান। 'কিন্তু যদি নষ্ট করে ফেলা হয়? ষাট বছর এখনও পূর্ণ হয়নি রামাপানদের···যাকগে, দলিলগুলো কোথায় বলো?'
জবাব না দিয়ে জানতে চাইল কিশোর, 'মুসা কোথায়? আমাদের আরেক বন্ধু?'
'বেঁধে রেখে এসেছি,' হাসল ফ্রড। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'তোমাদের এ দুরবস্থার জন্যে তোমরা নিজেরাই দায়ী, আমাদের দোষ দিতে পারবে না।'
চুপ করে ভাবতে লাগল কিশোর।
ফ্রড বলল, 'তোমাদের প্রশ্নের জবাব তো পেলে। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও। দলিল আর ছুরিটা কোথায়?'
'তার আগে বলুন, ওগুলোর খোঁজ জানলেন কি করে আপনারা?'
'ব্রিক ডুগানের একটা পুরানো ডায়রিতে সব কথা লেখা আছে। পুরানো আলমারি ঘাঁটতে গিয়ে পেয়ে যায় হ্যান্সি। জমি দখলের চিন্তাটা মাথায় ঢোকে তখন। আমার সঙ্গে এসে পরামর্শ করে। আমি সাহায্য করতে রাজি হলাম। কিন্তু দলিল নষ্ট না করে আদালতে মামলা করতে যাওয়া বোকামি হয়ে যাবে। তাই সেটা খুঁজে বের করায় মন দিলাম প্রথমে। অনেক ঘোরাঘুরি আর খোঁজ-খবর করে জানলাম, দলিল কোনখানে লুকানো আছে, সেটা লেখা আছে একটা কী-কেসের মধ্যে···'
'যেটা বার বার চুরি করে আনতে গিয়েছিলেন আমাদের বাড়িতে?'
মাথা ঝাঁকাল ফ্রড, 'হ্যাঁ।'
'কিন্তু ওর মধ্যে নকশাটা নেই। কিছুই নেই।'
'সেলাই খুলে দেখেছ?'
'না!' হঠাৎ নিজেকে গাধা মনে হলো কিশোরের। চামড়ার দুটো পাতলা পরত একটার ওপর আরেকটা বিছিয়ে সেলাই করে তৈরি হয়েছে কেসটা। জোড়া খুললেই আলাদা হয়ে যেত চামড়া দুটো। নিশ্চয় ভেতরের দিকে লেখা রয়েছে কোথায় আছে দলিলগুলো। অথচ সেলাই খুলে দেখার কথা মনে হয়নি একবারের জন্যেও।
'ও, তাহলে নকশা দেখে আসোনি!' বিস্ময় চাপা দিতে পারল না ফ্রড।
'না,' কিশোর বাধা দেয়ার আগেই বলে ফেলল রবিন। 'গ্রিজলি

বাফেলোস্টোনের কথার সূত্র ধরে…'

'অ! অথচ কী-কেসটা খুললে চামড়ায় আঁকা নকশাটা পেয়ে যেতে। সহজেই চলে আসতে পারতে এখানে। এত কষ্ট করা লাগত না।'

'হুঁ!' বিড়বিড় করল কিশোর, 'ঘুরিয়ে খাওয়া হলো আরকি!'

'তাহলে পেয়ে গেছ ওগুলো। কই? কোথায়?'

'কী-কেসের মধ্যে নকশা আছে, এ কথা জানলেন কি করে? বাফেলোস্টোন তো জানেন না।'

'দলিল লুকিয়ে রেখে এসে চামড়ার টুকরোতে নকশা এঁকেছিল গ্রিজলি। এক তরুণ কারিগরের হাতে টুকরোটা দিয়ে কী-কেস বানিয়ে দিতে বলেছিল। ভুলটা করেছিল ওখানেই। কারিগরকে বিশ্বাস করা তার উচিত হয়নি। কারণ লোকটার ছিল মিশ্র রক্ত, খাঁটি রামাপান ছিল না। কথাটা পুরোপুরি গোপন রাখতে পারেনি। নকশার কথা তার ছেলেকে বলে গেছে সে। সেই ছেলের কাছ থেকে জেনেছি আমরা।'

'ছেলেটা নিশ্চয় ক্র্যাক!' প্রায় চিৎকার করে উঠল কিশোর।

হাসল ফ্রেড। 'বুদ্ধি আছে তোমার।…যাকগে, যা যা জিজ্ঞেস করেছ, সবই বললাম। এখন বলো দেখি, দলিলগুলো কোথায়?'

জবাব দিল না কিশোর।

ধৈর্য হারাল ফ্রেড। চিৎকার করে উঠল, 'জলদি বলো! আমাদের হাতে সময় কম। ভোর হয়ে আসছে। আলো ফোটার আগেই চলে যেতে হবে। ইনডিয়ানরা চলে এলে মুশকিলে পড়ে যাব।'

আবার কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন। আস্তে করে তার হাতে চাপড় দিল কিশোর। ফ্রেডকে বলল, 'জমির দলিলগুলো চাইছেন, না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! কোথায় ওগুলো?'

'এই তাক ধরে এগিয়ে যান,' ফ্রেডরা যে শৈলশিরায় নেমেছে, সেটা দেখাল কিশোর। 'আড়াআড়ি হয়ে থাকা দুটো পাথর দেখতে পাবেন। ওগুলোর নিচে গিয়ে দেখবেন, ঘুরে গেছে পথ। থামবেন না। এগিয়ে যাবেন। ঢালের গায়ে দেখবেন অনেক পাথর বেরিয়ে আছে। এক এক করে গুনতে গুনতে এগোবেন। বারো নম্বর পাথরটার কাছে গিয়ে থামবেন। হাত বাড়ালেই একটা ফাটলের মধ্যে পেয়ে যাবেন জিনিসগুলো।'

হাসি চেপে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হলো রবিনকে। কি সাংঘাতিক অভিনেতা কিশোর। এমন করে বলছে, তার নিজেরও বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। জানা না থাকলে করেই ফেলত।

উত্তেজনা আর আগ্রহে সাবধান থাকার কথাও ভুলে গেল দুই চোর। দ্রুত এগোতে শুরু করল। পা পিছলে পড়ে যে মরতে পারে, সেটাও যেন মাথায় নেই। ওরা মোড় নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই নড়ে উঠল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'জলদি এসো! পালাই!'

পার হয়ে এ পাশের তাকে এসে দড়িটা চেপে ধরল কিশোর। মুহূর্ত দেরি না করে দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

অনেকখানি উঠে এসেছে দুজনে, হঠাৎ নিচে থেকে চিৎকার শোনা গেল,

'বোকা বানিয়েছে আমাদের! ধোঁকা দিয়েছে!'

থামল না কিশোররা। দ্রুত উঠে যেতে লাগল। পৌঁছে গেল চূড়ায়। কানে আসছে ফ্রেড আর ডুগানের খিস্তি।

চূড়ায় উঠে হাত-পা ছড়িয়ে বসল কিশোর। রবিনের উঠে আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

উঠে এল রবিন। দড়িটা টেনে তুলতে তুলতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাঁচলাম!'

'তা-ই মনে হচ্ছে, না?' ব্যঙ্গ করে হাসল কেউ।

চমকে ফিরে তাকাল দুজনে।

তিনজন সশস্ত্র লোক ঘিরে ফেলেছে ওদের।

'যদি প্রাণের মায়া থাকে, পালানোর চেষ্টা কোরো না,' হুমকি দিল একজন।

দ্বিতীয়বার বন্দি হলো গোয়েন্দারা।

একজনকে দেখিয়ে রবিন বলল, 'এই লোকটারই পিছু নিয়েছিলাম সেদিন...'

'চুপ! কোন কথা নয়!' ধমকে উঠল লোকটা।

আরেকজন বলল, 'দাও না পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে। বহুত যন্ত্রণা দিয়েছে।'

জবাব দিল না প্রথমজন। দড়িটা আবার নামিয়ে দিল।

উঠে এল ফ্রেড আর ডুগান। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ওদের রেগে যাওয়া চেহারা দেখতে পেল কিশোর আর রবিন।

'মিথ্যে কথা বলেছ আমাদের সঙ্গে! ধোঁকা দিয়েছ!' চিৎকার করে উঠল ফ্রেড। 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!' সঙ্গীদের হুকুম দিল, 'এই, ধরো তো ওদের!'

দুজন ধরল কিশোরকে, আর দুজন রবিনকে। নিচে ফেলে দেয়ার জন্যে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল পাহাড়ের কিনারে।

•

সতেরো

কিনার থেকে কয়েক ফুট দূরে থাকতে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'দাঁড়াও! সরে যাও জলদি!'

মুসা আর জোরোকে দৌড়ে আসতে দেখছে সে।

তারমানে কোনভাবে বাঁধন খুলে ফেলেছে মুসা। গাঁয়ে গিয়ে খবর দিয়েছে।

কিশোরের চিৎকার কানে যেতেই এদিকে তাকাল মুসা। দেখে ফেলল। চেপে ধরল জোরোর হাত।

সশস্ত্র লোকগুলোকে দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেল মুসার মগজে। বুঝল, চারজনে মিলে কাবু করতে পারবে না পাঁচজনকে। যা করার বুদ্ধি করে করতে হবে–চিৎকার করে সম্ভবত এই ইঙ্গিতই দিয়েছে কিশোর, ভেবে, জোরোর হাত ধরে একটানে সরে গেল বড় একটা পাথরের চাঙড়ের আড়ালে।

কিশোরের অদ্ভুত কথার মানে বুঝতে না পেরে মিটমিট করে তার দিকে

তাকাতে লাগল ফ্রুড। 'কি বলছ?'

ওর চোখে চোখে তাকাল কিশোর। 'আমাদের ফেলে দিলে দলিলগুলো জীবনেও খুঁজে পাবেন না আপনারা। আগের জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলেছি। একমাত্র আমরা দুজনে জানি এখন, ওগুলো কোথায় আছে।'

রবিনকে ঠেলছিল তখনও দুজন লোক, হাত তুলে ওদের থামতে বলল ফ্রুড।

কিশোরকে চেপে ধরা একজন বলল, 'বিচ্ছুটা ঠিকই বলেছে, বস্।'

'একবার ধোঁকা দিয়েছে আমাদের,' ফ্রুড বলল। 'আবারও দিতে পারে।'

শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের অবস্থায় পড়লে আপনারাও তা-ই করতেন। দলিলগুলো পেলেও আমাদের ফেলে আসতেন ওখানে। ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমাদের।'

ভেবে দেখল ফ্রুড। 'কি বলতে চাও?'

'আমরা বাঁচতে চাই। কথা দিতে হবে, আমাদের ছেড়ে দেবেন। দলিল কোথায় আছে, সত্যি কথা বলব তাহলে।'

'ছেড়ে দিলে অসুবিধে কি?' ফ্রুডকে জিজ্ঞেস করল ডুগান। 'আমাদের দলিল পেলেই হলো। ওগুলো আমাদের হাতে এসে গেলে ওরা আর কিছু করতে পারবে না।'

'হুঁ!' মাথা চুলকাল ফ্রুড। ফিরে তাকাল তিন সহকারীর দিকে। 'তোমরা থাকো এখানে। আটকে রাখো এদের। গোলমাল করলে সোজা ঠেলে ফেলে দেবে। আর কোন সুযোগ দেয়াদেয়ি নেই। আমি আর ডুগান আবার নেমে যাচ্ছি।' জ্বলন্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'ঠিক ঠিক বুঝিয়ে বলো, দলিলগুলো কোথায় আছে। সত্যি কথা বলবে। মিথ্যে বললে এবার কি ঘটবে বুঝতেই পারছ।'

মরিয়া হয়ে উঠেছে কিশোর। ফন্দি আঁটছে। বনবন ঘুরছে তার মগজের বেয়ারিংগুলো। 'আমরা যে তাকটায় ছিলাম, পার হয়ে সেটাতে চলে যাবেন। দশ-বারো গজ ডানে গেলে ঢালের গায়ে একটা ফাটল দেখতে পাবেন, খুদে একটা গুহামত। তার মধ্যে লুকানো আছে বাক্সটা।'

উত্তেজনায় চকচক করে উঠল ফ্রুড আর ডুগানের চোখ। দ্রুত আবার দড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল শৈলশিরায়। তর সইছে না। দুই গোয়েন্দাকে পাহারা দিতে লাগল ওদের সশস্ত্র তিন অনুচর।

অবাক হয়ে এতক্ষণ কিশোরের কাণ্ডকারখানা দেখেছে রবিন। ওর মনে কি চলছে, বুঝতে পারছে না। কোন একটা চালাকি যে নিশ্চয় করেছে, এটা বুঝেছে। কিন্তু চালাকিটা কি, সেটা বুঝতে পারেনি।

তিন প্রহরীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ওদেরকেই বলছে এ রকম ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'এসো! এসো!'

ভুরু কুঁচকে গেল সর্দার গোছের লোকটার। 'অ্যাই ছেলে, কি বলছ! একদম চুপ! আর একটা কথা বললে…'

কথা শেষ হলো না তার। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে মুসা আর জোরো। রবিনও দেখতে পেয়েছে এবার ওদের। কিশোরের প্ল্যানটা বুঝে ফেলেছে।

মুসার হাতে একটা গাছের ডাল। জোরোর হাতে পাথর। পেছন থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে এল দুজনে। লোকগুলোর নজর কিশোর আর রবিনের দিকে। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি পেছন থেকে কেউ আসছে।

শেষ মুহূর্তে কিছু একটা আঁচ করে ঘুরতে গেল সর্দার গোছের লোকটা। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। ধাঁ করে লাঠির বাড়ি পড়ল মাথায়। আরেকজনের চাঁদিতে পড়ল পাথরের ঠোকা। টুঁ শব্দ করতে পারল না দুজনের কেউ। বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল।

তৃতীয় লোকটা বিমূঢ়তা কাটিয়ে ওঠার আগেই চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হলো। মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে চিৎকার করতে পারল শুধু একবার।

দড়ির অভাব নেই। দ্রুত বেঁধে ফেলা হলো তিনজনকে।

'কি করব এখন?' জানতে চাইল জোরো। 'বললে লোক ডাকতে পারি।'

'কিভাবে? গাঁয়ে গিয়ে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মুচকি হাসল জোরো। 'এখান থেকেই পারব।' মুখের কাছে দুই হাত জড় করল সে।

ওর উদ্দেশ্য বুঝে তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর, 'না না, চিৎকার শুনে ফেলবে ফ্রড আর ডুগান। আমার প্ল্যান নষ্ট হয়ে যাবে।'

হাত সরিয়ে নিল জোরো, 'প্ল্যানটা কি?'

'ফ্রড আর ডুগান নিচে গেছে দলিলের বাক্সটা আনতে। বাক্স নিয়ে উঠে আসুক, আমাদের ঝামেলা কমবে। দলিলগুলো আগে হাতে নেব। না দিতে চাইলে ঠেলে ফেলে দেয়ার ভয় দেখাব। বাক্সটা নিয়ে তারপর বাঁধব ব্যাটাদেরও।'

হাসি ফুটল জোরোর মুখে।

মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'বাঁধন খুললে কি করে?'

'আমি খুলতে পারিনি,' মুসা জানাল। 'কোনমতে মুখ থেকে কাপড়টা ফেলে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করলাম। আসার জন্যে ছটফট করছিল জোরো। ঘরে থাকতে পারছিল না। ওর বাবা ঘুমিয়ে পড়লে চুপচাপ বেরিয়ে চলে এসেছিল আমাদের খোঁজে। আমার চেঁচানো কানে গেছে ওর।'

'ডালের ওপর তোমাকে দেখে হাসেনি?' হাসছে রবিন।

'হাসেনি মানে? মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে। বহুত কষ্টে ওকে দিয়ে দড়ি খুলিয়েছি।'

'রসিক লোক ব্যাটারা। ডালের ওপর তুলে বেঁধে রাখার বুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

নিচে থেকে উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল।

কান পাতল কিশোর, 'ওই যে, বাক্সটা খুঁজে পেয়েছে। রেডি থাকো। চলে আসবে।'

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। গাছে বাঁধা দড়িতে টান পড়ল।

কয়েক মিনিট বাদে ফ্রডের মাথাটা দেখা দিল।

দড়ির দুই পাশে বসে আছে কিশোর আর মুসা। কিশোরের হাতে ছুরি। মুসার হাতে লাঠি। ওদের কাছ থেকে সামান্য দূরে বসেছে রবিন আর জোরো। জোরোর মত রবিনও একটা পাথর তুলে নিয়েছে।

ফ্রডের মাথা আরও কয়েক ইঞ্চি উঠে আসতে হাঁক দিল কিশোর, 'খবরদার! আর উঠবেন না!'

এতটাই চমকে গেল ফ্রড, হাত ফসকে সড়সড় করে নেমে গেল ফুটখানেক।

মুখ বাড়াল কিশোর। ছুরিটা নাচাল, 'বাক্সটা দিন। নইলে দিলাম দড়ি কেটে। কাল রাতে আমাদের যে অবস্থা করেছিলেন, সেই একই ওষুধের স্বাদ দেব আপনাদেরও।'

রাগে বিকৃত হয়ে গেছে ফ্রডের মুখ। 'ওরা কোথায়?'

কাদের কথা বলছে, বুঝতে পারল কিশোর। 'বেঁধে রেখেছি। দুজনের হুঁশ ফিরেছে এইমাত্র। ওরা কোন সাহায্য করতে পারবে না আপনাদের। এমন বাঁধা বেঁধেছি, একটা আঙুল নাড়ানোরও সাধ্য হবে না কারও।'

বাক্স দিল না ফ্রড। ডুগানের দিকে তাকাল। কয়েক ফুট নিচে থেকে ডুগান তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে।

'দিন বলছি!' হাত বাড়াল কিশোর।

দিল না ফ্রড।

নিচে থেকে ডুগান বলল, 'দিয়ো না! দিয়ো না! নেমে চলে এসো!'

খসখসে কণ্ঠে ফ্রড বলল, 'হাতে ছুরি আছে ওর। দড়ি কেটে দেবে। নামতে পারব না।'

'কাগজগুলো খুলে নিচে ফেলে দাও। নষ্ট হয়ে যাক।'

ফ্রডের মাথা সই করে লাঠি তুলল মুসা। 'খবরদার! বাক্সে হাত দিলেই মাথায় বাড়ি মারব। নিচে পড়ে মরবে। পাহাড়ের নিচে নেমে বাক্সটা তুলে আনতে পারব তখন। অহেতুক মারা পড়বে।'

কিশোর বলল, 'ঠিক। শুধু শুধু কেন অন্যের সম্পত্তি বাঁচানোর জন্যে নিজের প্রাণটা খোয়াবেন?'

'অনেক টাকা দেবে বলেছে আমাকে!' ককিয়ে উঠল ফ্রড।

'মরে গেলে টাকা দিয়ে আর কি করবেন? হয় বাক্সটা দিয়ে প্রাণ বাঁচান, নয়তো টাকার লোভে ভর্তা হোন। এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। তারপর দেব দড়িতে পোঁচ।'

কিশোর দুই গোনার আগেই কোমরে ঝোলানো বাক্স খোলার জন্যে হাত দিল ফ্রড।

আবার হুমকি দিল মুসা, 'কোন চালাকি নয়। কাগজ নষ্ট করলে বাঁচবে না।' লাঠিটা তুলে ধরে রাখল সে।

চালাকি করল না ফ্রড। বাক্সটা দিয়ে দিল কিশোরের হাতে।

ডালা খুলে দেখল কিশোর। কাগজের বান্ডিল আর ছুরিটা দেখল। ঠিকই আছে। বলল, 'উঠে আসুন।'

রবিন আর জোরো তৈরিই আছে। ফ্রড উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে চেপে ধরল। মুসা সাহায্য করল ওদের। বেঁধে ফেলল ফ্রডকেও।

বাকি রইল ডুগান।

মুখ খারাপ করে গালাগাল করছে সে।

ওর দিকে তাকিয়ে হুমকি দিল মুসা, 'দেব কিন্তু দড়ি কেটে!'

পরোয়াও করল না ডুগান। গালাগাল করেই চলেছে। অসহায় মানুষের ক্ষিপ্ততা আর ক্ষোভ প্রকাশ।

মুচকি হাসল কিশোর। 'করুক গালাগাল। কিছু বোলো না।' ডুগানকে জিজ্ঞেস করল, 'উঠবেন, নাকি দড়ি কেটে দিয়ে চলে যাব আমরা?'

কয়েক ফুট নেমে গেল ডুগান। থামল। ওপর দিকে তাকাল। নিচে নেমেও কোন লাভ নেই, বুঝে, আবার উঠে আসতে শুরু করল। হেরে গিয়ে মাথা গরম হয়ে গেছে ওর।

আঠারো

ডুগানকেও বেঁধে ফেলা হলো।

তারপর বাক্স থেকে ছুরি আর দলিলগুলো বের করে দেখতে লাগল জোরো। ডুগান আর ফ্রডের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'এগুলো তুলে আনার জন্যে ধন্যবাদ।'

মুখটাকে আষাঢ়ের মেঘের মত ভারী করে রেখেছে ডুগান। চোখে আগুন। ফ্রডের চোখে হতাশা। অনেকগুলো টাকা হাতছাড়া হওয়ার দুঃখে।

'এদের নিয়ে যাওয়া দরকার,' বন্দিদের দেখিয়ে বলল রবিন। 'এ ভাবে ফেলে রেখে গেলে পালাবে আবার।'

'কিন্তু এতগুলোকে বয়ে নেব কি করে?' মুসার প্রশ্ন।

হাসল জোরো। 'বয়ে নেয়ার দরকার নেই। লোক ডাকছি।'

মুখের কাছে হাত জড় করে বিকট হাঁক ছাড়ল সে। বনভূমিতে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল সে-চিৎকার। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মুসা। ইনডিয়ানরা যে এত জোরে চিৎকার করতে পারে, জানত না।

তিনবার হাঁক দিল জোরো। হাত সরিয়ে এনে হেসে বলল, 'চলে আসবে লোক। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

আধঘণ্টা পর বনের মধ্যে হই-চই শোনা গেল।

আবার হাঁক দিয়ে কোথায় আছে ওদের জানান দিল জোরো।

বন থেকে বেরিয়ে এল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল ইনডিয়ান। পাহাড়ের ও ছেলেদের দেখে দৌড়ে আসতে লাগল।

পায়ের বাঁধন খুলে শুধু হাত বেঁধে রেখে বন্দিদের হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হ গাঁয়ে। যোদ্ধাদের পাঠিয়ে দিয়ে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলেন বাফেলোস্টো শত্রুদের দেখে, বাক্সটা পেয়ে, সব কথা শুনে আবেগে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল তাঁর। ঘন ঘন হাত মেলাতে লাগলেন তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।

'কি বলে যে তোমাদের ধন্যবাদ দেব, তোমাদের ঋণ শোধ করব, জানি না' বললেন তিনি। 'চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে তোমাদের কথা স্মরণ করবে রামাপানরা। বংশ

পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে তোমরা তাদের হৃদয়ে, তাদের গল্পে, তাদের গানে, তাদের ইতিহাসে...'

'দোহাই আপনার, এ ভাবে বলবেন না,' বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল মুসা, 'সহ্য করতে পারছি না আর! এত সম্মান, এত কিছু...আমিও কিন্তু কেঁদে ফেলব!'

হাসি ফুটল বাফেলোস্টোনের মুখে। মুসাকে জড়িয়ে ধরলেন। এক এক করে আলিঙ্গন করলেন কিশোর আর রবিনকেও।

তাঁর উচ্ছ্বাস থামতে অনেক সময় লাগল।

থানায় খবর দেয়া হলো।

দলবল নিয়ে এসে আসামীদের হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেলেন ডিরেল। স্মিথ ক্র্যাককে ধরার জন্যে মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন রকি রীচে।

এরপর বিরাট এক উৎসবের আয়োজন করা হলো তিন গোয়েন্দার সম্মানে। কোন কেসের সমাধান করে এত সম্মান আর পায়নি কখনও ওরা। রামাপানদের হৃদয়ে ওরা যেমন ছাপ ফেলে দিয়েছে, রামাপানরাও তেমনি ছাপ ফেলেছে ওদের হৃদয়ে।

***

ভলিউম ৩৯

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০